পরিচয়

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

নিয়মাবলী

"পরিচয়ের" আদর্শ প্রথম সংখ্যার মুখপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

শ্রাবণ হইতে সুরু করিয়া প্রত্যেক তৃতীয় মাসের—অর্থাৎ শ্রাবণ, কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখের—১লা তারিখে "পরিচয়" বাহির হইবে। মূল্য বার্ষিক সডাক ৪।০, প্রতি সংখ্যা ১৲, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

"পরিচয়ে" প্রকাশের জন্য রচনা কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান দরকার।

প্রাপ্ত রচনা প্রকাশের, বা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার কোন বাধ্যতা থাকিবে না।

ঠিকানা ও ডাকটিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে।

পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ও ব্লক আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

প্রবন্ধাদি ও বিজ্ঞাপন পাঠাইবার ঠিকানা—

ম্যানেজার "পরিচয়",
রুম নং ১৭, ষ্টিফেন হাউস,
ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

পরিচয়

ছন্দের হসন্ত হলন্ত

দিলীপকুমার আশ্বিনের উত্তরায় ছন্দ সম্বন্ধে আমার দুই একটি চিঠির খণ্ড ছাপিয়েছেন। সর্ব্বশেষে যে নোটটুকু দিয়েচেন তার থেকে বোঝা গেল আমি যে কথা বলতে চেয়েচি এখনো সেটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি।

তিনি আমারই লেখার নজির তুলে দেখিয়েচেন যে নিম্নলিখিত কবিতায় আমি "একেকটি" শব্দটাকে চারমাত্রার ওজন দিয়েচি—

ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।

এদিকে নীরেনবাবুর রচনায় "এক্‌টি কথা এতবার হয় কলুষিত" পদটিতে "এক্‌টি" শব্দটাকে দুই মাত্রায় গণ্য করতে আপত্তি করিনি ব'লে তিনি দ্বিধা বোধ করচেন। তর্ক না ক'রে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

একটি কথার লাগি তিনটি রজনী জাগি
একটুও নাহি মেলে সাড়া।
সখীরা যখন জোটে, কথা যেন বন্যা ছোটে.
গোলমালে তোলপাড় পাড়া॥

"এক্‌টি" "তিন্‌টি" "এক্‌টু" শব্দগুলি হসন্তমধ্য, "গোলমাল" "তোলপাড়"-ও সেই জাতের। অথচ হসন্তে ধ্বনি-লাঘবতার অভিযোগে শব্দের মাত্রা জরিমানা দিতে হয় নি। তিনমাত্রা চারমাত্রার গৌরবেই রয়ে গেল। কেউ কেউ বলেন কেবলমাত্র অক্ষর গণনার দোহাই দিয়েই এরা মান বাঁচিয়েচে, অর্থাৎ যদি যুক্ত অক্ষরের ছাঁদে লেখা যেত তা হ'লেই

ছন্দে ধ্বনির কম্‌তি ধরা পড়ত। আমার বক্তব্য এই যে, চোখ দিয়ে ছন্দ পড়া আর বাইসিক্‌লের চাকা দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়া একই কথা, ওটা হবার জো নেই। বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোঝা যাবে :—

টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল,
সিট্‌কে মুখ খাবি, জর আট্‌কে যাবে কাল।

ব'লে রাখা ভালো এটা ভিষক-ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন নয়, সাহিত্য-ডাক্তারের বানানো ছড়া, ছন্দ সম্বন্ধে মত-সংশয় নিবারণের উদ্দেশে—এর থেকে অন্য কোনো রোগের প্রতিকার কেউ যেন আশা না করেন।

আরো একটা :—

একৃটি কথা শুনিবারে তিন্‌টে রাত্রি মাটি।
এর পরে ঝগ্‌ড়া হবে, শেষে দাঁত্‌ কপাটি॥

অথবা

একৃটি কথা শোনো, মনে খট্‌কা নাহি রেখে,
টাট্‌কা মাছ নাই জোটে স্থট্‌কি দেখো চেখে।

শেষের তিনটি ছড়ায় অক্ষর গুণতি করতে গেলে দৃশ্যত পয়ারের সীমা ছাড়িয়ে যায় কিন্তু তাই ব'লেই যে পয়ার ছন্দের নির্দ্দিষ্ট ধ্বনি বেড়ে গেল তা নয়। আপাতত মনে হয় এটা যথেচ্ছাচার। কিন্তু হিসাব ক'রে দেখলেই দেখা যাবে ছন্দের নীতি নষ্ট করা হয়নি। কেননা, তার জো নেই। এ তো রাজত্ব করা নয় কবিত্ব করা, এখানে লক্ষ্য হোলো মনোরঞ্জন; খামকা একটা জবরদস্তির আইন জারি ক'রে তারপরে পাহারাওয়ালা লাগিয়ে দেওয়া, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। ধ্বনির রাজ্যে গোঁয়ার্ত্তমি ক'রে কেউ জিতে যাবে এমন সাধ্য আছে কার? চব্বিশ ঘণ্টা কান রয়েচে সতর্ক।

আমি এই কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করচি যে আক্ষরিক ছন্দ ব'লে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিম্বা অন্য কোনো ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্র। যেমন জল শব্দটা দিয়ে জল পদার্থটার প্রতিবাদ চলে না, অক্ষরকে ধ্বনির প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো তেমনি বিড়ম্বনা।

প্রশ্ন উঠবে, তাই যদি হয় তাহ'লে খোঁড়া হসন্তবর্ণকে কখনো আধমাত্রা কখনো পূরোমাত্রার পদবীতে বসানো হয় কেন? উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, স্বয়ং ভাষা যদি নিজেই আসন পেতে দেয় তবে তার উপরে অন্য কোনো আইন চলে না। ভাষাও পংক্তির ব্যবস্থা নিজের ধ্বনির নিয়ম বাঁচিয়ে তবে করতে পারে। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের ধ্বনি-মাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হ'য়ে থাকে, ধনুকের ছিলের মতো, টানলে

বাড়ে, টান ছেড়ে দিলে কমে। সেটাকে গুণ ব'লেই গণ্য করি। তাতে ধ্বনিরসের বৈচিত্র্য হয়। আমরা দ্রুত লয়ে বলতে পারি "এইরে", আবার তাকে টান্‌লে ডবল ক'রে বলতে পারি "এ-ইরে"। তার কারণ আমাদের স্বরবর্ণগুলো জীবধর্ম্মী, ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা সীমার মধ্যে তাদের সঙ্কোচন প্রসারণ চলে। চারটে পাথরের মূর্ত্তি ধরাবার মতো জায়গায় পাঁচটা ধরাতে গেলে মুস্কিল বাধে; কিন্তু চারজন প্যাসেঞ্জার বসবার বেঞ্চিতে পাঁচজন মানুষ বসালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা নেই যদি তারা পরস্পর রাজি থাকে। বাংলা ভাষার স্বরবর্ণগুলিও পাথুরে নয়, নিজের স্থিতিস্থাপকতার গুণে তারা প্রতিবেশীর জন্যে একটু আধটু জায়গার ব্যবস্থা করতে সহজেই রাজি থাকে। এই জন্যেই অক্ষরের সংখ্যা গণনা ক'রে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না। এটা বাঙালীর আত্মীয়সভার মতন। সেখানে যতগুলো চৌকি তার চেয়ে মানুষ বেশি থাকা কিছুই অসম্ভব নয়, অথবা পাশে ফাঁক পেলে দুইজনের জায়গা একজনে হাত পা মেলে আরামে দখল করাও এই জনতার অভ্যস্ত। বাংলার প্রাকৃতছন্দ ধ'রে তার প্রমাণ দেওয়া যাক্‌,—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান,
শিবু ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান।

এটা তিন মাত্রার ছন্দ। অর্থাৎ চার পোওয়ায় সের-ওয়ালা এর ওজন নয়, তিন পোওয়ায় এর সের। এর প্রত্যেক পা-ফেলার লয় হচ্চে তিনের।

বৃষ্‌ টি। পড়ে -। টাপুর। টুপুর। নদেয়। এল -। বা - ন।
শিবুঠা। কুরের। বিয়ে -। হবে -। তিন্‌ক। ন্যা -। দা - ন।

দেখা যাচ্চে, তিন গণনায় যেখানে যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্ত্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত ক'রে সেই পোড়ো জায়গা দখল ক'রে নিয়েচে। এত সহজে যে, হাজার হাজার ছেলে মেয়ে এই ছড়া আউড়েচে, তবু ছন্দের কোনো গর্ত্তে তাদের কারো কণ্ঠ স্খলিত হয়নি। ফাঁকগুলো যদি ঠেসে ভরাতে কেউ ইচ্ছা করেন—দোহাই দিচ্চি না করেন যেন—তবে এই রকম দাঁড়াবে :—

বৃষ্টি পড়চে টাপুর টুপুর নদেয় আস্‌চে বন্যা,
শিবুঠাকুরের বিয়ের বাসরে দান হবে তিন কন্যা।

রামপ্রসাদের একটি গান আছে :—

মা আমায় ঘুরাবি কত
চোখ-বাঁধা বলদের মতো।

এটাও তিন মাত্রা লয়ের ছন্দ।

মা - আ। মায় ঘু। রাবি -। কত -।

ফাঁক ভরাট করতে হ'লে হবে এই চেহারা :—

হে মাতা আমারে ঘুরাবি কতই
চক্ষু-বদ্ধ বৃষের# মতোই।

যাঁরা অক্ষর গণনা ক'রে নিয়ম বাঁধেন তাঁদের জানিয়ে রাখা ভালো যে স্বরবর্ণে টান দিয়ে মীড় দেবার জন্যেই প্রাকৃত বাংলা ছন্দে কবিরা বিনা দ্বিধায় ফাঁক রেখে দেন, সেই ফাঁকগুলো ছন্দেরই অঙ্গ—সে সব জায়গায় ধ্বনির রেশ কিছু কাজ করবার অবকাশ পায়।

"হারিয়ে ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বুঝি
লুকোচুরির ছলে।"

এর মধ্যে প্রায় প্রত্যেক যতিতে ফাঁক আছে।

১ ২ ৩ ৪
হারিয়ে ফেলা—। বাঁশি আমা-র। পালিয়েছিল। বুঝি—।
৫ ৬
লুকোচুরী-র। ছলে—।

কিছু বৈচিত্র্যও দেখচি। প্রথম দুটি বিভাগে সমান্তরাল ফাঁক। কিন্তু তিনের ভাগে ফাঁক বাদ গিয়ে একেবারে চতুর্থভাগের শেষে দীর্ঘ ফাঁক পড়েচে। পাঠক "হারিয়ে ফেলার" পরেও ফাঁক না দিয়ে একেবারে দ্বিতীয় ভাগের শেষে যদি সেটা পূরণ ক'রে দেন তবে ভালোই শুনতে হবে।

কিন্তু যদি বেফাঁক ঠাস্-বুনানির বিশেষ ফরমাস থাকে তা হ'লে সেটাও চেষ্টা করলে মন্দ হবে না :—

স্বপ্ন আমার বন্ধনহীন সন্ধ্যাতারার সঙ্গী
মরণ-যাত্রীদলে,
স্বর্ণবরণ কুজ্ঝটিকায় অস্ত-শিখর লঙ্ঘি'
লুকায় মৌনতলে॥

এই কথাটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে হসন্তবর্ণের হ্রস্ব বা দীর্ঘ যে মাত্রাই থাক্ পাঠ করতে বাঙালী পাঠকের একটুও বাধে না, ছন্দের ঝোঁক আপনিই অবিলম্বে তাকে ঠিকমতো চালনা করে।

পাৎলা করিয়া কাটো কাৎলা মাছেরে,
উৎসুক নাৎনি যে চাহিয়া আছেরে।

এই ছড়াটা পড়তে গেলে বাঙালী নিঃসংশয়ে স্বতই খণ্ড ত-এর পূর্ববর্তী স্বরবর্ণকে দীর্ঘ ক'রে পড়বে। আবার যেমনি নিম্নের ছড়াটি সামনে ধরা

পাৎলা করি কাটো প্রিয়ে কাৎলা মাছটিরে
টাট্‌কা তেলে ফেলে দাও শর্ষে আর জিরে,
ভেট্‌কি যদি জোটে তাহে মাখো লঙ্কা বাঁটা,
যত্ন ক'রে বেছে ফেলো টুক্‌রো যত কাঁটা—

অমনি প্রাক্-হসন্ত স্বরগুলিকে ঠেসে দিতে এক মুহূর্ত্তও দেরী হবে না। এই যে বাংলা স্বরবর্ণের সজীবতা, এ'কে কোনো কড়া নিয়মের চাপে আড়ষ্ট ক'রে তাকে সর্ব্বত্র সমানভাবে ব্যবহারযোগ্য করা উচিত—এ মত চালালে বাংলাভাষাকে ফাঁকি দেওয়া হবে। শুক্‌নো আমসত্ত্বের মধ্যেই সাম্য, কিন্তু সরস আমের মধ্যে বৈচিত্র্য, ভোজে কোন্‌টার দাম বেশী তা নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক।

বাংলা প্রাকৃত ভাষার কাব্যে স্বরধ্বনির যে প্রাণবান স্বচ্ছন্দতা আছে সংস্কৃত বাংলা ভাষা,—যাকে আমরা সাধুভাষা বলি,—তার মধ্যে প'ড়ে সে কেন জেনানা মেয়ের মতো দেয়ালে আট্‌কা পড়ে গেল? তার কারণ সংস্কৃত-বাংলা কৃত্রিম ভাষা, ওখানে বাইরের নিয়মের প্রাধান্য, তার আপন নিয়ম অনেক জায়গায় কুণ্ঠিত। সভাস্থলে একটি আসনে একটি মানুষের স্থান নির্দ্দিস্ট, কারো বা দেহ ক্ষীণ, আসনে ফাঁক থেকে যায়, কারো বা স্থূল দেহ, আসনে ঠেসে বসতে হয়—কিন্তু গোণাগণতি চৌকি, সীমা নির্দ্দিষ্ট। যদি ফরাসে বসতে হ'ত তাহলে কলেবরের তারতম্য ধ'রে পরস্পরের আসনের সীমানায় কমি-বেশি স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটত। কিন্তু সভ্যতার মর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি রেখে স্বভাবের নিয়মকে বাঁধা নিয়মে পাকা ক'রে দিতে হয়। তাতে কিছু পীড়ন ঘটলেও গাম্ভীর্য্যের পক্ষে তার একটা সার্থকতা আছে। সেই জন্যেই সভার রীতি ও ঘরের রীতিতে কিছু ভেদ থাকেই। শকুন্তলার বাকল দেখে দুষ্যন্ত বলেছিলেন, কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্—কিন্তু যখন তাঁকে রাজান্তঃপুরে নিয়েছিলেন তখন তাঁকে নিশ্চয়ই বাকল পরান নি। তখন শকুন্তলার স্বাভাবিক শোভাকে অলঙ্কৃত করেছিলেন, সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্যে নয়, মর্য্যাদারক্ষার জন্যে। রাজরাণীর সৌন্দর্য্য ব্যক্তিবিশেষে বিচিত্র, কিন্তু তাঁর মর্য্যাদার আদর্শ সকল রাজরাণীর মধ্যে এক। ওটা প্রকৃতির হাতে তৈরী নয়, রাজসমাজের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। অর্থাৎ ওটা প্রাকৃত নয় সংস্কৃত। তাই দুষ্যন্ত স্বীকার করেছিলেন বটে বনলতার দ্বারা উদ্যানলতা পরাভূত তবু উদ্যানকে বনের আদর্শে রমণীয় ক'রে তুল্‌তে নিশ্চয় তাঁর সাহস হয়নি। তাই আমি নিজে আকন্দফুল ভালোবাসি কিন্তু আমার সাধুসমাজের মালী ঐ গাছের অঙ্কুর দেখবামাত্র উপড়ে ফেলে। সে যদি কবি হ'ত, সাধু ভাষায় ছাড়া কবিতা লিখত না। সাধুভাষার ছন্দের বাঁধারীতি যে জাতীয়

ছন্দে চলে এবং শোভা পায় সে হচ্চে পয়ার জাতীয় ছন্দ। ... ফাঁক ফাঁক নির্দ্দিষ্ট আসনের উপর নানা ওজনেরই ধ্বনিকে ... নিরাপদ। এখানে ঠিক চোদ্দটা অক্ষরকে বাহন ক'রে ঘুম ... রকমের ধ্বনিই একত্র সভা জমাতে পারে।

কাব্যলীলা একদিন যখন সুরু করেছিলেম তখন বাংলা ... সাধুভাষারই ছিল একাধিপত্য। অর্থাৎ তখন ছিল কাটা কাটা ... ভাগকরা ছন্দ। এই আইনের অধীনে যতক্ষণ পয়ারের এলাকায় ... ততক্ষণ আসনপীড়া ঘটে না। কিন্তু তিনমাত্রামূলক ছন্দের দিকে ... কলমের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। ঐ ছন্দে প্রত্যেক অক্ষর ... আরূঢ় সকল ওজনের ধ্বনিকেই সমানদরের একক ব'লে ধ'রে নিতে ... কানে বাজত। সেইজন্যে যুক্ত অক্ষর অর্থাৎ যুগ্মধ্বনি বর্জ্জন ... একটা দুর্ব্বল অভ্যাস আমাকে ক্রমেই পেয়ে বস্‌ছিল। ঠোকর খাবার ... পদগুলোকে একেবারে সমতল ক'রে যাচ্ছিলুম। সব জায়গায় ... উঠিনি কিন্তু মোটের উপর চেষ্টা ছিল। ছবি ও গান-এ রাহুর প্রেম ... পড়লে দেখা যাবে, যুক্ত অক্ষর ঝেঁটিয়ে দেবার প্রয়াস আছে তবু ... পাথরের টুকরোর মতো রাস্তার মাঝে মাঝে উঁচু হ'য়ে রইল। তাই ... লিখেছিলুম :—

কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লোহ শৃঙ্খলের ডোর

মনে খটকা লেগেছিল, কান প্রসন্ন হয় নি—কিন্তু তখন ... ছিল অপটু এবং অলস মন ছিল অসতর্ক। কেননা পাঠকদের ... থেকে বিপদের আশঙ্কা ছিল না। তখন ছন্দের সদর রাস্তাও গ্রাম্য রাস্তার মতো এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো থাকত, অভ্যাসের গতিকে কেউ সেটাকে নিন্দনীয় ব'লে মনেও করেনি।

অক্ষরের দাসত্বে বন্দী ব'লে প্রবোধচন্দ্র বাঙালী কবিদেরকে যে দোষ দিয়েচেন সেটা এই সময়কার পক্ষে কিছু অংশে খাটে। অর্থাৎ অক্ষরের মাপ সমান রেখে ধ্বনির মাপে ইতরবিশেষ করা তখনকার শৈথিল্যের দিনে চলত, এখন চলেনা। তখন পয়ারের রীতি সকল ছন্দেরই সাধারণ রীতি ব'লে সাহিত্যসমাজে চলে গিয়েছিল। তার প্রধান কারণ, পয়ার জাতীয় ছন্দই তখন প্রধান, অন্য জাতীয় অর্থাৎ ত্রৈমাত্রিক ছন্দের ব্যবহার তখন অতি অল্পই। তাই এই মাইনরিটির স্বতন্ত্র দাবী সেদিন বিবিক্ত হয়নি।

তারপরে মানসী লেখার সময় এল। তখন ছন্দের কান আর ধৈর্য্য রাখতে পারচেনা। একথা তখন নিশ্চিত বুঝেচি যে, ছন্দের প্রধান সম্পদ যুগ্মধ্বনি, অথচ এটাও জানচি যে পয়ার সম্প্রদায়ের বাইরে নির্ব্বিচারে যুগ্মধ্বনির পরিবেষণ চলে না। "রয়েছি পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা" এ লাইন-বেচারাকে পয়ারের বাঁধা প্রথাটা শৃঙ্খল হয়েই বেঁধেচে, তিনমাত্রার স্কন্ধকে চারমাত্রার বোঝা বইতে হচ্চে। সেই মানসী লেখবার বয়সে আমি যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রার মূল্য দিয়ে ছন্দ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েচি।

প্রথম প্রথম পয়ারেও সেই নিয়ম প্রয়োগ করেছিলুম। অনতিকাল পরেই দেখা গেল তার প্রয়োজন নেই। পয়ারে যুগ্মধ্বনির উপযুক্ত ফাঁক যথেষ্ট আছে। (এই প্রবন্ধে আমি ত্রিপদী প্রভৃতি পয়ার জাতীয় সমস্ত দ্বৈমাত্রিক ছন্দকেই পয়ার নাম দিচ্চি।)

পয়ারে ধ্বনিবিন্যাসের এই যে স্বচ্ছন্দতা, দুই মাত্রার লয় তার একমাত্র কারণ নয়। পয়ারের পদগুলিতে তার ধ্বনিভাগের বৈচিত্র্য একটা মস্ত কথা। সাধারণ ভাগ হচ্চে ৩+৩+২+৩+৩ যথা :—

নিখিল আকাশ ভরা আলোর মহিমা
তৃণের শিশির মাঝে লভিল প্রতিমা।

অন্য রকম, যথা

তপনের পানে চেয়ে সাগরের ঢেউ
বলে ওই পুতলিরে এনে দে-না কেউ।

অথবা

রাখি যাহা তার বোঝা কাঁধে চেপে রহে।
দিই যাহা তার ভার চরাচর বহে।

অথবা

সারা দিবসের হায় যত কিছু আশা
রজনীর কারাগারে হারাবে কি ভাষা॥

অমিত্রাক্ষর ছন্দে পয়ারের প্রবর্ত্তন হয়েচে এই কারণেই। সে কোনো কোনো আদিম জীবের মতো বহুগ্রন্থিল, তাকে নষ্ট না করেও যেখানে সেখানে ছিন্ন করা যায়। এই ছেদের বৈচিত্র্য থাকাতেই প্রয়োজন হ'লে সে পদ্য হ'লেও গদ্যের অবন্ধ গতি অনেকটা অনুকরণ করতে পারে। সে গ্রামের মেয়ের মতো, যদিও থাকে অন্তঃপুরে, তবুও হাটে ঘাটে তার চলাফেরায় বাধা নেই।

উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে ধ্বনির বোঝা হাল্কা। যুগ্মবর্ণের ভার চাপিয়ে দেওয়া যাক্—

সুরাঙ্গনা নন্দনের নিকুঞ্জ প্রাঙ্গণে
মন্দার মঞ্জরী তোলে চঞ্চল কঙ্কণে।
বেণীবন্ধ তরঙ্গিত কোন্ ছন্দ নিয়া,
স্বর্গবীণা গুঞ্জরিছে তাই সন্ধানিয়া।

আধুনিক বাংলা ছন্দে সব চেয়ে দীর্ঘপয়ার আঠারো অক্ষরে গাঁথা। তার প্রথম যতি পদের মাঝখানে আট অক্ষরের পরে, শেষ যতি দশ অক্ষরের পরে পদের শেষে। এতেও নানাপ্রকারের ভাগ চলে। তাই অমিত্রাক্ষরে লাইন-ডিঙোনো চালে এর ধ্বনিশ্রেণীকে নানারকমে কুচ-কাওয়াজ করানো যায়।

হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা। স্তব্ধ হয়ে ছিল রাত্রিদিন
সপ্তর্ষির দৃষ্টিতলে। বাক্যহীন স্তব্ধতায় লীন,
সেই নির্ঝরিণী ধারা। রবিকর স্পর্শে উচ্ছ্বসিতা
দিগ্দিগন্তে প্রচারিছে। অন্তহীন আনন্দের গীতা॥

বাঙলায় এই আর একটি গুরুভারবহ ছন্দ। এরা সবাই মহাকাব্য বা আখ্যান বা চিন্তাগর্ভ বড়ো বড়ো কথার বাহন। ছোটো পয়ার আর এই বড়ো পয়ার, বাংলা কাব্যে এরা যেন ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা আর ঐরাবত। অন্তত এই বড়ো পয়ারকে গীতিকাব্যের কাজে খাটাতে গেলে বেমানান হয়। এর নিজের গড়নের মধ্যেই একটা সমারোহ আছে সেইজন্যে এর প্রয়োজন সমারোহসূচক ব্যাপারে।

ছোটো পয়ারকে চেঁচে ছুলে হাল্কা কাজে লাগানো যায় যেমন বাঁশের কঞ্চিকে ছিপ করা চলে। পয়ারের দেহ-সংস্থানেই গুরুর সঙ্গে লঘুর যোগ আছে। তার প্রথম অংশে আট, দ্বিতীয় অংশে ছয়—অর্থাৎ হালের দিকে সে চওড়া কিন্তু দাঁড়ের দিকে সরু—তাকে নিয়ে মাল বওয়ানোও যায়, বাচ খেলানোও চলে। বড়ো পয়ারের দেহ-সংস্থান এর উল্টো—তার প্রথমভাগে আট শেষভাগে দশ—তার গৌরবটা ক্রমেই প্রশস্ত হ'য়ে উঠেচে। ছোটো পয়ারের ছিব্‌লেমির একটা পরিচয় দেওয়া যাক্—

খুব তার বোলচাল, সাজ ফিট্‌ফাট্‌,
তক্‌রার হ'লে আর নাই মিট্‌মাট্‌।
চষ্‌মায় চম্‌কায় আড়ে চায় চোখ,
কোনো ঠাঁই ঠেকে নাই কোনো বড়ো লোক।

এর ভাগগুলোকে কাটা কাটা ছোটো ছোটো ক'রে হ্রস্বস্বরে হসন্তবর্ণে ঘন ঘন ঝোঁক দিয়ে এর চটুলতা বাড়িয়ে দেওয়া গেচে। এখানে

এটা পাংলা কিরিচের মতো। একেই আবার যুগ্মধ্বনির যোগে মজ্‌বুৎ ক'রে খাঁড়া ক'রে তোলা যায়।

বাক্য তার অনর্গল মল্ল সজ্জাশালী।
তর্ক যুদ্ধে উগ্র তেজ, শেষ যুক্তি গালি।
ভ্রূকুটী প্রচ্ছন্ন চক্ষু কটাক্ষিয়া চায়
কুত্রাপিও মহত্ত্বের চিহ্ন নাহি পায়॥

যেখানে সেখানে নানাপ্রকার অসমান ভার নিয়েও পয়ারের পদস্খলন হয় না এই তত্ত্বটির মধ্যে অসামান্যতা আছে। অন্য কোনো ভাষার কোনো ছন্দে এ রকম স্বচ্ছন্দতা এতটা পরিমাণে আছে ব'লে আমি তো জানিনে।

এর কৌশলটা কোন্‌খানে যখন ভেবে দেখা যায় তখন দেখি পয়ারে প্রত্যেক পদের মাঝখানে ও শেষে যে দুটো হাঁফ ছাড়বার যতি আছে সেইখানেই তার ভার সামঞ্জস্য হ'য়ে থাকে।

নিঃস্বতা-সঙ্কোচে দিন। অবসন্ন হ'লে
নিভৃতে নিঃশব্দ সন্ধ্যা। নেয় তারে কোলে।

গণনা ক'রে দেখলে ধরা পড়ে এই পয়ারের দুই লাইনে ধ্বনিভারের সাম্য নেই। তবু যে টলমল করতে করতে ছন্দটা কাৎ হ'য়ে পড়ে না, তার কারণ, ডাইনে বাঁয়ে যতির লগির ঠেকা দিয়ে দিয়ে তাকে চালিয়ে নেওয়া হয়। চতুষ্পদ জন্তু যেমন তার ভারী দেহটাকে দুইজোড়া পায়ের দ্বারা দুই দিকে ঠেকাতে ঠেকাতে চলে সেই রকম। পয়ারের প্রকৃতরূপ চোদ্দটা অক্ষরে নয়, সেটা প্রথম অংশের আট অক্ষর ও দ্বিতীয় অংশের ছয় অক্ষরের পরবর্ত্তী দুই যতিতে। অজগর সমস্ত দেহটা নিয়ে চলে। তার দেহে মুণ্ড এবং ধড়ের মধ্যে ভাগ নেই। ঘোড়ার দেহে সেই ভাগ আছে। তার মুণ্ডটার পরে যেখানে গলা সেখানে একটা যতি, ধড়ের শেষভাগে যেখানে ক্ষীণ-কটি সেখানেও আর একটা। এই বিভক্ত ভারের দেহকে সামলিয়ে নিয়ে সে চার পা ফেলে চলে। পয়ারেরও সেইরকম বিশেষভাবে বিভক্ত দেহ এবং চার পা ফেলতে ফেলতে চলা। চতুষ্পদ জন্তুর দুই পায়ের সমান বিন্যাস। যদি এমন হোতো যে, কোনো জানোয়ারের পা দুটো বাঁয়ের চেয়ে ডাইনে এক ফুট বেশি লম্বা তা হ'লে তার চলনে স্থিতির চেয়ে অস্থিতিই বেশি হোত—সুতরাং তার পিঠে সওয়ার চাপালে কোনো পক্ষেই আরাম থাকত না। ছন্দে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

তরণী-বেয়ে শেষে। এসেচি ভাঙা ঘাটে,
স্থলে না মেলে ঠাঁই। জলে না দিন কাটে।

এ ছড়ায় প্রত্যেক লাইনে চোদ্দ অক্ষর—এবং মাঝে আর শেষে দুই যতিও আছে। তবু ওকে পয়ার বলবার জো নেই। ওর পা ফেলার চাল অসমান।

তরণী । বেয়ে শেষে ॥ এসেচি । ভাঙা ঘাটে ॥

এক পায়ে তিন মাত্রা আর এক পায়ে চার। সাত মাত্রার পরে একটা ক'রে যতি আছে, কিন্তু বেজোড় অঙ্কের অসাম্য ঐ যতিতে পুরো বিরাম পায় না। সেইজন্যে সমস্ত পদটার মধ্যে নিয়তই একটা অস্থিরতা থাকে যে পর্য্যন্ত না পদের শেষে এসে একটা সম্পূর্ণ স্থিতি ঘটে। এই অস্থিরতাই এরকম ছন্দের স্বভাব অর্থাৎ পয়ারের ঠিক বিপরীত। এই অস্থিরতার সৌন্দর্য্যকে ব্যবহার করবার জন্যেই এই রকম ছন্দের রচনা। এর পিঠের উপর যেমন তেমন ক'রে যুগ্মধ্বনির সওয়ার চাপালে অস্বস্তি ঘটে। যদি লেখা যায়—সায়াহ্ন অন্ধকারে এসেচি ভগ্ন ঘাটে—তা হ'লে ছন্দটার কোমর ভেঙে যাবে। তবুও যদি যুগ্মবর্ণ দেওয়াই মত হয় তা হ'লে তার জন্যে বিশেষভাবে জায়গা ক'রে দিতে হ'বে। পয়ারের মত উদারভাবে যেমন খুসি ভার চাপিয়ে দিলেই হোলো না।

অন্ধরাতে যবে বন্ধ হোলো দ্বার,
ঝঞ্ঝাবাতে উঠে বিপুল হাহাকার।

মনে রাখা দরকার এই ছন্দের প্রত্যেক ভাগে আরম্ভে ঝোঁক না দিয়ে যদি শেষে ঝোঁক দেওয়া হয় অর্থাৎ "অন্ধ" ও "বন্ধ" শব্দের উপর ঝোঁক না প'ড়ে যদি সেটা পড়ে "যবে" ও "দ্বার"-এরউ পর তা হ'লে এটা আরেক ছন্দ হ'য়ে যাবে। এ'কে নিম্নলিখিত রকম ভাগ করে পড়তে হ'বে,—

অন্ধ । রাতে যবে ॥ বন্ধ । হোলো দ্বার ॥
ঝঞ্ঝা । বাতে উঠে ॥ বিপুল । হাহাকার ॥

পশুপক্ষীদের চলন সমান মাত্রার দুই বা চার পায়ের উপর। এই পা-কে কেবল যে চলতে হয় তা নয় দেহভার বইতে হয়। পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই বিরাম আছে ব'লে বোঝা সামলিয়ে চলা সম্ভব। আর পর্য্যন্ত জীবলোকে জুড়িওয়ালা পায়ের পরিবর্ত্তে চাকার উদ্ভব কোথাও হ'ল না। কেননা চাকা না থেমে গড়িয়ে চলে—চলার সঙ্গে থামার সামঞ্জস্য তার মধ্যে নেই। দুই মূলক সমমাত্রায় দুই পায়ের চাল, তিন মূলক অসম মাত্রায় চাকার চাল। দুই পা-ওয়ালা জীব উঁচু নীচু পথের বাধা ডিঙিয়ে চ'লে যায়।—পয়ারের সেই শক্তি। চাকা বাধায় ঠেকলে ধাক্কা খায়, ত্রৈমাত্রিক ছন্দের সেই দশা। তার পথে যুগ্মস্বর যাতে বাধা হ'য়ে না দাঁড়ায় সেই চেষ্টা করতে হ'বে।

অধীর বাতাস এল সকালে,
বনেরে বৃথাই শুধু বকালে।
দিন শেষে দেখি চেয়ে
ঝরা ফুলে মাটি ছেয়ে
লতারে কাঙাল ক'রে ঠকালে।

এ ছন্দ পয়ার জাতীয়—টেনিস্ খেলোয়াড়ের আধা পায়জামার মত বহরটা নীচের দিকে ছাঁটা। এ ছন্দে তাই যুগ্মস্বর যেমন খুসি চলে।

নবারুণ চন্দনের তিলকে
দিক্-ললাট এঁকে আজি দিল কে।
বরণের পাত্র হাতে
উষা এলো সুপ্রভাতে
জয়শঙ্খ বেজে ওঠে ত্রিলোকে।

কিন্তু

শরতে শিশির বাতাস লেগে
জল ভরে আসে উদাসী মেঘে।
বরষণ তবু হয় না কেন,
ব্যথা নিয়ে চেয়ে রয়েছে যেন।

এখানে তিনমাত্রার ছন্দ গড়িয়ে চলেচে—চাকার চাল, পা ফেলার চাল নয়, তাই যুগ্মবর্ণের স্বেচ্ছাচারিতা এর সইবে না।

চাষের সময়ে যদিও করিনি হেলা
ভুলিয়া ছিলাম ফসল কাটার বেলা।

পয়ারের মতোই চোদ্দটা অক্ষরে পদ—কিন্তু জাত আলাদা। তিনমাত্রার চাকায় চলেচে। পদাতিকের সঙ্গে চক্রীর মেলে না।

শ্যামল ঘন বকুল বন ছায়ে ছায়ে
যেন কী সুর বাজে মধুর পায়ে পায়ে।

এখানেও চোদ্দ অক্ষর—কিন্তু এর চালে পয়ারের মতো সম মাত্রার পদ-চারণের শান্তি নেই ব'লে বিষম মাত্রার ভাগগুলি যতির মধ্যেও গতির ঝোঁক রেখে দেয়। খোঁড়া মানুষের চলার মতো—যতক্ষণ না লক্ষ্য স্থানে গিয়ে বসে পড়ে থেমেও ভালো ক'রে থামতে পারে না।

বাংলা চল্‌তি ভাষায় মূল সংস্কৃত শব্দের অনেকগুলি স্বরবর্ণই কোনোটা আধখানা কোনোটা পূরোপূরি ক্ষয়ে যাওয়াতে ব্যঞ্জনগুলো তাল পাকিয়ে অত্যন্ত পরস্পরের গায়ে-পড়া হ'য়ে গেচে। স্বরের ধ্বনিই ব্যঞ্জনের ধ্বনিকে অবকাশ দেয়, তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে,—সেগুলো সরে গেলেই ব্যঞ্জনধ্বনি পিণ্ডীভূত হ'য়ে পড়ে। চলিত এবং চল্‌তি, ঘৃণা এবং

ঘেন্না, বসতি এবং বস্‌তি, শব্দগুলো তুলনা ক'রে দেখলেই বোঝা যাবে। সংস্কৃত ভাষায় স্বরধ্বনির দাক্ষিণ্য, আর প্রাকৃত বাংলায় তার কার্পণ্য। এইটেই হোলো ছুটো ভাষার ধ্বনিগত মূল পার্থক্য। স্বরবর্ণবহুল ধ্বনি-সঙ্গীত এবং স্বরবর্ণবিরল ধ্বনিসঙ্গীতে প্রভূত প্রভেদ। এই দুইয়েরই বিশেষ মূল্য আছে—বাঙালী কবি তাঁদের কাব্যে যথাস্থানে দুটোরই সুযোগ নিতে চান। তাঁরা ধ্বনিরসিক ব'লেই কোনোটাকেই বাদ দিতে ইচ্ছা করেন না।

প্রাকৃত বাংলার ধ্বনির বিশেষত্ববশত দেখ্‌তে পাই তার ছন্দ তিনমাত্রার দিকেই বেশি ঝুঁকেচে। অর্থাৎ তার তালটা স্বভাবতই একতালা জাতীয়, কাওয়ালি জাতীয় নয়। সংস্কৃত ভাষায় এই "তাল" শব্দটা ছুই সিলেব্‌লের—বাংলায় ল আপন অন্তিম অকার খসিয়ে ফেলেচে, তার জায়গায় টি বা টা যোগ ক'রে শব্দটাকে পুষ্ট করবার দিকে তার ঝোঁক। টি টায়ের ব্যবধান যদি না থাকে তবে ঐ নিস্বর ধ্বনিটি প্রতিবেশী যে-কোনো ব্যঞ্জন বা স্বরের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে পূর্ণতা পেতে চায়।

—রূপ সাগরের তলে ডুব দিনু আমি—

এটা সংস্কৃত বাংলার ছাঁদে লেখা। এখানে শব্দগুলো পরস্পর গা-ঘেঁষা নয়। বাংলা প্রাকৃতের অনিবার্য্য নিয়মে এই পদের যে শব্দগুলি হসন্ত, তারা আপনারই স্বরধ্বনিকে প্রসারিত ক'রে ফাঁক ভর্ত্তি ক'রে নিয়েচে। "রূপ" এবং "ডুব" আপন উকারধ্বনিকে টেনে বাড়িয়ে দিলে। "সাগরের" শব্দ আপন একারকে পরবর্ত্তী হসন্ত র-য়ের পঙ্গুতা চাপা দিতে লাগিয়েচে। এই উপায়ে ঐ পদটার প্রত্যেক শব্দ নিজের মধ্যেই নিজের মর্য্যাদা বাঁচিয়ে চলেচে। অর্থাৎ এ ছন্দে ডিমক্রেসির প্রভাব নেই। এই রকমের ছন্দে ছুইমাত্রার ধ্বনি আপন পদক্ষেপের প্রত্যেক পর্য্যায়ে যে অবকাশ পায় তা নিয়ে তার গৌরব। বস্তুত এই অবকাশের সুযোগ গ্রহণ ক'রে তার ধ্বনি সমারোহ বাড়িয়ে তুল্‌লে এ ছন্দের সার্থকতা। যথা—

চৈতন্য নিমগ্ন হোলো রূপসিন্ধুতলে।

প্রাকৃত বাংলা দেখা যাক্ :—

"রূপসাগরে ডুব দিয়েচি অরূপ রতন আশা ক'রে"—এখানে "রূপ" আপন হসন্ত প-এর ঝোঁকে "সাগরে"র সা-টাকে টেনে আপনার ক'রে নিয়েচে, মাঝে ব্যবধান থাকৃতে দেয়নি। "রূপ-সা" তাই আপনিই তিনমাত্রা হ'য়ে গেল। "সাগরের" বাকি টুক্‌রো রইল "গরে"। সে

আপন ওজন বাঁচাবার জন্যে "রে"-টাকে দিলে লম্বা ক'রে, তিনমাত্রা পূরল। "ডুব্" আপনার হসন্তর টানে "দিয়েচি"র দি-টাকে করলে আত্মসাৎ। এমনি ক'রে আগাগোড়া তিনমাত্রা জমে উঠল। হসন্ত-প্রধান ভাষা সহজেই তিনমাত্রার দানা পাকায়, এটা দেখেচি। এমন কি, যেখানে হসন্তের ভিড় নেই সেখানেও তার ঐ একই চাল। এটা যেন তার অভ্যস্ত হ'য়ে মজ্জাগত হ'য়ে গেচে। যেমন :—

অচে - । তনে - । ছিলেম । ভালো - ।
আমায় । চেতন । করলি । কেনে - ।

প্রাকৃত বাংলার এই তিনমাত্রার ভঙ্গী চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরা সাধুভাষাতেও গ্রহণ করেচেন। যেমন :—

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়।

কিন্তু প্রাকৃত বাংলার ক্রিয়াপদ নিয়ে একটু ভাববার বিষয় আছে।

মত্তরোষে বীরভদ্র ছুট্‌ল উর্দ্ধশ্বাসে,
ঘূর্ণীবেগে উড়্‌ল ধুলো রক্ত সন্ধ্যাকাশে।

কিম্বা—

ছুট্‌ল কেন মহেন্দ্রের আনন্দের ঘোর,
টুট্‌ল কেন উর্ব্বশীর মঞ্জীরের ডোর।
বৈকালে বৈশাখী এল আকাশ লুণ্ঠনে,
শুক্লরাতি ঢাক্‌ল মুখ মেঘাবগুণ্ঠনে॥

এদের সম্বন্ধে কী বলা যাবে?

প্রধানত ক্রিয়াপদেরই বিশেষ রূপটাতে প্রাকৃত বাংলার চেহারা ধরা পড়ে। উপরের ছড়াগুলিতে উড়্‌ল ছুট্‌ল টুট্‌ল ঢাক্‌ল প্রভৃতি প্রয়োগ নিয়ে তর্কটা ছন্দের তর্ক নয়, ভাষারীতির। এই রকম ক্রিয়াপদ যদি ব্যবহার করি তবে ধ'রে নিতে হ'বে ঐ ছড়াগুলি প্রাকৃত বাংলাতেই লেখা হচ্চে। আমি যে প্রবন্ধ লিখ্‌চি এও প্রাকৃত বাংলার ঠাটে। যদি আমাকে কারো সঙ্গে মুখে মুখে আলোচনা করতে হ'ত তা হ'লে এই লেখার সঙ্গে আমার মুখের কথার কোনো তফাৎ থাকত না। মাঝে মাঝে অভ্যাস দোষে হয়তো ইংরেজি শব্দ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত কিন্তু কখনোই "করিয়াছিল" "গিয়াছে" ধরণের ক্রিয়াপদ ভুলেও ব্যবহার করতে পারতুম না। আবার প্রাকৃত বাংলার ক্রিয়াপদ সংস্কৃত বাংলায় ব্যবহার করাও চলে না।

প্রবোধচন্দ্র "বিচিত্রা"য় লিখেচেন যে, বাঙালী কবিরা সাহস ক'রে

কবিতায় করিব চলিব প্রভৃতি প্রয়োগ না ক'রে কেন কর্‌ব চল্‌ব প্রয়োগ না করেন? যদি প্রশ্নটার অর্থ এই হয় যে, অযথা স্থানে কেন করিনে তবে তার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। যদি বলেন যথাস্থানেও কেন করিনে তবে তার উত্তরে বলব, যথাস্থানে ক'রে থাকি।

যে তর্ক নিয়ে লেখা সুরু করেছিলেম সেটাতে ফিরে আসা যাক্। বাংলায় হসন্তমধ্য শব্দগুলোয় কয় মাত্রা গণনা করা হ'বে তাই নিয়ে সংশয় উঠেচে।

সংস্কৃত ভাষায় শব্দের মাঝখানে হসন্তবর্ণ যুক্তবর্ণের রূপ ধ'রে সাধুভাষায় অনায়াসেই আপন স্থান পেয়েচে। একমাত্র খণ্ড ৎ অক্ষর মহলে আপন অনুবর্ত্তী জুড়ির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে। প্রাকৃত বাংলায় শব্দমধ্যবর্ত্তী হসন্তবর্ণ আপন বিচ্ছিন্ন অক্ষর রূপ রক্ষা ক'রে রয়ে গেচে। তার অধিকাংশই ক্রিয়াপদ।

যেগুলি ক্রিয়াপদ নয় সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এ প্রবন্ধের গোড়াতেই আলোচনা করেচি। বলেচি নিয়মের বিকল্প চলে; কেননা বাঙালীর কান সাধারণ ব্যবহারে সেই বিকল্প মঞ্জুর করেচে। এ ক্ষেত্রে হিসাবে একটা মাত্রার কমি-বেশি নিয়ে তর্ক ওঠে না।—

চিম্‌নি ভেঙে গেছে দেখে গিন্নি রেগে খুন,
ঝি বলে আমার দোষ নেই ঠাক্‌রুণ।

অন্তত চিম্‌নিকে দুই মাত্রা করায় কবির দোষ হয় নি। আবার

চিম্‌নি ফেটেচে দেখে গৃহিণী সরোষ
ঝি বলে ঠাক্‌রুণ মোর নাই কোনো দোষ।

এ রকম বিপর্য্যয়ও চলে। একই ছড়ায় চিম্‌নিকে একমাত্রা প্রেস মার্কা দেওয়া হয়েচে অথচ ঠাক্‌রুণকে খর্ব্ব ক'রে তিনমাত্রায় নামানো গেল। অপরাধ ঘটেচে ব'লে মনে করিনি।

কুস্তির আখড়ায় ভিস্তিকে ধরে
জল ছিটাইয়া দাও ধুলা যাক মরে।

অপর পক্ষে

রাস্তা দিয়ে কুস্তিগির চলে ঘেঁষাঘেঁষি,
এক্‌টা নয় দুটো নয় একশোর বেশি।

প্রয়োজন মতো এটাও চলে ওটাও চলে।

নিখ্‌তির মাপে বিচার করতে গেলে বিশুদ্ধ ওজনের পয়ার হচ্চে,—

—পালোয়ানে পালোয়ানে চলে ঘেঁষাঘেঁষি—

তাতে প্রত্যেক অক্ষর নিখুঁৎ একমাত্রা, সবশুদ্ধ চোদ্দটা। রাস্তা কুস্তি প্রভৃতি শব্দে ওজন বেড়ে যায় তবুও বহুসহিষ্ণু পয়ারকে কাবু করতে পারে না।

প্রাকৃত বাংলার ক্রিয়াপদ নিয়ে কথা হচ্ছিল। ক্রিয়াপদেই তার আপন চেহারা। ঐটুকু ছাড়া তার আর কোনো উপসর্গ নেই বল্‌লেই চলে। বাংলা সংস্কৃত ভাষার মতো সে শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়। ভোজে বসে গেচে ব্রাহ্মণ, তাকে পরিবেষণকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করলে নিরামিষ না আমিষ, সে বল্‌লে, ঘৌকর্ত্তব্যো। তেমনি শব্দ বাছাই নিয়ে যদি প্রাকৃত বাংলাকে প্রশ্ন করা যায়, কী চাই, প্রাকৃত শব্দ না সংস্কৃত শব্দ? সে বল্‌বে ঘৌকর্ত্তব্যো। তার জাতবিচার নেই বল্‌লেই হয়। পছন্দ হবামাত্র ইংরেজি পারসী সব শব্দই সে আত্মসাৎ করে।

আবার অমরকোষবিহারী বড়ো বড়ো বহরওয়ালা সংস্কৃত শব্দকে ওদেরি ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে নেয়। সংস্কৃত ভাষার প্রতি সম্ভ্রমবশত তার মুখে বাধ্‌বে না—

রূপ যৌবন উপঢৌকন
দেবেন কন্যা তাহারে
তাই পরেচেন চীনাংশুকের
পট্টবসন বাহারে।

নন্‌-কো-অপরেশনের দিনেও ইংরেজি শব্দ চালিয়ে দিতে পিকেটিঙের ভয় নেই। যথা—

আইডিয়াল নিয়ে থাকে, নাহি চড়ে হাঁড়ি,
প্র্যাকটিক্যাল লোকে বলে, এ যে বাড়াবাড়ি।
শিবনেত্র হোলো বুঝি, এইবার মোলো,
অক্‌সিজেন নাকে দিয়ে চাঙ্গা ক'রে তোলো।

কিন্তু সংস্কৃত বাংলায় বাচবিচার খুব কড়া। আধুনিকদের হাতে পড়ে ম্লেচ্ছপনা কিছু কিছু সয়ে গেচে, কিন্তু সেটুকু বড়ো জোর বাইরের রোয়াকে—ভিতরমহলে রীতরক্ষা সম্বন্ধে কষাকষি।

কর্ণে দিলা ঝুম্‌কাফুল, নাসিকায় নথ,
অঙ্গ-সজ্জা সমাধানে ভূরি মেহন্নৎ।

এটাকে প্রহসন ব'লে পাঠক হয়তো মাপ করতে পারেন কিন্তু প্রাকৃত বাংলায় এই রকম ভিন্ন পর্য্যায়ের শব্দগুলো যখন কাছাকাছি বসানো যায় তাদের আওয়াজের মধ্যে অত্যন্ত বেশি বেমিল হয় না। আমার এই গদ্য প্রবন্ধ পড়ে দেখলে পাঠকেরা সেটা লক্ষ্য করতে পারবেন।

কিন্তু এটাও দেখে থাক্‌বেন এটার মধ্যে করিব করিয়াছে করিয়াছিল প্রভৃতি ক্রিয়ারূপ কলমের কোনো ভুলে ঢুকে পড়বার সম্ভাবনা নেই। সেইজন্যে আমরা বাংলায় সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে দুই ভিন্ন নিয়মেই চলি— তার অন্যথা করা অসম্ভব। তাই বাংলা কাব্যে এই দুই ভাষার ধারায় ছন্দের রীতি যদি দুই ভিন্ন পথ নিয়ে থাকে তবে সেই আপত্তিতে শুদ্ধির গোময় লেপনে সমস্ত একাকার করবার পক্ষপাতী আমি নই। আমি বলি দ্বৌকর্ত্তব্যৌ। কারণ ছন্দের এই দ্বিবিধরসেই আমার রসনার লোভ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদ

১

জড়বাদ *Vs.* জীববাদ

কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে, দার্শনিক মতকে মোটামুটি দুইটি বিরোধী কোঠায় স্থাপন করা যাইতে পারে—এক জড়বাদ (Materialism), অন্য জীববাদ (Spiritualism)। জড়বাদীর মতে—এই বিবিধ-বৈচিত্র্যময় বিশাল বিশ্ব, জড়-শক্তিতাড়িত অন্ধ পরমাণুপুঞ্জের যদৃচ্ছাজাত সংঘাত মাত্র—যাহাকে 'fortuitous concourse of atoms' বলে। জীববাদী ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন—না, ঈক্ষতেঃ নাশব্দম্—জগদ্-রচনার পশ্চাতে ঈক্ষা (অভিসন্ধি, Purpose) লক্ষ্য করা যাইতেছে—অতএব 'অশব্দ' (জড় = Matter) ইহার মূল কারণ হইতে পারে না।

আত্মা বা ইদমেক অগ্র আসীৎ × × স ঈক্ষত—ঐতরেয়, ১।১

'আদিতে একমাত্র পরমাত্মাই ছিলেন—তাঁহার 'ঈক্ষা' হইতেই বিশ্বের বিবর্ত্তন।' অর্থাৎ

'Universal Mind has to appear before there can be manifestation.'

জড়বাদী বলেন—'Life and Mind are merely bye-products of the world-process'—প্রাণ ও চিত্ত এই বিশ্ব ব্যাপারের অবান্তর ঘটনা মাত্র। জীববাদী বলেন—সে কি কথা ? Mind is behind matter—জড় হইতে জীব নহে—জীব হইতেই জড়।

অনেনৈব জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ—ছান্দোগ্য, ৬।৩।৩

'তিনিই জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের প্রভেদ করিলেন'।

আর প্রাণ ?

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং, প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্—কঠ, ৬।২

'এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ইহা প্রাণের প্রেরণায় নিঃসৃত হইয়াছে' এবং প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্—প্রশ্ন, ২।৬

অতএব 'the origin of forms is Life,' which as Elan Vital has 'carried life by more and more complex forms to higher and higher destinies.'

অধিকন্তু এই প্রাণ = প্রজ্ঞাত্মা—উহা অজর, অমর, আনন্দস্বরূপ।

স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ—কৌষীতকী, ১।৮

জড়বাদী দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না—দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ। তিনি বলেন চৈতন্য 'মদশক্তিবৎ', জড় অণু-পরমাণুর Chemical reaction বা রাসায়নিক প্রতিস্পন্দ মাত্র,—সেইজন্য দেহের নাশের সহিত চৈতন্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। Survival of man বাজে কথা—

ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ?

আর চিন্তা ? চিন্তা ত মস্তিষ্কের ব্যাপার মাত্র—Thought is a function of the Brain। যেমন যকৃৎ পিত্ত নিঃসরণ করে, তেমনি মস্তিষ্ক হইতে চিন্তা নিঃসৃত হয়—As the liver secretes bile, so the brain secretes thougtht। অতএব কামনা, ভাবনা, চেষ্টনা, (Emotion, Intellection, Conation—Feeling, Thinking, Willing) এ সমস্তই মস্তিষ্কের পরিস্পন্দ (vibrations of the brain-cells)।

জীববাদী জড়বাদীর এই অতিমাত্র সাহসিকতায় বিস্মিত হইয়া বলেন—দেখ, 'Consciousness is the absolute world-enigma' (James)—সম্বিৎ (চৈতন্য) বিশ্বের প্রধানতম প্রহেলিকা! সেই অদ্ভুত, আজব ব্যাপারকে তুমি এক নিঃশ্বাসে সমাধান করিয়া ফেলিলে! জান না কি ? The supreme blasphemy is the denial of the indestructible essence within us (Schopenhauer).

আত্মার কি জন্ম মৃত্যু আছে ?

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ—কঠ, ২।১৮

আত্মা যে, অজর অমর অক্ষর বস্তু—

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে—কঠ, ২।১৮

দেহের নাশে জীবের বিনাশ হইবে কিরূপে ?

জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়তে—ছান্দোগ্য, ৬।১১।৩

জীবের অপগমে শরীরেরই নাশ হয়—জীবের কখনও বিনাশ হয় না—'For him the hour shall never strike'। এই যে শরীর—অশরীরী আত্মার ইহা অধিষ্ঠান মাত্র—

—তদ্ অস্য অমৃতস্য অশরীরস্য আত্মনঃ অধিষ্ঠানম্— ছান্দোগ্য, ৮।১২।১

শরীর সম্বিতের জনক নহে, জনিত। 'It takes a soul to make a body' (Browning)—শরীরস্থায় দেহিনঃ (কঠ, ৫।৭)। আর তোমার ভরসার সর্ব্বস্ব ঐ মস্তিষ্ক—সে ত মনের করণমাত্র—The brain is an organ of the mind—অতএব ভঙ্গুর ভেলায় ভর করিও না। আরও দেখ, এই যে সম্বিৎ (যাহাকে তুমি মস্তিষ্কের বিকার বলিতে চাও), সে সম্বিৎ স্বয়ংপ্রভা—তাহার উদয়াস্ত নাই—সে চিরন্তন, সনাতন।

মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমায়াতি সম্বিদ্ এষা স্বয়ংপ্রভা ॥—পঞ্চদশী

জীব-সম্বিৎ সেই বিশ্ব-সম্বিতেরই ভগ্নাংশ, সেই রসামৃত-সিন্ধুর বিন্দু, (a fragment of the Divine Consciousness)—

'Each of us is only a partial incarnation of a larger self.'
—(Frederick Myer)

'We are each of us larger than we know' (Sir Oliver lodge).

বস্তুতঃ আমরা অমৃতের পুত্র—শৃণ্বন্তু সর্ব্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ (ঋগ্বেদ) —আত্মবিস্মৃত হইয়া শোক-মোহের অধীন হইয়া আছি—অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ (শ্বেত, ৪।৭)—'We are really gods in exile'—এখানে অজ্ঞাতবাসে রহিয়াছি।

প্রকৃতপক্ষে 'Our birth is but a sleep and a forgetting' (Wordsworth)—ঐ বিস্মৃতির অতল মথিয়া কখনও কখনও পূর্ব্বকাহিনী জাগ্রত হয়। তখন কবিরের সহিত সুর মিলাইয়া প্রশ্ন উঠে—

শুন হংসা পুরাতন বাত।
কোন মুলুকসে আয়সি হংসা
উৎরন্দে কোন ঘাট ?

কারণ, সত্য সত্যই

Trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home.—Wordsworth.

তখন মেষের দলে প্রবিষ্ট সিংহ-শিশু 'স্মৃতিলম্ভে' গর্জ্জন করিয়া বলে—

যেনাহং নামৃতা স্যাং তেন কিং কুর্য্যাম্—বৃহ, ২।৪।৩

এবং

জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্য মীশম্
অস্য মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ—মুণ্ডক, ৩।১।২

—স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করতঃ স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া শীঘ্রশো হয়। ইহাই জীবের প্রকৃত নিয়তি—দেহের সহিত সারূপ্য করিয়া সনাত পক্ষে শূকরবৃত্তি জীবের নিয়তি নহে।

জড়বাদী বলেন, যুগযুগান্ত ধরিয়া প্রকৃতির বিবর্ত্তনে প্রাণিশরীরে ইন্দ্রিয়ের উদ্‌গম হইলে, তবে দর্শন-স্পর্শনরূপ মনোবৃত্তির উদয় হইতে পারে। অর্থাৎ এ মতে, আগে ইন্দ্রিয়—পরে ব্যাপার (Organ precedes Function)। জীববাদী এ কথা অস্বীকার করেন; তিনি ফরাশি জৈববিজ্ঞানবিদ লামার্কের মতের পোষকতা করিয়া বলেন—Function precedes Organ—অর্থাৎ আগে ব্যাপার—পরে, ব্যাপারের সৌকর্য্যের জন্য ইন্দ্রিয়।

দর্শনায় চক্ষুঃ। অথ যো বেদ ইদম্ জিঘ্রাণি ইতি স আত্মা, গন্ধায় ঘ্রাণম্। অথ যো বেদ ইদম্ অভিব্যাহরাণি ইতি স আত্মা, অভিব্যাহরণায় বাক্। অথ যো বেদ ইদম্ শৃণবানি ইতি স আত্মা, শ্রবণায় শ্রোত্রম্—ছান্দোগ্য, ৮।১২।৪

অর্থাৎ

আত্মার দর্শনের ইচ্ছা হইলে চক্ষুঃ, ঘ্রাণের ইচ্ছা হইলে নাসিকা, বচনের ইচ্ছা হইলে বাক্, শ্রবণের ইচ্ছা হইলে শ্রোত্রের উৎপত্তি হয়।

ঐ ঐ ইন্দ্রিয় ব্যাপারের সাধকমাত্র, জনক নহে। কারণ সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তির অদ্বিতীয় উৎস সেই আত্মা—

অকৃৎস্নোহি সঃ। প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি, বদন্ বাক্, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণ্বন্ শ্রোত্রং, মন্বানঃ মনঃ। তানি এতানি কর্ম্মনামানি এব—বৃহ. ১।৪।৭

'সেই আত্মা অকৃৎস্ন (যেন divided)। প্রাণনকালে তিনি প্রাণ, বচনকালে বাক্, দর্শনকালে চক্ষুঃ, শ্রবণকালে শ্রোত্র, মননকালে মনঃ। এ সমস্ত তাঁহার কর্ম্মনাম মাত্র (names for his functionings)।

সেই জন্য জীববাদীর মতে প্রাণিদেহস্থ করণগুলি (organs) ইন্দ্রিয়-দ্বার মাত্র—ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রকৃত কেন্দ্র আত্মায়। অতএব,

ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ, ন গন্ধং বিজিজ্ঞাসীত ঘ্রাতারং বিদ্যাৎ, ন রূপং বিজিজ্ঞাসীত রূপবিদ্যং বিদ্যাৎ, ন শব্দং বিজিজ্ঞাসীত শ্রোতারং বিদ্যাৎ, ন রসং বিজিজ্ঞাসীত রসস্য বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ, ন কর্ম্ম বিজিজ্ঞাসীত কর্ত্তারং বিদ্যাৎ × × ন মনো বিজিজ্ঞাসীত, মন্তারং বিদ্যাৎ—কৌষীতকী, ১।৮

'বাক্যকে নয় বক্তাকে, ঘ্রাণকে নয় ঘ্রাতাকে, রূপকে নয় দ্রষ্টাকে, শব্দকে না শ্রোতাকে, রসকে নয় রসয়িতাকে, কর্ম্মকে নয় কর্ত্তাকে, মনকে নয় মন্তাকে জানিতে হয়।'

অতএব দেখা গেল,

জড়বাদ জীববাদে বহুত অন্তর
এক অন্ধ তমঃ অন্য নির্ম্মল ভাস্কর।

এই মতদ্বৈধ স্থলে যাজ্ঞবল্ক্যের সিদ্ধান্ত কোন্ পক্ষের অনুকূল?

অদ্বৈতবাদে জীবজড়ের স্থান

কিন্তু এ কথা আলোচনার পূর্ব্বে, পাঠককে একটা বিষয়ে সতর্ক করিতে চাই। আমরা জানি, যাজ্ঞবল্ক্য অকুণ্ঠ অদ্বৈতবাদী—তিনি uncompromising Idealist। তাঁহার নিপট নির্ভীক অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মই সর্ব্বেসর্ব্বা—তিনিই পরমার্থ, অ-প্রতিদ্বন্দ্বী সত্য, একমেবাদ্বিতীয়ম্। যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টিতে, জীব ও জড় মায়ার বিজৃম্ভণ—অলীক, অবস্তু, প্রতিভাস, ভাণমাত্র—'The individual soul is an apparition as the external world is an appearance'। কারণ, তাঁহার মতে, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।† কিন্তু দ্বৈতের সমতল ক্ষেত্র ছাড়িয়া, অবিদ্যাগ্রস্ত মানবচিত্ত কতক্ষণ এই অদ্বৈতের তুঙ্গ ভূমিতে সুস্থিত থাকিতে পারে? সেখানে উঠিলে, অচিরে তাহার গা 'ছমছম' করে, তাহার চিন্তার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। মানুষের এই স্বভাবসিদ্ধ দুর্ব্বলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য অদ্বৈতের উচ্চ ব্যোম হইতে দ্বৈতের উপত্যকায় অবতরণ করিয়া, তবে—as a concession or accommodation to the empircal consciousness—জড় ও জীব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।* এই উপদেশ আলোচনার সময়, আমরা যেন কদাচ বিস্মৃত না হই যে, যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, জড় তত্ত্বতঃ ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র এবং জীব উপাধি-উপহিত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। এ কথা সর্ব্বদা স্মরণে না রাখিলে, যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট জীববাদের গহন মধ্যে আমাদের বিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। তাই শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার গুরুর গুরু গৌড়পাদ আমাদিগকে এত সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

† The Atman is the sole reality; there can be nothing beside it. * * From this point of view, no creation of the universe by the Atman can be taught, for there is no universe outside of the Atman. * * The Individual Atmans are not properly distinct from the Supreme Atman. Each of them is in full and complete measure the Supreme Atman himself. * * Accordingly the entire individual soul as such has no reality.—Deussen. pp 183 & 256.

* The loftiness of this metaphysical conception forbade its maintenance in the presence of the empirical consciousness, which teaches the existence of a real universe. It was necessary to concede the reality of the universe and to reconcile this with the idealistic dogma of the sole reality of the Atman, by asserting that the universe exists but is in truth nothing but the Atman. * * * The same spirit of accommodation lies at the basis of the form assumed by the doctrine of the Brahman as the psychical principle viz., that, Brahman having created the universe enters into it as the Individual Soul. * * It then however more and more stiffens into an actual realism.—Deussen's Philosophy of the Upanisads, pp 184 & 171.

উপদেশাদ্ অয়ং বাদঃ জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে। × ×
উপায়ঃ সোবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন।

—মাণ্ডূক্য-কারিকা ১।১৮, ৩।১৫

'শাস্ত্রে যে সৃষ্টি প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা মন্দবুদ্ধি শিষ্যের উপদেশের জন্য —কেবল বুদ্ধিপ্রবেশের উপায় রূপে। বস্তুতঃ তদ্দ্বারা দ্বৈত, নানাত্ব উপদিষ্ট হয় নাই।'

মৃদাদি দৃষ্টান্তৈ র্হি সতো ব্রহ্মণ একত্ব সত্যত্বং বিকারস্য চ অনৃতত্বং প্রতিপাদয়ৎ শাস্ত্রং ন উৎপত্ত্যাদিপরং ভবিতুম্ অর্হতি—৪।৩।১৪ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ 'শাস্ত্র যে ক্ষিত্যাদির দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন তদ্দ্বারা জগতের বাস্তবিক সৃষ্ট্যাদি উপদিষ্ট হয় নাই।'

জগৎ সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্যের কি বক্তব্য, 'পরিচয়ে'র কার্ত্তিক সংখ্যায় তাঁহার উপদিষ্ট ব্রহ্মবাদের বিবরণে, আমরা মোটামুটি তাহা জানিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, তাঁহার মতে 'the obtrusive reality of the manifold universe is merely Maya। এখন তাঁহার জীববাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কিংজ্যোতিঃ পুরুষঃ ?

বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতেছেন—'যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিঃ অয়ং পুরুষঃ—এই যে পুরুষ বা জীব, কি ইহাঁর জ্যোতিঃ ? কাহার জ্যোতিতে ইনি জ্যোতিষ্মান্, কাহার দ্যুতিতে দ্যুতিমান্ ?' উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'আদিত্যই ইহার জ্যোতিঃ—আদিত্যেনৈব অয়ং জ্যোতিষা আস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতি—আদিত্যরূপ জ্যোতিঃদ্বারাই পুরুষ আসন করে, গমন করে, কর্ম্ম করে, প্রতিগমন করে।' জনক বলিলেন, 'তা বটে, কিন্তু অস্তমিতে আদিত্যে ? আদিত্য অস্তমিত হইলে ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'তখন চন্দ্রমা এবাস্য জ্যোতির্ভবতি, চন্দ্রমা ইহার জ্যোতিঃ হয়।' জনক বলিলেন, 'অস্তমিতে আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য ! চন্দ্রমসি অস্তমিতে, কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'চন্দ্রসূর্য্য উভয়েই অস্তমিত হইলে অগ্নিই পুরুষের জ্যোতিঃ হয়।' জনক বলিলেন—'তা বটে, কিন্তু অগ্নি স্তিমিত হইলে শান্তে অগ্নৌ কিংজ্যোতিঃ এবায়ং পুরুষঃ ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'তখন বাক্যই ইহার জ্যোতিঃ হয়—বাগেবাস্য জ্যোতির্ভবতি।' জনক বলিলেন, 'তা বটে, কিন্তু শান্তে অগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ ? অগ্নি স্তিমিত হইলে, বাক্য স্থগিত হইলে, তখন পুরুষের কি জ্যোতিঃ হয় ?' এইবার যাজ্ঞবল্ক্য চরম উত্তর দিলেন—'আত্মৈব অস্য জ্যোতির্ভবতি—তখন আত্মাই পুরুষের জ্যোতিঃ হয়—আত্মনা এবায়ং

১০৫৮]

জ্যোতিষা আস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতি—আত্মারূপ জ্যোতিঃ দ্বারাই পুরুষ আসন করে, গমন করে, কর্ম্ম করে, প্রতিগমন করে।' অর্থাৎ জীবের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত ব্যাপারের পশ্চাতে এই আত্মা।

কতমঃ আত্মা ?

তখনি প্রশ্ন উঠিল 'কতমঃ আত্মা ?' উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।৭

'যিনি বিজ্ঞানময়, যিনি প্রাণ-সমূহের পশ্চাতে (behind the organs of sense), হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ।'

যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট জীববাদের ইহাই মর্ম্ম কথা—এ কথা হৃদয়ঙ্গম না হইলে তাঁহার অভিমত জীবতত্ত্বে প্রবেশ করা যায় না। এই কথা বুঝাইবার জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য জীবের উৎক্রান্তি ও পরলোকগতির বর্ণনা করিয়াছেন এবং জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ের পরিচয় দিয়া অবসানে বলিয়াছেন,—

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে—বৃহ, ৪।৪।২২

বৃহদারণ্যক-উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে অজাতশত্রু-বালাকি-সংবাদে আমরা এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই।

যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূৎ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ তদ্ এষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায় স এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে—২।১।১৭

শুধু তাই কেন ? উপনিষদের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইলে বুঝিতে পারা যায়, সমগ্র উপনিষৎ এই কথার ঝঙ্কারে মুখরিত। এ কথার প্রকৃত মর্ম্ম কি ?

একোঽহং বহুঃ স্যাম্

উপনিষদের মুখ্য বাণী—একমেবাদ্বিতীয়ের বহুরূপে আত্মপ্রকাশ।

তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়—ছান্দোগ্য, ৬।২।৩

পুরুষো হবৈ নারায়ণঃ অকাময়ত—প্রজাঃ সৃজেয় ইতি।—নারায়ণ, ১

ইহা তাঁহার 'লীলাকৈবল্য'—ইচ্ছাময়ের 'খামখেয়াল'।

সত্যানৃতোপভোগার্থো দ্বৈতীভাবো মহাত্মনঃ—মৈত্রী, ৭।১১

কিন্তু বহু হইলেও সেই অদ্বিতীয়ের একত্ব কখনও ব্যাহত হয় না—তিনি খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, বহুর মধ্যে একরূপে সর্ব্বদা

সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। উপনিষদ্ নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গীতে এই কথা বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছেন।

যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি, এবমেব অস্মাদ্ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ * * সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—বৃহ, ২।১।২০

'যেমন অগ্নি হইতে বহুতর ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ (sparks) নির্গত হয়, তেমনি সেই পরমাত্মা হইতে এই সমস্ত প্রাণ, সমস্ত ভূত নিঃসৃত হইয়াছে।' অতএব ব্রহ্মের পরিচয় এই—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (তৈত্তি, ৩।১) —'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূতের উদ্ভব হইয়াছে।' মুণ্ডকের উপদেশ ইহারই অনুরূপ।

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥—২।১।১
[ভাবাঃ=জীবাঃ—শঙ্কর]

'যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সরূপ (সমান-রূপ) বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি কল্পারম্ভে সেই অ-ক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে বিবিধ জীব আবির্ভূত হয় এবং (কল্পান্তে) তাঁহাতে তিরোহিত হয়।'*

সেই জন্য ব্রহ্ম বা পরমাত্মা 'প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্' (মাণ্ডুক্য, ৬) —সমস্ত জীবের প্রভব ও প্রলয়ের স্থান—কবি বিদ্যাপতির ভাষায়,

তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমায়ত
সাগর-লহরী সমানা।

জলে যেমন বুদ্বুদ, সমুদ্রে তেমন তরঙ্গ, ব্রহ্মে তেমনি জীবের ব্যক্তি ও অব্যক্তি—আবির্ভাব ও তিরোভাব।

যস্মিন্ ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে লীনাশ্চাব্যক্ততাং যযুঃ।
পশ্যন্তি ব্যক্ততাং ভূয়ো জায়ন্তে বুদ্বুদা ইব ॥—চুলিকা, ১৮

যাজ্ঞবল্ক্য এই তত্ত্বই একটু ভিন্ন রকমের উপমা দ্বারা বুঝাইয়াছেন—সর্ব্বানি চ ভূতানি অস্যৈব (মহতো ভূতস্য) এতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি
—বৃহ ৪।৫।১১

'এই সমস্ত ভূত, সেই মহৎ ভূত (পরমাত্মারই) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস'—কারণ, তিনিই আনীৎ অবাতম্ (ঋগ্বেদ)—The 'Great Breath' breathed,—but without breath—ফলতঃ জীবের আবির্ভাব তাঁহার

* The spark hangs from the flame by the finest thread of Fohat.
—Book of Dzyan.

The Sun Divine throws off *spark*-suns charged with all His attributes * * * sparks of Divinity to be fanned into flames through this great process of Evolution.—Dr. G. S. Arundale's 'Nirvana'.

১৩শ]

প্রশ্বাস (outbreathing) এবং জীবের তিরোভাব তাঁহার নিঃশ্বাস (inbreathing)। অতএব জীব হইতেছে a 'Divine fragment' —'a portion of the Universal consciousness thought into separation as an individual entity'।

জীব—ব্রহ্মের অংশ

সমুদ্রের সহিত তরঙ্গের যে সম্বন্ধ, জলের সহিত বুদ্বুদের যে সম্বন্ধ, অগ্নির সহিত স্ফুলিঙ্গের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত জীবেরও সেই সম্বন্ধ। জীব ব্রহ্মের অংশ—সেই চিৎসিন্ধুর বিন্দু। তাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীতা, ১৫।৭

ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণেরও ঐ উপদেশ—

অংশো নানা-ব্যপদেশাৎ—২।৩।৪৩

অংশ ও অংশীর তত্ত্বতঃ (essentially) কোন প্রভেদ নাই, থাকিতে পারে না, কারণ, উভয়েই 'সরূপ'—সমানরূপ—'God made man in His own image' (Genesis, I,27)—শঙ্করের ভাষায়, অগ্নেহি বিস্ফুলিঙ্গঃ অগ্নিরেব।

ব্রহ্ম যখন সচ্চিদানন্দ—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম (তৈত্তি, ২।১।১) —তখন তদংশ জীবও সচ্চিদানন্দ।

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্ * —পঞ্চদশী, ৩।২৮

সেইজন্য কি ঋগ্বেদ, কি যজুর্বেদ, কি সামবেদ, কি অথর্ব্ববেদ—সকল বেদের মহাবাক্য সমস্বরে জীব-ব্রহ্মের অভেদ ঘোষণা করিয়াছে—

সোহম্, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি।

বিজ্ঞানাত্মা বা Monad

বিশেষভাবে ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘন (বৃহ ৪।৫।১৩)—কবিরের কথায়, 'সদ্গুরু নূর তামাম'। তিনি চিন্ময়—সেইজন্য তাঁহার একটি সংজ্ঞা

* This Divine spirit (Monad)—a ray from the Logos, has the triple nature of the Logos himself and the evolution of man as man consists in the gradual manifestation of these three aspects, their development from latency into activity.—Dr. Annie Besant's Ancient Wisdom pp. 213-4.

Man is made in the image of God * * The Divine spark of the spirit in man is seen to be triple in its appearance.
—C. W. Leadbeater's Man, Visible and Invisible.

‘চিদাকাশ’। তদংশ জীব চিৎকণ (জ্বলিতাগ্নেঃ কণা ইব)—[illegible] তাঁহার সার্থক নাম ‘চিন্মাত্র’। ইনিই পাশ্চাত্য দার্শনিকের ‘Monad’। যে হেতু ‘বিজ্ঞানম্ ব্রহ্ম’, সেই জন্য তদংশ ‘চিন্মাত্র’ জীবের [illegible] দিতে গিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যোয়ং বিজ্ঞানময়ঃ অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ— অর্থাৎ The Monad is the knowing subject apart from object.

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া মোন্যাডকে মুণ্ডক ‘বিজ্ঞানময় আত্মা’ [illegible] প্রশ্ন ‘বিজ্ঞানাত্মা’ বলিয়াছেন—

> কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি—মুণ্ডক, ৩।২
> বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ—প্রশ্ন, ৪।১১

উপনিষদে ‘আত্মা’-শব্দ ব্রহ্ম ও জীব, উভয়েরই প্রতিশব্দরূপে [illegible] হইয়াছে। ব্রহ্ম = পরমাত্মা (Oversoul), তদংশ জীব (Monad [illegible] Individual Soul) = প্রত্যগাত্মা বা অন্তরাত্মা।

> কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যাগাত্মানম্ ঐক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্—কঠ, ৪।১
> অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ—কঠ, ৬।১৭

জীবব্রহ্মের অভেদ

এই অন্তরাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন—সেই জন্য কঠ-উপনিষদ্ অন্তরাত্মার উল্লেখ করিয়া একই নিঃশ্বাসে বলিলেন—তং বিদ্যাৎ শুক্রম্ অমৃতম্—‘তিনিই শুদ্ধ অমৃতস্বরূপ পরমাত্মা।’ যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে ঐ বিজ্ঞানময় পুরুষ বা প্রত্যগাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ পরমাত্মার সহিত তাঁহার অভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন*—

> এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ—বৃহ, ৩।৭।৩-২৩
> যঃ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম যঃ সর্ব্বান্তরঃ × × এষ তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ
> —বৃহ, ৩।৪।১,৩।৫।১

> স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম—বৃহ, ৪।৪।৫

ছান্দোগ্যেরও ঐ এক কথা—.

> তৎ সত্যং স আত্মা তৎত্বমসি—ছা, ৬।৭।৭
> এষ তে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে এতৎ ব্রহ্ম—ছা, ৩।১৪।৪

* অন্যত্র বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—বায়ুরেব ব্যষ্টিঃ বায়ুঃ সমষ্টিঃ (৩।৩।২)। [illegible] বায়ু=জীব ও সমষ্টি বায়ু=ব্রহ্ম এবং উভয়ে অভিন্ন। সমষ্টি বায়ু সেই সূত্র, যদ্দ্বারা সমস্ত লোক, সমস্ত [illegible] বিধৃত—বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রং যেন অয়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণিচ ভূতানি সংদৃব্ধানি [illegible] ৩।৭।২। এই সমষ্টি-বায়ুই সেই সূত্রাত্মা (ব্রহ্ম)—ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব [illegible] আর ব্যষ্টি বায়ু জীব, ‘বায়ুঃ অনিলম্ অমৃতম্’ (ঈশ-উপনিষদ্)—দেহান্তে অমৃত বায়ুতে (ব্রহ্মে) বিলীন [illegible]

মোন্যাডের স-দেহত্ব

ঐ ব্রহ্মবিন্দু, চিৎকণ, স্ফুলিঙ্গরূপী প্রত্যগাত্মা (Monad), পরমাত্মা হইতে নিজের ব্যক্তিত্ব বা ব্যাবহারিক ভেদ (phenomenal separation) সিদ্ধ করিবার জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া শরীর গ্রহণ করেন।

> মনোকৃতেন আয়াতি অস্মিন্ শরীরে—প্রশ্ন, ৩।৩

এইরূপে অংশ-জীব অংশী ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হন এবং তাঁহার স-দেহত্ব হয়। সেইজন্য উপনিষদের স্থানে স্থানে তাঁহার নাম ‘দেহী।’

> রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি—শ্বেত, ৫।১২ (দেহী-বিজ্ঞানাত্মা—শঙ্কর)

ইহার অনুসরণ করিয়া শ্রীযুক্তা অ্যানিবেসান্ট তাঁহার ‘A study in Consciousness’ গ্রন্থে মোন্যাড বা প্রত্যগাত্মার এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন —‘A fragment of the Divine Life, separated off into an individual entity by rarest film of matter, এবং প্রত্যগাত্মার দেহের—ঐ ‘rarest film of matter’এর নাম দিয়াছেন ‘Auric body’। মৈত্রায়ণী-উপনিষদ্ ইহাকে ‘হৃত্যাকাশময় কোশ’ বলিয়াছেন—

হৃত্যাকাশময়ং কোশম্ আনন্দং পরমালয়ম্—এই কোশই জীবের পরম আলয়—চরম দেহ ; এবং জীবরূপী ব্রহ্মের আবাস বলিয়া ঐ সুসূক্ষ্ম কোশের নাম ব্রহ্মকোশ।

> ওঁকার-প্লবেন অন্তর্হৃদয়াকাশস্য পারং তীর্ত্বা × × এবং ব্রহ্মশালাং বিশেৎ ততশ্চ চতুর্জ্জালং ব্রহ্মকোশং প্রণুদেৎ। ততঃ শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ × × স্বে মহিম্নি তিষ্ঠতি—মৈত্র, ৬।২৮

> ‘ওঁকাররূপ নৌকায় অন্তর্হৃদয়াকাশের পারে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মশালায় প্রবেশ করিবে। পরে শুদ্ধ পূত শূন্য হইয়া ব্রহ্মকোশ ভেদ করিয়া স্ব মহিমায় অবস্থিত হইবে।’

এই ব্রহ্মকোশ-উপস্থিত ব্রহ্মচৈতন্যই জীব—

> কোশোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্—পঞ্চদশী।

এই চরমালয় ব্রহ্মকোশ (‘rarest film of matter’) কি উপাদানে গঠিত? প্রপঞ্চাতীত পরব্যোমের পরমাণু দ্বারা।* ইহাকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণ উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

* এ প্রসঙ্গে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি—This body (ব্রহ্ম কোশ) is said to be composed of nonprakritic matter (অর্থাৎ পরব্যোম) which does not belong to our system at all—matter which has not been modified by the life of our Logos, but belongs to and forms part of the general store of Cosmic matter, a portion of which has been appropriated by our Logos for the purposes of our system. It is this auric body which separates the jiva into an individual.

নীলতোয়দমধ্যস্থ-বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা।
নীবার-শূকবৎ তন্বী পীতা ভাস্বত্যণূপমা ॥

'এই কোশ অতি সূক্ষ্ম, নবজাত ধান্যাগ্রের মত তনু এবং নীলমেঘ বিদ্যুৎ তুল্য ভাস্বর।'

ইহাই যাজ্ঞবল্ক্যের অন্তর্হৃদয়াকাশ—য এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশ তস্মিন্ শেতে।

ইহাকেই উপনিষদ্ কোথাও কোথাও 'গুহা', 'গহ্বর', 'হৃৎ', 'হৃদয়', 'হৃৎপদ্ম' বলিয়াছেন—

গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণম্—কঠ, ২।১২
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্—কঠ, ২।২০
হৃদি অয়ম্ ইতি হৃদয়ম্—ছা, ৮।৩।৩। হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।৭
মনোময়োঽয়ং পুরুষঃ ভাঃসত্যঃ তস্মিন্ অন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্বা যবো বা—বৃহ, ৫।৬।১

ঐ পরব্যোমের পরমাণু-নির্ম্মিত হৃদ্যাকাশময় দেহের অণুত্বকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে ব্রীহি ও যবের উপমা প্রযুক্ত হইল। ছান্দোগ্যও বলিয়াছেন—

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্ বা সর্ষপাদ্ বা শ্যামাকাদ্ বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্ বা—৩।১৪।৩

'অন্তর্হৃদয়স্থ আত্মা ব্রীহির অপেক্ষা, যবের অপেক্ষা, সর্ষপের অপেক্ষা, শ্যামাকের অপেক্ষা, শ্যামাক-তণ্ডুলের অপেক্ষা অণু।'* সঙ্গে সঙ্গে তিনি পৃথিবীর অপেক্ষা, অন্তরিক্ষের অপেক্ষা, দ্যুলোকের অপেক্ষা, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অপেক্ষা বৃহৎ।

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ান্ এভ্যো লোকেভ্যঃ—ছা, ৩।১৪।৩

কারণ, এই প্রত্যগাত্মাই ত পরমাত্মা। সেই জন্য তিনি সকলেরই উপাস্য—

মধ্যে বামনমাসীনং সর্ব্বে দেবা উপাসতে—কঠ, ৫।৩

দেহরূপ রথে (শরীরং রথমেবচ—কঠ, ৩।৩) এই 'বামন'কে দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না—

রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

---

* সেই জন্যই ইহাঁকে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' 'বালাগ্রমাত্র' 'আরাগ্রমাত্র' বলা হয়—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি—কঠ ৪।১২

আরাগ্রামাত্রো হ্যপরোপি দৃষ্টঃ—শ্বেত ৫।৮। আরাগ্য=সূচাগ্র (Needle's point)
বালাগ্রমাত্রং হৃদয়স্য মধ্যে—অথর্ব্বশিরঃ।
এ সম্পর্কে শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।৬।৩ দ্রষ্টব্য।

চিন্মাত্র=চিদাকাশ

ছান্দোগ্য-উপনিষদের দহর-বিদ্যায় এই তত্ত্ব সুবিশদ করা হইয়াছে।

যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ। তস্মিন্ যদ্ অন্তঃ তদ্ অন্বেষ্টব্যম্—৮।১।১

'এই ব্রহ্মপুরে একটি ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক-গৃহ আছে। সেখানে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশের যাহা অন্তঃস্থিত, তাহারই অন্বেষণ করিতে হইবে।'

কিং তদ্ অত্র বিদ্যতে যৎ অন্বেষ্টব্যম্?

'সেখানে কি বস্তু আছে যাহা অন্বেষ্টব্য?'

এই প্রশ্নের উত্তরে ছান্দোগ্য বলিলেন—

এষ আত্মা অপহত-পাপ্মা—সেখানে সেই অপাপবিদ্ধ অন্তরাত্মার স্থান—যিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন।

যাবান্ বা অয়ম্ আকাশঃ, তাবান্ এষ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ—সেই 'আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ' পরমাত্মা (ব্রহ্ম) যেমন বৃহৎ, এই 'অণুরেষ আত্মা' ক্ষুদ্র দহরাকাশও তেমনি বৃহৎ। কারণ, উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, উভৌ অগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ, সূর্য্যাচন্দ্রমসা বুভৌ বিদ্যুৎ নক্ষত্রাণি, যৎ চাস্য ইহ অস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদ্ অস্মিন্ সমাহিতম্—ছান্দোগ্য ৮।১।৩

'উভয় দ্যৌ ও পৃথিবী, অগ্নি ও বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রনিচয়—বিশ্বে যে কিছু আছে, যে কিছু নাই—সমস্তই উহার অন্তঃস্থিত।'

নারায়ণ-উপনিষদে ইহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়—

দহ্রং বিপাপং পরবেশ্মভূতং
যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্।
তত্রাপি দহ্রং গগনং বিশোকং
তস্মিন্ যদ্ অন্তঃ তদুপাসিতব্যম্ ॥

"দেহরূপ পুরমধ্যে এক অতিক্ষুদ্র পুণ্ডরীক বিরাজিত আছে। সেই পুণ্ডরীকের অন্তরাকাশে যে পরম দেবতা শোকহীন পাপহীন গগন-সদৃশ অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে উপাসনা করিবে।' উপাসনা করিবে—কেননা, ঐ অন্তরাত্মাই পরমাত্মা।

বৃহদারণ্যক এই কথাই আরও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—সেই অন্তরাত্মা বা অন্তর্হৃদয়ে স্থিত পুরুষ —

স এষ সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ—৫।৬।১

'তিনি সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি, যাহা কিছু আছে সকলেরই শাসক।'

মাণ্ডূক্য-উপনিষদে ইহারই প্রতিধ্বনি—

এষ সর্বেশ্বরঃ এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষঃ অন্তর্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভাবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্—৬। এখানে এষ=বিজ্ঞানাত্মা (Monad)।

এই বিজ্ঞানময় পুরুষ বা Monad-এর পরিচয় দিতে গিয়া যাজ্ঞবল্ক্য অবশেষে বলিলেন—

—যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ × × য এষঃ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ তস্মিন্ শেতে সর্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ— ন স সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এব অসাধুনা কনীয়ান্ এষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ ভূতপতিঃ এষ ভূতপালঃ এষ সেতুর্বিধরণে এষাং লোকানাম্ অসংভেদায়—বৃহ, ৪।৪।২২।

'সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ (Monad)—যিনি হার্দ্দাকাশে শয়িত, তিনি সকলের বশী, সকলের ঈশান, সকলের অধিপতি—সাধুকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার উপচয় হয় না, অসাধু কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অপচয় হয় না। তিনি সর্ব্বেশ্বর, তিনি ভূতপতি, তিনি ভূতপাল, তিনি সমস্ত লোকের বিভাজক ধারক সেতু।'

পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্য এই বিজ্ঞানাত্মা (চিন্ময়) পুরুষের বর্ণনা করিতে গিয়া দুইটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করতঃ (তদ্ এতে শ্লোকাঃ ভবন্তি) বলিলেন—ইনিই 'হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ একহংসঃ।' ঋগ্বেদের সেই 'হংসঃ শুচিষৎ'—এষ হি খলু আত্মা হংসঃ (মৈত্র, ৬।৮)—যিনি—হংসো লেলায়তি বহিঃ—যিনি চরাচর সমস্ত লোকের প্রভু—বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্যচ—(শ্বেত, ৩।১৮)

অর্থাৎ এই যেMonad রূপী Individual Soul, it 'is in no respect different from Brahman but is very Brahman complete and entire'. পুনশ্চ Brahman is not in part only but undivided, completely and as a whole present in that which I with true insight find within me as my own self, my ego, my soul '—(Deussen).

কেন শরীর-গ্রহণ ?

এই 'হিরণ্ময় একহংস' অশরীরী প্রত্যগাত্মা কেন শরীর গ্রহণ করেন? ইহা দর্শন শাস্ত্রের অতি-প্রশ্ন, চরম সমস্যা। বিদেহী পরমাত্মা বিজ্ঞানাত্ম-রূপে কেন সদেহ হন ? এ প্রশ্নের উত্তরে শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥—৩।১৮

দেহী বিজ্ঞানাত্মা ভূত্বা: কার্য্যকরণোপাধিঃ সন্ হংসঃ পরমাত্মা লেলায়তে চলতি বহিঃ বিষয়গ্রহণায়—শঙ্কর

'চরাচরলোকের প্রভু পরমাত্মা, দেহী (বিজ্ঞানাত্মা) হইয়া বিষয়গ্রহণের জন্য চালিত হন।'

মৈত্র-উপনিষদের ইঙ্গিত আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি—

সত্যানৃতোপভোগার্থো দ্বৈতীভাবো মহাত্মনঃ।

পতঞ্জলি বলেন, দেহযোগের উদ্দেশ্য—স্বরূপোপলব্ধি—Self-realisation *—স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ (যোগসূত্র, ২।২৩)।

* পুরুষস্য দর্শনার্থম্—সাংখ্যকারিকা। You must awaken to a knowledge of your real being.—Prof. James.

এই প্রসঙ্গে একজন পাশ্চাত্য মনীষীর একটি সুচিন্তিত বাণী আমাদের প্রণিধানযোগ্য—

The value of 'incarnation' is to isolate it and sereen it from its pristine cosmic surroundings and enable it to develop individuality. ইহাকেই বলে 'Out of the everywhere into here.'

এই যে কেন্দ্রীকরণ, এই যে ব্যক্তিত্ব-সাধন, এই যে স্বাতন্ত্র্যের পোষণ—ইহা শরীর গ্রহণ ভিন্ন সিদ্ধ হইতে পারে না ; কারণ, শরীর গ্রহণের দ্বারাই জীব জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হয় এবং সেই সংস্পর্শের ফলে জীবের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ বহির্মুখ হইয়া ব্যঞ্জিত ও ব্যক্ত হয়। বাইবেলের ভাষায় He is sown in weakness in order to be raised in power। উপনিষদে জীবের উপভোগ্য জগৎকে আবসথ বা লোক বলা হইয়াছে। এই লোক সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের শিক্ষা কি ?

জীবের আবসথ (Environments)

মনীষী ফ্রেড্রিক্ মায়্যার তাঁহার বিরাট্ গ্রন্থ 'Human Personality'-তে অনেক আলোচনা ও গবেষণা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 'Man lives in three environments—the physical, the ethereal and the met-etherial, that which is called the heaven world.'

অর্থাৎ জীবের ভোগ্য ভূমিকা তিনটি—স্থূল, সূক্ষ্ম ও সুসূক্ষ্ম। এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন শিক্ষার অনুকূল। উপনিষদেও আমরা 'ত্রয়ঃ আবসথাঃ'র উল্লেখ পাই (ঐত, ১।৩)।* যাজ্ঞবল্ক্য অশ্বলের প্রশ্নের উত্তরে এই তিন আবসথ বা environments-এর নাম দিয়াছেন—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক (বৃহ, ৩।১।৮)। অন্যত্র ইহাদিগকে পৃথিবীলোক, অন্তরিক্ষ-লোক ও দ্যুলোক বলা হইয়াছে (বৃহ, ১।৫।১৬, ৫।১৪।১ ; ছান্দোগ্য, ৪।১৭।১)। অর্থাৎ জড়বাদীর অভিমত ইহলোকই জীবের সর্ব্বস্ব নহে—আরও উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর লোক আছে। বস্তুতঃ যাজ্ঞবল্ক্য ইহলোককে 'মৃত্যোঃ রূপাণি' বলিয়াছেন। †

* ঐতরেয় এই তিন 'আবসথ'কে স্বপ্নের সহিত তুলনা করিয়াছেন—তস্য (আত্মনঃ) ত্রয় আবসথাঃ ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ। ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—ননু জাগরিতং প্রবোধরূপত্বাৎ ন স্বপ্নঃ। নৈবং, স্বপ্ন এব। কথং ? পরমার্থ-স্বাত্মপ্রবোধাভাবাৎ, স্বপ্নবৎ অসদ্-বস্তু দর্শনাৎ চ। অর্থাৎ 'Waking, like dreaming is a delusion, since it reflects for us a manifold universe.' ইহার সহিত কবি শেলির উক্তি তুলনীয়—'Can Death be sleep when life itself is dream ?'

† ইমং লোকম্ অতিক্রামতি মৃত্যোঃ রূপাণি—বৃহ, ৪।৩।৭।—ইহার সহিত খৃষ্টীয় সাধুর নিম্নোক্তি তুলনীয়—Oh wretched man that I am—who shall deliver me from this body of death.

মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক মিলিয়া 'ত্রিলোকী'—ইহাদিগের পারিভাষিক নাম ভূঃ ভুবঃ স্বঃ। ইহাই গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাহৃতি—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ইত্যাদি। স্বঃ বা স্বর্গলোক (মায়ার যাহাকে Met-etherial বা Heaven world বলিয়াছেন)—তাহার উপর মহর্লোক। ইহাকে প্রজাপতিলোক বলে। প্রাজাপত্যঃ ততো মহান্। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেন, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতির উপর মহঃ চতুর্থী ব্যাহৃতি।

ভূর্ভুবঃ স্বরিতি বা এতাঃ তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসাম্ উ হ স্মৈতাং চতুর্থীম্ × × মহঃ ইতি—১।৪

মহঃ বা প্রজাপতিলোকের উপর ব্রহ্মলোক—উহাই উর্দ্ধতন লোক। সাধকের দেবযান-গতি বর্ণনা করিয়া কৌষীতকী বলিয়াছেন,

স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকম্—১।২।৩

যাজ্ঞবল্ক্যও জনকের নিকট ব্রহ্মানন্দের বিবরণ করিতে গিয়া পর পর মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্বলোক ও দেবলোকের উপরে প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোকের উল্লেখ করিয়াছেন।

অথ যে শতম্ আজানদেবানাম্ আনন্দাঃ স একঃ প্রজাপতি-লোকে আনন্দঃ × × অথ যে শতং প্রজাপতি-লোকে আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোকে আনন্দঃ × × এষ এব পরম আনন্দঃ এষ ব্রহ্মলোকঃ—বৃহ, ৪।৩।৩৩

পরবর্ত্তী কালে এই ব্রহ্মলোকের তিনটি স্তর বা ভূমিকা উল্লিখিত হইত—ব্রাহ্মঃ ত্রিভূমিকো লোকঃ। ইহাদিগের নাম—জনঃ, তপঃ, ও সত্যম্। অতএব ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যম্—মিলিয়া সপ্তলোক।

আসপ্তমান্ তস্য লোকান্ হিনস্তি—মুণ্ডক, ১।২।৩
সপ্ত ইমে লোকাঃ যেষু চরন্তি প্রাণাঃ—মুণ্ডক, ২।১।৮

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।২৭-৮) ভূঃ ভুবঃ প্রভৃতি ঐ সপ্তলোকের স্পষ্ট নাম নির্দ্দেশ আছে। ভূর্লোকই যাজ্ঞবল্ক্যের মনুষ্যলোক; তাঁহার পিতৃলোক ও গন্ধর্ব্বলোক মিলিয়া ভুবর্লোক; তাঁহার দেবলোকই স্বর্লোক; তাঁহার প্রজাপতিলোকই মহর্লোক; এবং জনঃ তপঃ ও সত্যলোক তাঁহার ত্রিভূমিক ব্রহ্মলোক।

উপনিষদে আমরা পঞ্চভূতের উল্লেখ পাই—

তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী—তৈত্তি, ২।১।১

পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত এই যে পঞ্চতত্ত্ব—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—উক্ত পঞ্চ লোক ঐ ঐ তত্ত্বের উপাদানে গঠিত। ভূর্লোকের

উপাদান ক্ষিতিতত্ত্ব, ভুবর্লোকের উপাদান অপ্‌তত্ত্ব, স্বর্লোকের উপাদান তেজস্তত্ত্ব, মহর্লোকের উপাদান বায়ুতত্ত্ব এবং ব্রহ্মলোকের উপাদান ব্যোম বা আকাশতত্ত্ব। এই পাঁচটী লোক যখন জীবের লীলাক্ষেত্র, তখন জীবের প্রত্যেক লোকে বিহরণের উপযোগী শরীর থাকা আবশ্যক। কারণ, যে ভূমিতে যে যখন বিচরণ করিবে, তাহার উপযোগী যানবাহন নহিলে চলিবে কিরূপে? স্থলে চলিতে রথ হইলেই চলে কিন্তু জলে নৌকা চাই; আর আকাশে ভ্রমণ জন্য বেলুন বা ব্যোমযানের প্রয়োজন। এই জন্য দেহীকে (Monad) বহুবিধ শরীর রচনা করিতে হয়।*

জীবের বিবিধ শরীর

এ প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি—৫।১২

'দেহী (প্রত্যগাত্মা) স্থূল সূক্ষ্ম বহু শরীর স্বগুণ দ্বারা রচনা করে।' ঐ সকল শরীরই আমাদের পরিচিত-অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশ।

উক্ত শ্লোকের 'বিবরণে' স্বামী বিজ্ঞান-ভগবান্ লিখিয়াছেন,

স্থূলানি পার্থিবানি শরীরাণি ভূর্লোকবর্ত্তীনি, ততঃ সূক্ষ্মাণি অপ্‌ময়ানি ভুবর্লোকবর্ত্তীনি শরীরাণি, ততোপি সূক্ষ্মাণি তৈজসানি স্বর্লোকবর্ত্তীনি শরীরাণি, ততোপি সূক্ষ্মাণি বায়বীয়ানি মহর্লোক-জনোলোকবর্ত্তীনি শরীরাণি, ততোপি সূক্ষ্মাণি শরীরাণি বিয়ন্ময়ানি তপঃসত্যলোকবর্ত্তীনি × × তৎতৎলোকবর্ত্তি-তৎতৎ শরীরারম্ভে তত্তদ্ভূতপ্রাধান্যমেব উক্তম্ ইতি দ্রষ্টব্যম্। × × বহূনি অনেকানি অনেকরূপাণি শরীরাণি দেহী বিজ্ঞানাত্মা স্বগুণৈঃ × × বৃণোতি সংভজতে।

অর্থাৎ বিজ্ঞানাত্মা (Monad) কয়েকটি শরীর আশ্রয় করে—ক্ষিতিতত্ত্বে রচিত ভূর্লোকের উপযোগী পার্থিব শরীর (অন্নময় কোশ), অপ্‌তত্ত্বে রচিত ভুবর্লোকের উপযোগী অপ্‌-ময় শরীর (প্রাণময় কোশ), তেজস্তত্ত্বে রচিত স্বর্লোকের উপযোগী তৈজস শরীর (মনোময় কোশ), বায়ুতত্ত্বে রচিত মহর্লোকের উপযোগী বায়বীয় শরীর (বিজ্ঞানময় কোশ) এবং আকাশতত্ত্বে রচিত ব্রহ্মলোকের উপযোগী আকাশীয় শরীর (আনন্দময় কোশ)।

ঐ ঐ শরীর সেই সেই উপাদানে প্রধানতঃ গঠিত অর্থাৎ অন্নময় কোশ ক্ষিতিতত্ত্বে, প্রাণময় কোশ অপ্‌তত্ত্বে, মনোময় কোশ তেজস্তত্ত্বে, বিজ্ঞানময় কোশ বায়ুতত্ত্বে এবং আনন্দময় কোশ আকাশতত্ত্বে। সুতরাং জীব অন্নময় কোশের বাহনে ভূর্লোকের সহিত, প্রাণময় কোশের বাহনে ভুবর্লোকের সহিত, মনোময় কোশের বাহনে স্বর্লোকের সহিত, বিজ্ঞানময়

* The Soul of man has not one body but many bodies.
—C. W. Leadbeater.

কোশের বাহনে মহর্লোকের সহিত এবং আনন্দময় কোশের বাহনে ব্রহ্মলোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। ঐ বিহরণ ও বিচরণের যান ঐ ঐ শরীর।

ত্রি-পুরুষ—ত্রিবিধ আত্মা

এই পঞ্চকোশকে অন্যভাবে বিভক্ত করিতে পারা যায়। অন্নময় কোশ জীবের স্থূল-শরীর, প্রাণময় ও মনোময় কোশ মিলিয়া জীবের সূক্ষ্ম-শরীর এবং বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশ মিলিয়া জীবের কারণ-শরীর। এ ভাবে জীব ত্রি-শরীর—তৎ বা এতৎ ত্রি-শরীরমাত্মনঃ (নৃসিংহ-উত্তর, ১ খণ্ড)। স্থূলশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাকে যাজ্ঞবল্ক্য 'শারীর' আত্মা বলিয়াছেন (বৃহ, ৪।৩।৩৫ ও ৪।২।৩)। সূক্ষ্ম-শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মার নাম 'তৈজস'—যাজ্ঞবল্ক্য যাহাকে 'প্রবিবিক্তাহারতর'-বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন—

তস্মাৎ এষ প্রবিবিক্তাহারতর ইব এব ভবতি অস্মাৎ শারীরাৎ আত্মনঃ—বৃহ, ৪।২।৩

এবং কারণ-শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মার যাজ্ঞবল্ক্য নাম দিয়াছেন 'প্রাজ্ঞ' আত্মা।

এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ—বৃহ, ৪।৩।২১ ও ৩৫

এই 'প্রাজ্ঞ' আত্মাকে ছান্দোগ্য 'উত্তম পুরুষ' বলিয়াছেন—স উত্তমঃ পুরুষ (৮।১২।৩)।

শারীর আত্মা অধম পুরুষ, তাহার তুলনায় তৈজস আত্মা 'উত্তর' পুরুষ; কিন্তু প্রাজ্ঞ আত্মাই 'উত্তম' পুরুষ। এই প্রাজ্ঞ আত্মা সাক্ষাৎভাবে পরমাত্মার সহিত নিত্য সংযুক্ত। সেই জন্য প্রশ্ন-উপনিষদ্ বলিয়াছেন,

স (বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ) পরে অক্ষরে আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে—প্রশ্ন, ৪।১

'বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ সেই অক্ষর (যাজ্ঞবল্ক্য যাঁহাকে তৎ অক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, যাঁহার প্রশাসনে সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ) পরমাত্মায় সংপ্রতিষ্ঠিত।'

এই শারীর আত্মা = the corporeal self of the Materialist,

এই তৈজস আত্মা = the individual soul of the Realist,

এবং এই প্রাজ্ঞ আত্মা = the Supreme soul of the Idealist

কারণ, একটু নিবিড়ভাবে দেখিলে এই প্রাজ্ঞ আত্মা প্রত্যগাত্মার অতি সন্নিকট—প্রায় অভিন্ন।

যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট জীবের অবস্থাত্রয়—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির বিবরণ আলোচনায় একথা আরও বিশদ হইবে। এখানে আমাদের লক্ষ্যের বিষয়

এই যে, ছান্দোগ্য-উপনিষদে রক্ষিত ইন্দ্র-প্রজাপতি-সংবাদে ঐ ত্রিবিধ আত্মার বিবরণ এই ভাবেই প্রস্ফুট হইয়াছে।

একদা দেবগণের প্রতিনিধি রূপে ইন্দ্র ও অসুরগণের প্রতিনিধিরূপে বিরোচন সমিৎপাণি হইয়া শিষ্যভাবে প্রজাপতির সমীপে গিয়া প্রশ্ন করিলেন—'শুনিয়াছি অপহতপাপ্‌মা বি-জর বি-মৃত্যু বি-শোক ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন সত্যকাম সত্যসংকল্প যে আত্মা স অন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—তাহার অন্বেষণ, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ঐ আত্মা কে?' (ছান্দোগ্য, ৮।৭—১২)। প্রজাপতি বলিলেন 'য এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে এষ আত্মা—চক্ষুতে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়*, যাহার প্রতিবিম্ব জলে বা দর্পণে দেখা যায়—সেই আত্মা।' বিরোচন জড়বাদীর (materialist) এই উত্তরেই তুষ্ট হইলেন। বস্তুতঃ অসুর-প্রকৃতি লোকের ইহাই অভিমত আত্মা—'দেহমাত্রমেব আত্মা'—আসুরো বতেতি অসুরাণাম্ হোষা উপনিষৎ (বৃহ, ৮।৮।৫) (gospel of demoniac men)। ইন্দ্র কিন্তু এ উত্তরে তুষ্ট হইতে পারিলেন না—অথ হ ইন্দ্রঃ এতৎ ভয়ং দদর্শ। তিনি ভাবিলেন—'এই যদি আত্মা, তবে ত দেহ ব্যাধিত হইলে আত্মা ব্যাহত হয়, অন্ধ হইলে অন্ধ হয়, ছিন্ন হইলে ছিন্ন হয়, বিনষ্ট হইলে বিনষ্ট হয়—নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি।' তিনি প্রজাপতিকে আবার প্রশ্ন করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন 'বেসক', ঠিক বটে, তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি। আত্মা সে, যে স্বপ্নে মহীয়মানঃ চরতি—স্বপ্নে মহিমা অনুভব করে। ইহাই Realist-এর উত্তর। ইন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন, এ উত্তরও পর্য্যাপ্ত নহে—কারণ, স্বাপ্ন আত্মাও দুঃখভোগ করে, শোকমোহের অধীন হয়। অতএব নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি। তিনি প্রজাপতিকে আবার প্রশ্ন করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, বেসক, ঠিক বটে, তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি। আত্মা তিনি, যিনি স্বপ্নাতীত, সমস্তঃ সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি। ইহাই Idealist-এর উত্তর। কারণ ঐ অবস্থায় 'There is no duality, no subject and no object'—বিষয়-বিষয়ীর ভেদ স্তম্ভিত হইয়া অদ্বৈতের অনুভূতি হয়।

নিরঞ্জন ও পুরঞ্জন

আমাদের আলোচ্য চিন্মাত্র বা প্রত্যগাত্মা সম্পর্কে আরও বক্তব্য আছে। যিনি প্রত্যগাত্মা, তিনি নিরঞ্জন—নিরবদ্যং নিরঞ্জনং (শ্বেত, ৬।১৯)। তিনি অপহত-পাপ্‌মা (ছান্দোগ্য, ৮।৭।১)।

* সেই জন্য ইহার নাম 'চাক্ষুষ'। যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্‌ পর্য্যাবর্ত্ততে (বৃহ, ৪।৪।১, ছা ৮।১২)। যাজ্ঞবল্ক্য ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—ইন্ধো হবৈ নাম এষ যোঽয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ পুরুষঃ (বৃহ, ৪।২।২)

স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এব অসাধুনা কর্ম্মণা কনীয়ান্ (বৃহ, ৪।৪।২২)—সাধু কর্ম্ম দ্বারা তিনি উপচিত কিংবা অসাধু কর্ম্ম দ্বারা অপচিত হন না। সেই 'নিরঞ্জন' দেহ-রূপ-পুরবাসী হইয়া 'পুরঞ্জন' হইয়া পড়েন। তখন পুণ্যপাপ, প্রিয়াপ্রিয় তাঁহাকে স্পর্শ করে।

দৃষ্ট্বা চ পুণ্যং চ পাপং চ—বৃহ, ৪।৩।১৫-৭
শরীরমভিসংপদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে—বৃহ, ৪।৩।৮

এ সমস্তই দেহযোগের ফল।

দেহযোগাদ্ বা সোপি—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৬*
আত্তোবৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাম্ × × অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ—ছান্দোগ্য, ৮।১২।১

শঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

কস্মাৎ পুনঃ জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সন্ তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি? (পরমাত্মার অংশ জীব—তাহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোহিত হয় কিরূপে?) সোপিতু জীবস্য জ্ঞানৈশ্বর্য্য-তিরোভাবঃ দেহযোগাৎ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিযোগাৎ ভবতি—জীবের ঐ জ্ঞানৈশ্বর্য্য-তিরোভাবের হেতু দেহযোগ—দেহ-ইন্দ্রিয়-মনঃ-বুদ্ধি-বিষয়বেদনাদি যোগ।'

অর্থাৎ মোহাৎ অনীশতাংপ্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচতি—পঞ্চদশী

১।১৬৪।২০ ঋগ্বেদের সেই প্রাচীন উপমা—দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে—'এক বৃক্ষে দুটি পাখী—একজন দ্রষ্টা একজন ভোক্তা—

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি
অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি—মুণ্ডক ৩।১।১

—ঐ উপমা এ তত্ত্বই বিশদ করিতেছে। এই নিরঞ্জন ও পুরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়াই শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ অজৌ ঈশানীশৌ—শ্বেত, ১।৯

'একজন প্রাজ্ঞ, একজন অজ্ঞ—একজন ঈশ, একজন অনীশ।'

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ॥—মুণ্ডক, ৩।১।২

ইহাকেই বলে উপাধির উৎপাত—এই উপাধি-জন্যই জীবের শোকমোহ।

তথাপি নিরঞ্জন পুরঞ্জনের নিত্য সখা, সত্য সখা—সযুজা সখায়া—উভয়ের শাশ্বত সংযোগ। সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—

* Life like a dome of many coloured glass,
Stains the white radiance of Eternity.—Shelley.

অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ (বৃহ, ৪।৩।১৫, ২২)। তিনি অনন্বাগতং পুণ্যেন অনন্বাগতং পাপেন (বৃহ, ৪।৩।২২)—তিনি পাপ-পুণ্যের অতীত—অসঙ্গ, নির্লেপ।

ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ—কঠ, ৫।১১
শরীরস্থোপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে—গীতা, ৩।৩২
এবম্ অবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিতে বুদ্ধ্যাদ্যুপহিতে জীবাখ্যে অংশে দুঃখায়মানেঽপি ন তবান্ ঈশ্বরো দুঃখায়তে—শঙ্কর

অর্থাৎ Our own metaphysical I, our divine self, persisting in untarnished purity, through all the aberrations of human nature, eternal blessed.—(Deussen)

সেইজন্য সকল বালাই-এর মূল যে শরীর, (উপনিষদ্ বলেন) সেই শরীর হইতে বিবিক্ত হওয়াই ('spirit casting off its dust') জীবের পরমার্থ—চরম সার্থকতা।

এষ সংপ্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরংজ্যোতিঃ উপসংপদ্য স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে—ছান্দোগ্য, ৮।৩।৪,৮।১২।৩

অতএব উপনিষদে বিবৃত আত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ হইতে আমরা জানিলাম যে, সর্ব্বোপরি পরমাত্মা বা ব্রহ্ম, যিনি চিদাকাশ, যিনি পাশ্চাত্য দর্শনের Absolute বা God। তারপর তদংশ (Divine fragment) প্রত্যগাত্মা, যিনি চিন্মাত্র, চিৎকণ, কূটস্থ. অক্ষর (কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে—গীতা), নির্বিকার নিরঞ্জন—যিনি গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ—পরব্যোমের পরমাণু বা হৃদাকাশময় দেহ (ব্রহ্মকোশ) যাঁহার উপাধি—যিনি পাশ্চাত্য দর্শনের Monad। তারপর ঐ চিন্মাত্রের আভা বা কিরণ (Radiation)—বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশের সমবায়ে যে কারণ-শরীর (যাহা কল্পান্তস্থায়ী) ঐ শরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, যাহাকে জীবাত্মা বলে—যিনি পাশ্চাত্য দর্শনের Ego বা Individuality। এবং সর্ব্বশেষে ঐ জীবাত্মার আভাস বা প্রতিবিম্ব (Reflection)—মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোশরূপ যে ত্রিতয় (Triad) (যাহা জন্মে জন্মে জীববৃক্ষে নবপল্লবিত হয়)—ঐ ত্রিতয়ে প্রতিফলিত চিৎছায়া—যাহাকে 'ভূতাত্মা' বলা হয়—যাহার নশ্বরত্ব স্মরণ করিয়া বুদ্ধদেব তাহার নাম দিয়াছেন অনাত্মা—যাহা পাশ্চাত্য দর্শনের Personality বা Animal soul।*

* The group of *temporary* lower vehicles which a soul assumes when he descends into incarnation.—C. W. Leadbeater. এই temporary lower vehicles-ই বেদান্তের অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোশ। অথ যো বাব শরীরম্ ইত্যুক্তং স ভূতাত্মা ইত্যুক্তম্ (মৈত্র, ৩।২)।

এই ভূতাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন
আভাস এব চ—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৫০
অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৮

'জলে যেমন সূর্য্যের আভাস বা প্রতিবিম্ব ইহাও তদ্রূপ।' এই প্রতিবিম্ব বা Reflection সম্বন্ধে (যথৈষা পুরুষে ছায়া এতস্মিন্ এক আয়তম্—প্রশ্ন ৩।৩) স্বামী শুভরাও কয়েকটি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন—যাহা আমাদের প্রণিধান-যোগ্য।

Suppose, for instance, we compare the Logos itself to the sun. Suppose I take a clear mirror in my hand, catch a reflection of the sun, make the rays reflect from the surface of the mirror, say upon a polished metallic plate and make the rays which are reflected in their turn from the plate fall upon a wall. Now we have three images, one being clearer than the other and one being more resplendent than the other. I can compare the clear mirror to Karana Sharira, the metallic plate to the astral body and the wall to the physical body. In each case a definite bimbam is formed and that bimbam or reflected image is for the time being considered as the self. The bimbam formed in the astral body gives rise to the idea of self in it, when considered apart from the physical body; the bimbam formed in the Karana Sharira gives rise to the most prominent form of individuality that man possesses.—Notes on the Bhagabat Gita p 19.

উদ্ধৃত বচনে শুভরাও যে উপমানের প্রয়োগ করিলেন, তদ্দ্বারা উপনিষদের অনুমোদিত ত্রি-পুরুষতত্ত্ব বেশ সুবিশদ হইল।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল অথচ জীববাদ সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্যের সকল বক্তব্য বলা হইল না। আগামীবারে অবশিষ্ট কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ছেলেপিলের ভয়ডর না থাকাটা সেকালে যে একটা গুণের মধ্যে গণ্য হ'ত তা নয়। বরঞ্চ আমার বাবার আমলের ইংরেজীনবিশদের আদর্শ ছিল বিলেতের ভিক্টোরীয় যুগের Upper Ten-এর (অভিজাত মণ্ডলীর) অতিভব্যতা। সেই আদর্শে নিজেদের গ'ড়ে তুলতে তাঁরা একমনে সাধনা করেছিলেন, আর কবুল করতে হয় যে তাঁদের ঐ আন্তরিক সাধনা অনেকাংশে সফল হ'য়েছিল। লাঠিবাজী দেশ থেকে লোপ পেয়ে গেল। চিরদিনের ডানপিটে জমীদারের ছেলেরাও ক্রমশঃ শান্তশিষ্টভাবে পড়া মুখস্থ করতে লাগ্‌ল। মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি লাঠিয়ালের হাত থেকে এটর্ণীর হাতে গিয়ে পড়তে আরম্ভ হ'ল। এতে সরকারের খুসী হওয়ারই কথা, কারণ শান্তিরক্ষার খরচ অনেক কমে গেল। কিন্তু ফলে তা হ'ল না। সাহেবরাই আমাদের মোহ ভাঙ্গলেন। তাঁরা এই সুসভ্য চোস্ত ভালমানুষ নব্য বাঙ্গালী বাবুর কদর বুঝলেন না। কথায় কথায় কাবুলী বেলুচী গুর্খার সঙ্গে এঁদের তুলনা ক'রে টিট্‌কারী দিতে লাগলেন। বাবুগুলো কি মানুষ যাদের কেবল চোখ রাঙ্গিয়ে শাসন করা যায়, এ কি একটা দেশ যেখানে সারা বছরে একটা বন্দুক ছুঁড়তে হয় না! টেবিলে খেতে গিয়ে এরা ছুরী দেখে টেবিলের নীচে গিয়ে লুকোয়, এই রকম কত কথাই শুন্‌তে হ'ত। আমাদের তরফে উন্নতির কাজ জোরে চল্‌ল, ইজের কোর্ত্তা পরা হ'ল, সমাজ সংস্কার আরম্ভ হ'ল ইংরেজী ধরণের রাজনীতি চর্চ্চারও গোড়া পত্তন হ'ল, কিন্তু ইংরেজের অবজ্ঞার হাসি থাম্‌ল না। অশন-বসন, ধরণ-ধারণ, সবেতেই দেশের লোককে পেছনে ফেলে ছুটতে লাগ্‌লাম। কিন্তু যার লাগি চুরি করি সেই বলে চোর, সাহেবের মন পেলাম না। তখন আস্তে আস্তে হাওয়া ফিরল। নূতন slogan (মন্ত্র) হ'ল, চুলোয় যাক্ উন্নতি, আগে ইজ্জৎ বাঁচাও। রাজনারায়ণবাবু, বঙ্কিমবাবু, এঁরা পাগলামির গতিরোধ করতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। এখন নবীন যুগকবি সেই কাজে লেগে গেলেন। "বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান, পোষমানা প্রাণ" যে কি হাস্যাস্পদ জিনিষ তা কবি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। "দিগন্তে বিলীন বিশাল মরুর" মাঝে ঘোড়সওয়ার আরব বেদুইনের ছবি এঁকে সামনে ধরে সবাইকে বল্লেন, কি সুন্দর এই ছবি, কি সুন্দর এই আরব যার "বর্শা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ।" পৃথিবী

জুড়ে বিষাণ বেজেছে, সবাই নিশান নিয়ে এসেছে, "কইরে বাঙ্গালী বীর" বঙ্গমাতাকে প্রার্থনা করলেন তোমার ছেলেদের গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে দাও, এদের বাঙ্গালী ক'রে রেখেছ মানুষ ক'রে দাও। কবির এই বজ্রকণ্ঠ ডাক, মার কাছে ব্যাকুল অনুযোগ, এই শুন্‌তে শুন্‌তে আমরা বড় হ'লাম। কিন্তু তখনও দেশের ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নাই। আমাদের মধ্যে মনে মনে দেশপ্রেমিক অনেক তৈরী হ'লেন বটে, এমন ভাবুকও হ'য়ে উঠলেন যাঁরা নিজেদের বীরত্বে আরব বেদুইন মনে করতেন, কিন্তু তাঁরা ঘোড়ায় দূরে থাক্ গাধায় চড়তেও শিখলেন না। কাজেই একপুরুষ আমরা দেশেরও কোন উপকার করলাম না, বিদেশী রাজারও কোন ক্ষতি করলাম না। এখন দেখি হাওয়া একেবারে ঘুরে গেছে। বর্ত্তমান বাঙ্গলা দেশে "শান্তিতে শয়ন" শেষ হ'য়ে আসছে। গৃহহারা লক্ষ্মীছাড়ার দল বেড়েই চলেছে। বর্শা হাতে না থাকলেও ভরসা প্রাণে একেবারে নিরুদ্দেশ হ'য়েছে। ভাল হ'য়েছে কি মন্দ হ'য়েছে এই যুগের রাজনৈতিকেরা ঠিক করবেন। আমরা নির্দ্দোষ, কেননা নিষ্ক্রিয়। আমাদের গীতা ছিল বড় জোর, "কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্"। গীতা আমাদের জন্য একটা বিশেষ রকমের জাহান্নামের ব্যবস্থা ক'রে থাকলেও, আইনের চোখে আমরা বেকসুর খালাস।

এইবার একটু পুরানো গল্প ব'লে বাঙ্গালী ও সাহেবের মধ্যে সম্বন্ধটার আভাস দিতে চেষ্টা করি। ১৮৮৮ সালে বাবার সঙ্গে পূজার ছুটিতে দার্জ্জিলিঙ গেছলাম। লোক সমাগম খুব হ'য়েছিল, তবে সাহেবই বেশী। বাঙ্গালীদের অধিকাংশই নব-প্রতিষ্ঠিত সানিটেরিয়মে জমা হ'য়েছিলেন। জজ চন্দ্রমাধববাবু, বর্দ্ধমানের উকীল নলিনাক্ষবাবু ও তারাপ্রসন্নবাবু, পাটনার গুরুপ্রসাদবাবু এই রকম অনেক গণ্যমান্য লোক সে-বছর এসেছিলেন। তাছাড়া রাজদ্বারে প্রসাদপ্রার্থী বড়লোকের আনাগোনা ত ছিলই। কিন্তু এতগুলি বাঙ্গালী, এঁদের আমোদ-প্রমোদের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। রবিবার দিন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকেরা তবু সমাজে গিয়ে দুদণ্ড কাটাতেন। দার্জ্জিলিঙের পুরানো বাসিন্দা মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী আমাদের বৈঠক ছিল। যখন তখন আমরা ছেলেরা সেখানে যেতাম ও সে বাড়ীর রান্না পরীক্ষা ক'রে আস্‌তাম। বড়রা চৌরাস্তায় ব'সে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে জল্পনা ক'রে খানিকটা সময় কাটিয়ে দিতেন। সাহেবদের নাচ গান থিয়েটার কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁদের ক্লাবও সদা সরগরম। কিন্তু এক কুচবেহারের মহারাজ ছাড়া আর কাউকে তাঁরা ডাকতেন না।

হঠাৎ একদিন আমাদের বড়ীতে বহু জনসমাগম হ'ল। কর্ত্তা

নিতান্ত ছোট ছিলাম তাই দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আমার এক দাদা উঁকি মেরে সন্ধান নিয়ে এলেন যে, কর্ত্তারা মহা উত্তেজিত হ'য়েছেন, শুনেছেন যে, পরের দিন লাট বেলী সাহেব টাউন হলে এক বক্তৃতা ক'রে বাঙ্গালীদের গালাগালি দেবেন। অবজ্ঞা ক'রে দূরে ঠেলে রাখা এক কথা আর প্রকাশ্যে গায়ে প'ড়ে গালাগাল আর-এক কথা। ঠিক হ'ল যে, নীরবে সহ্য করা হবে না, বর্দ্ধমানের তারাপ্রসন্নবাবু বাঙ্গালীদের তরফে চোখা চোখা কথায় জবাব দেবেন। আর আমাদের শক্ত তাগিদ দেওয়া হ'ল যে, আমরা ছেলেরা টাউন হলে কোনও অসভ্যতা না করি। কিন্তু ব্যাপারটা পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের মত হ'ল। বেলী সাহেব বক্তৃতা করলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালীদের নিন্দাবাদ করলেন না। ভয়ে নয়, কারণ আমরা বালকবীরের দল সেখানে যাই নাই। যা হোক্, সকলেই এটা মনে ক'রে আশ্বস্ত হ'লেন যে, সাহেবরা বাঙ্গালীদের অপমান কর্‌তে সত্যি চা'ন না।

কিন্তু এ স্বস্তির ভাব বজায় রইল না। একদিন ম্যাল রাস্তার উপর গোরাদের ঘোড়া, বর্শা, তলোয়ার নিয়ে খেলার এক বিরাট আয়োজন হ'ল। সার্ব্বজনিক রাস্তাটা ঘেরে বন্ধ ক'রে দিলে। তাই আমাদের বিশ্বাস হ'ল যে, সবাই খেলা দেখ্‌তে পা'ব। সাজ-গোজ ক'রে কর্ত্তারা গেলেন, আমরাও সঙ্গে গেলাম। কিন্তু লালমুখো দৌবারিকের দল সাহেব ছাড়া কাউকে ভেতরে ছাড়ল না, দুই-একটা ঠাট্টা টিটকারীর কথাও বললে। বিরক্ত হ'য়ে কর্ত্তারা ফিরে গেলেন। আমার দাদা ও আমি কিন্তু কৌশলে প্রবেশলাভ ক'রে, একেবারে মেমসাহেবদের মধ্যস্থলে ব'সে, জাতীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখলাম। এমন সময় এক কাণ্ড হ'ল। জরীর বস্ত্র পরা একজন পাহাড়ী জমীদার ঘোড়ায় চ'ড়ে ফটক পর্য্যন্ত এসে, এক লাফে নেমে ভেতরে ঢুক্‌তে গেলেন। যেই ঢুক্‌তে গেছেন, চকিতের মত দুটো জিনিস হ'য়ে গেল। লালমুখো প্রহরীটা জমীদারের ঘাড়ে হাত দিলে, আর অমনি জমীদারের কুক্‌রীটা খাপ থেকে ফোঁস ক'রে গোখরো সাপের ফণার মত বেরিয়ে পড়ল। ফণা দেখেই প্রহরীর হাত কাঁধ থেকে খ'সে পড়ল। জমীদার গম্ভীর চালে ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমাদের কাছে তিনি আসতেই সসম্ভ্রমে তাঁকে স্থান ক'রে দিলাম। নিজে মার না খেয়ে বীরত্বের মর্য্যাদা বজায় রাখার এমন সুযোগ কি আমরা ছাড়তে পারি? মনে একটু অব্যক্ত আনন্দের ভার নিয়ে বেলাটা খুব উপভোগ করলাম। বাড়ী গিয়ে খুব আহ্লাদ ক'রে সব বর্ণনা করলাম। কিন্তু কর্ত্তাদের রাগ গেল না। পরদিন ফের বৈঠক বস্‌ল আমাদের বাড়ী। ফলে কয়েকদিন পরে মহা ধুমধাম ক'রে সেনিটেরিয়মে বিজয়া-সম্মিলনী হ'ল। তিন ঘণ্টা ধ'রে নানা রকম আমোদ-প্রমোদ, দৌড়-ঝাঁপ ও খাওয়া-দাওয়া হ'ল। সাহেব

শেষ পর্য্যন্ত কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, যদিও এ-বিষয়ে যথেষ্ট [illegible] হ'য়েছিল। মনের আবেগে আমার দাদা ও আমি ইংরেজী বাঙ্গলা [illegible] জলখাবারই ভরপুর খেলাম। এই বিজয়া-সম্মিলনী সেই থেকে প্রতি[illegible] হয় কিন্তু এখন আর সেরকম উৎসাহ নেই। কা'কে কষ্ট দেওয়ার [illegible] আর উৎসব। সাহেবরা ত পাহাড় একরকম আমাদের হাতেই [illegible] দিয়েছেন। তাঁদের বড় সাধের ক্লাবটিও কাল সাদা দাবার ছকের [illegible] হ'য়ে গেছে। অনেক মনের দুঃখে সেদিন এক ইংরেজী কাগজ লিখেছি[illegible] যে, দার্জ্জিলিঙ ক্রমশঃ নেটিব্‌ ও মশকের লীলাভূমি হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, as bad as the plains (প্রায় নীচের মতই)।

সাহেব ত চিরদিনই নানা রকমের হয়। বড় সাহেব, [illegible] সাহেব, কটা সাহেব, মেটে সাহেব ও বাঙ্গালী সাহেব। যে সময়ের কথা বল্‌ছি তখন এই শেষোক্ত সাহেবদেরও উৎপাত কম ছিল না। তবে জাত সাহেবদের হাতে বেচারাদের দুর্গতিও যথেষ্ট হ'ত। [illegible] হ'ত, নইলে কংগ্রেসাদি ব্যাপারের অনেক দেরী পড়ে যেত। একবার এক জজ সাহেব (ইনি ঠিক বাঙ্গালী ছিলেন না) পাহাড়ে গিয়ে সাহেবদের খুব বড় হোটেলে উঠেছিলেন। সচরাচর সে হোটেলে বিশুদ্ধ [illegible] ছাড়া অন্য বর্ণের সাহেব স্থান পেত না। এই রকম পাকা বিলেতী ব্যাপার ব'লে, সেখানে দু-চারজন মেম চাকরাণীও ছিল। আমাদের [illegible] বাহাদুরের শ্বশুড়বাড়ী বিলেতে হওয়ার দরুণ তিনি কয়েকটা বিশেষ অধিকার লাভ করেছিলেন। তার মধ্যে একটা এই যে, এ রকম নিখুঁত ভদ্র হোটেলে তিনি ঢুক্‌তে পেতেন। হোটেলের কর্ম্মকর্ত্তা তাই এঁকে এবারও না বল্‌তে পারেন নাই, কিন্তু কয়েকজন ছোকরা চা-বাগানের সাহেব ভয়ানক চ'টে গিয়েছিল। তারা স্থির করলে যে নিগারকে তাড়াতেই হবে। খুব গোপনে তারা ষড়যন্ত্র করলে হোটেলের এক মেম ঝির সঙ্গে। তার পরদিন সকালে চা-পানি খাওয়ার পর সবাই বারান্দায় ব'সে আছেন। সস্ত্রীক জজ সাহেবও রয়েছেন। এমন সময় চাকরাণীটা ময়লা জলে ভরা এক মুখ ধোবার গামলা এনে ঠক্‌ ক'রে সেখানে নামিয়ে রেখে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে মেনেজারকে বললে, "স্যার, স্যার, কাঁচা রং, উঠে আসছে।" সমবেত সাহেব-মেমরা [illegible] চাওয়া-চাওয়ি ক'রে মুচকে হাসতে লাগলেন। জজ বাহাদুরের [illegible] বেগুনে হ'য়ে উঠল। তিনি সেই দিনই অন্যত্র উঠে গেলেন। এ অনেক দিনের কথা। আজ-কাল ত শুনতে পাই যে, শ্বশুর বাড়ী বাপের বাড়ী দুই ভারতবর্ষে এমন সাহেবও সব হোটেলেই স্থান পা'ন। কে বলে দেশের উন্নতি হয় নাই।

আগে কটা সাহেবে মেটে সাহেবেও ভয়ানক মন কষাকষি ছিল। এখন Loyalist সভা Royalist সভা ইত্যাদি উপলক্ষে কংগ্রেসের মুণ্ডপাত করবার জন্য কতকটা সদ্ভাব হ'য়েছে। রাজনৈতিক চাল চালাবার জন্য যে মৈত্রী, সেটা কত অদ্ভুত হ'তে পারে তা আমাদের এই কল্‌কাতার নগর-পঞ্চায়তেই দেখা যায়। প্রায় ৪৫ বৎসর আগেকার একটা গল্প বলি। তখন সাহেবদের মধ্যে জাতিভেদ প্রবল। আমার এক জ্যাঠা মহাশয় সিমলা যাচ্ছিলেন। সহযাত্রী ছিলেন একজন মেটে সাহেব। প্রয়াগে লালমুখ প্রকাণ্ড দেহ এক পল্টনের সাহেব এসে উপস্থিত হ'লেন। সঙ্গে চাকর-বাকর, লোক-লস্কর, তলোয়ার-বন্দুক। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, যাকে বড় সাহেব বলে, এ সেই ব্যাপার। জ্যাঠামহাশয় ও মেটে সাহেব মহাশয় দুজনেই আগন্তুককে দেখে একটু সঙ্কুচিত হ'লেন। অর্থাৎ কেবল মনের সঙ্কোচ নয়, শরীরও যথেষ্ট সঙ্কুচিত ক'রে বড় সাহেবের আরামে বসার জায়গা ক'রে দিলেন। বড় সাহেব কিন্তু মেটে মহাশয়ের দিকে একবার তাকিয়েই, আমার জ্যাঠার পাশে এসে বস্‌লেন। খুব আদব-কায়দা ক'রে "Good Morning, Babu" ব'লে গল্প জুড়ে দিলেন। জ্যাঠামহাশয় ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি আশ্চর্য্য হ'লেন যে, সাহেব সাহেবের কাছে না ব'সে তাঁর কাছে এসে বস্‌লেন। খানিকক্ষণ আলাপের পর সে-ই কথা জিজ্ঞাসা ক'রে ফেল্‌লেন। তা'তে জঙ্গী সাহেব খুব চেঁচিয়েই বল্‌লেন, "ওদের সাহেব বলো না, বাবু। ওরা অতি ছোট জাত। আগে জানতাম না। কি ক'রে আমার শিক্ষা হ'ল, বলি শোন।" ব'লে এক গল্প বল্‌লেন। কয়েক বছর আগে তিনি একবার রেলে সেকেণ্ড ক্লাসে যাচ্ছিলেন। মাঝখানে ব'সেছিল দুই মেটে সাহেব। অপর দিকে ব'সেছিলেন এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী বাবু ও তাঁর এক অল্প বয়স্কা মেয়ে। বাবুটি খবরের কাগজ পড়ছিলেন। খানিকক্ষণ বাদে হঠাৎ সাহেবের সেদিকে নজর পড়াতে দেখলেন যে, মেয়েটির মুখ ভয়ে সাদা হ'য়ে গেছে আর নিতান্ত জড়সড় হ'য়ে ক্রমাগত একবার এদিক একবার ওদিক সরে সরে যাচ্ছে। লক্ষ্য ক'রে দেখলেন যে, ফিরিঙ্গী দুটো পা দিয়ে মেয়েটির পা ঠেল্‌ছে। তার অভিভাবক তখনও কাগজ পড়ছেন, আর দেখ্‌তে পাচ্ছেন না নয়, দেখেও দেখছেন না। দুর্ব্বলের উপর এই অত্যাচার দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাগে সাহেবের রক্ত মাথায় চ'ড়ে গেল। এক-লাফে উঠে, কোনও কথা না ব'লে, সেই দুই ফিরিঙ্গী-নন্দনের ঘাড় ধ'রে তাদিকে নীচে ফেলে দিলেন আর পরের ষ্টেশনে দূর ক'রে দিলেন। তারা নেমে যাওয়ার পর, বৃদ্ধ বাবুটি ছোটো-খাটো এক বক্তৃতা ক'রে সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। গল্পটা ব'লে সাহেব জোর গলায় জ্যাঠামহাশয়কে

জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ফিরিঙ্গী বন্ধুর সঙ্গে কেন বসলাম না, বুঝতে পারলে বাবু?" এ গল্প শুনেছি শৈশবে। তার পর অনেক ফিরিঙ্গীর সঙ্গে আলাপ হ'য়েছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে বন্ধু ব'লে মেনে নিয়েছে। সুতরাং এ জাতের নিন্দা করায় আমার কোনও আনন্দ নেই। এরা আমাদেরই আপনার লোক, সাহেবদের নয়। আর সত্যি বড় দুর্ভাগা জাত। আপনার বল্‌তে কেউ নেই। বড়লোকে মিষ্টি কথা ব'লে গরীব আত্মীয়দের দিয়ে ঘরের ছোট কাজগুলো করিয়ে নেয়, তালুক-মুলুক কিনে দেয় না। এই সহজ সত্যটাও এরা বোঝে না, এমনই নির্ব্বোধ। নির্ব্বোধ আমরাও ত বড় কম নয়। আপনার লোককে পর ক'রে দেওয়াতে আমরা সিদ্ধহস্ত হ'য়ে উঠ্‌ছি।

সাহেব বাঙ্গালীর কথা বল্‌তে বল্‌তে অনেক দূর এসে পড়েছি। পাঠককে আবার কুচবেহারে ফিরে যেতে হবে। একটা কথা বোঝাতে চাই যে, আমাদের কুচবেহারের আবহাওয়া অন্য শহরের আবহাওয়ার থেকে একটু আলাদা রকমের ছিল। একে ত দেশী রাজ্য, তায় একেবারে সীমান্তের উপর। প্রথম থেকেই কতকগুলো জিনিস আমরা দেখতাম যা অন্য জেলার বাঙ্গালী ছেলেদের নজরে আস্‌ত না। রাজ্যটি এখন ছোট বটে, কিন্তু গৌরবে এ রাজবংশ কারও কাছে খাটো ছিল না। রাজপুতানার বাহিরে খুব কম রাজাই আছে যাদের জন্ম কুচবেহারের আগে। আকবরের সময় এ রাজ্য যে কত বড় ছিল, আইন-ই-আকবরী দেখলেই জানা যায়। প্রথম রাজা বিশ্বসিংহ হ'তে ধারাবাহিকভাবে এই নারায়ণী বংশের রাজারা হনুমান-দণ্ডের নীচে ব'সে উত্তর বঙ্গ শাসন ক'রে এসেছেন। ইতিহাসের চোখে কুচবেহার প্রাচীন কামরূপ রাজ্যেরই রূপান্তর। আর কামরূপ যে কত পুরানো তা ইতিহাস প'ড়েও বোঝবার জো নাই। কুচবেহারের কিম্বদন্তীর দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে, প্রথম মহারাজ স্বয়ং মহাদেবের বংশসম্ভূত, ভুটানের দেবরাজের আত্মীয়। পুরাকালে দেবাদিদেব একবার তরাইয়ের বনে বেড়াতে এসে, হিরা ও জিরা ব'লে দুই বোনের ঘরে অতিথি হয়েছিলেন। দুই বোনের গর্ভে যে দুই সন্তান হয়, তারা ভুটান ও বেহারের আদিপুরুষ। দুই রাজবংশই এই পুরানো আত্মীয়তা মেনে নিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় কতবার দেখেছি ভুটানের দূত নানা উপহার নিয়ে এল। তারা উপহার পাঠাত নানা রকমের পাহাড়ের তৈরী জিনিস ও ঘোড়া। আমাদের এ দিক্ থেকে যেত ঘড়ী, কলের বাজনা, বিলেতী বনাত, Sheffield-এর ছোরা ছুরী, ইংরেজী ধরণের ঘোড়ার সাজ ইত্যাদি। আগে আগে ভুটীয়ারা দল বেঁধে শীতকালে ব্যবসা করতেও আস্‌ত। তাদের পণ্য

প্রধানতঃ ছিল ঘোড়া ও কম্বল। আশে-পাশের সরকারী জেলার লোকও এই উপলক্ষে অনেক আস্‌ত। আগেকার দিনে কুচবেহার ছিল উত্তর-বঙ্গের একটা কেন্দ্রস্থান। রাজ্য এক সময় পদ্মা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রঙ্গপুর জলপাইগুড়ীর জমীদাররা কুচবেহারকে কর দিতেন। ভুটানের কথা ত বলেছি। নেপালের সঙ্গেও এঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। কুচবেহারের এক রাজকুমারী নেপালের রাণী হয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব বাদশাহের সময়, মোগল বাদশাহীতে ঘুণ ধরার আগে, সেনাপতি মীরজুমলা এই প্রদেশ জয় করতে আসেন। কুচবেহারকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে দক্ষিণ সীমান্তে ফৌজ রেখে তিনি আসামের দিকে দিগ্বিজয়ে চ'লে যান। যেই বেরিয়ে গেলেন প্রজারা দল বেঁধে রাজার কাছে গিয়ে বল্‌লে, এইবার মোগলদের মেরে তাড়িয়ে দেওয়া যাক্। ভীরু-স্বভাব রাজা (বোধ হয় লক্ষ্মীনারায়ণ) রাজী হ'লেন না। তখন প্রজারা তাঁকে কয়েদ ক'রে রেখে নিজেরা দিল্লীর ফৌজ তাড়িয়ে দিয়ে এল। এর পরিণাম কত ভয়ানক হ'তে পারত, তা এই মূর্খগুলো একবারও ভাবল না। কিন্তু সত্যি ব্যাপারটা গুরুতর দাঁড়াল না, কেননা মীরজুমলা সাহেব আসামেই মারা গেলেন, আর তাঁর যোদ্ধারা কালাজ্বর ইত্যাদির সঙ্গে যুঝ্‌তে না পেরে অন্য পথে বাড়ী ফিরলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংগ্‌স্ লাটের সময় কোম্পানীর সঙ্গে কুচবেহারের সন্ধি হয়। তার পরেও অনেকদিন এ রাজ্যের কতকটা কদর ছিল, কারণ শেষ ভুটান যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত রীতিমত যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম এঁরা রাখতে পেতেন। সেটা আমার সময়ের আগে। আমি যে পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য দেখেছি সে নিতান্তই খেলাঘরের ফৌজের মত। যে সব কথা ইতিহাসের ছলে আমি ব'লে যাচ্ছি এগুলো কেউ যেন যথাযথ ব'লে না নেন। এ সব আমার মনের বিশ্বাস, আমার কাছে সত্য হ'লেও অন্যের পক্ষে গল্পমাত্র। মোট কথাটা এই যে, আমাদের রূপকথার মশলা জোগাবার জিনিস অনেক ছিল। যেখানে ভুটান নেপাল, পাহাড় জঙ্গল নিয়ে কারবার সেখানে ইংরেজের সঙ্গে বন্ধনটা আমাদের চোখে খুব মুগুর-মারা গোছের সত্য ব'লে লাগ্‌ত না। মহারাজ বিলেত গেলে মনে দুঃখও হ'ত, আবার বিলেতের বাদশাহী বংশের কাছে তাঁর মান আদরের কথা শুনে গর্ব্বও হ'ত।

ভুটীয়াদের সম্বন্ধে একটা শোনা গল্প বলি। উত্তরে পাহাড়ের কোলে একজায়গায় তিন সীমান্ত একত্র মিলেছিল, ভুটানের, ব্রিটিশ বক্সাদুয়ারের ও কুচবেহারের। একবার আমার বাবা ভুটানের রাজার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেলেন, সীমান্তে গিয়ে তাঁদের এক রাজপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে। জাঁকজমক ক'রে, চোপদার ঘোড়সওয়ার নিয়ে গেলেন। তখন রেল ছিল না। যেতে একটু কষ্টই হ'ল। সীমার কাছাকাছি পৌঁছেছেন তখন

ইংরেজদের কর্ণেল সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনিও দেবরাজের নিমন্ত্রণ পেয়ে আসছিলেন। দুজনেই মনে করলেন একটা খুব বড় রকমের উৎসবে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখ্‌তে পেলেন যে, উত্তর দিকে পাহাড়ের উপর একটা বাড়ীতে আগুন লেগেছে। ঠিক সেই সময় এক ভুটীয়া ঘোড় পাহাড়ী টাট্টু চ'ড়ে এসে দুজনকে দুই চিঠি দিয়েই ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাল। চিঠিতে লেখা ছিল যে, "ইংরেজ সরকার আমাদের ভুটানের সীমার মধ্যে বিনা হুকুমে এক বাঙলা বাঁধিয়াছেন, দেবরাজের হুকুমে তাহা জ্বালাইয়া দেওয়া হইতেছে, তোমরা সাক্ষী রহিলে।" দুজনকেই আতসবাজী দেখে ফিরে যেতে হ'ল। দুজনেই জানতেন যে, এই সামান্য বিষয় নিয়ে সরকার যুদ্ধ করবেন না।

আমাদের চাপরাসী বরকন্দাজদের মধ্যে কেউ কেউ ভুটান যুদ্ধে সিপাই ছিল। তাদের কাছে ছেলেবেলায় ভুটানের অসীম বলের কথা কত কি শুনতাম। দেশ দুর্গম, পাহাড়ীরা পাহাড়ের আড়াল থেকে কি রকম পা দিয়ে ধনুক ধ'রে একসঙ্গে দশ-দশটা তীর ছোঁড়ে, বড় বড় পাথর গড়িয়ে ফেলে দিয়ে সিপাইদের ব্যূহ নষ্ট ক'রে দেয়, বেছে বেছে গোলন্দাজদের তীর মারে, এই সব নানা গল্প শুন্‌তাম। হয়ত তার অর্দ্ধেক গাঁজাখুরী, কিন্তু আমরা ঠিক সত্যি মনে করতাম। ভূগোল পড়তে যখন আরম্ভ করলাম, দেখলাম যে ভুটানের পেছনে তিব্বত আর তিব্বতের পেছনে চীন, সব বৌদ্ধ, কাজেই ধ'রে নিলাম যে, চীনকে না হারিয়ে সাহেবরা কোনদিন ভুটান দখল কর্‌তে পারবে না। এই নিয়ে ছেলে বুড়ো চাকর মনিব সবাই একটু আনন্দ পেতাম। কিন্তু এ আনন্দ কেন তা বোঝা শক্ত, কারণ ভুটীয়াদের সঙ্গে আমাদের জাত ধর্ম্ম ভাষা কিছুরই মিল ছিল না। বর্ম্মার রাজ্য গেল যখন, তখন আমরা বালক হ'লেও এটুকু জানতাম যে, বর্ম্মা ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ। তবু আমরা সত্যি বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। সে বছর ভয়ানক উল্কাপাত হ'য়েছিল। লোকে সহজেই এই ব্যাপারের সঙ্গে থিবো রাজার পতনের যোগ দেখ্‌তে পেল। দেশে কি ধীরে ধীরে সমগ্র এসিয়ার একত্বজ্ঞান আস্‌ছিল! যাই হোক্, সরকার সীমান্ত সম্বন্ধে চিরদিন অতি সাবধান ছিলেন। একবার কুচবেহারে ভুটীয়া দূতদের সামান্য কিছু বারুদ ও ছররা জোগাড় ক'রে দেওয়ার অভিযোগে একজন প্রাচীন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে অনেক নিগ্রহ ভোগ কর্‌তে হ'য়েছিল। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক ছাড়া পেলেন, ও ওকালতী করবার অনুমতি পেয়ে উকিল হ'লেন। কতকটা স্বাধীন হ'য়ে তিনি প্রজাদের কল্যাণ করবার চেষ্টাও করেছিলেন।

প্রজারা অশিক্ষিত সরল প্রকৃতির লোক ছিল। তাদের একটা স্বতন্ত্র

মত বা public opinion ছিল না। উকিল মোক্তার, হাকিম আমলা, বেশীর ভাগই পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গলার অধিবাসী ছিলেন। পূর্ব্ব-পশ্চিমের রেষারেষি ভাব ছিল না, কারণ দু'দলই বাইরের লোক, গরজ একই। খাস কুচবেহারী বল্‌তে বোঝাত, রাজবংশী ও ঐ-দেশী মুসলমান। পুরানো বাসিন্দা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও জমীদার যাঁরা ছিলেন তাঁরাও কুচবেহারী ব'লে গণ্য হ'তেন। বাইরের বাঙ্গালীদের নাম ছিল ভাটিয়া। রাজগণেরা (কুমার সাহেবেরা) অধিকাংশ কিছু কর্‌তেন না। যে দু-চারজন হাকিমী কর্‌তেন তাঁরা যোগ্য সজ্জন ছিলেন। তাঁদের ভাটিয়া বিদ্বেষ ছিল না। রাজগণেরা বরাবরই বাবাকে নিজেদের প্রতিনিধি মনে কর্‌তেন আর নিজেদের সুখ দুঃখের সকল কথাই বল্‌তে আসতেন। আমি বড় হওয়ার পর আমাকে কুচবেহারে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ এঁদেরই বেশী ছিল। খাস কলিকাতার যে কয় ঘর ছিলেন, তাঁরা মহারাজের শ্বশুর বাড়ীর দেশের লোক ব'লে একটু আলাদা আলাদা থাক্‌তেন কিন্তু সেটাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। মোটের উপর কুচবেহার শহরটা ছিল যেন একটা বৃহৎ পরিবার। সর্ব্বত্র আমাদের অবাধ গতি ছিল। সব বাড়ীতেই দৌরাত্ম্য আবদার চল্‌ত। কার্য্যতঃ জাতিভেদের বালাই বড় একটা ছিল না, তাই অনেক বয়স পর্য্যন্ত আমাদের জাতিভেদ সম্বন্ধে জ্ঞান খুব আবছায়া রকমেরই ছিল। অথচ এমন নয় যে, আমরা সবাই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ছিলাম। তন্তুবায়, পরামাণিক, সুবর্ণবণিক, শাহা প্রভৃতি সব বর্ণই আমাদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে ছিল। কিছুদিন বুন্দেলা রাজপুত এক ভদ্রলোক চাকরী কর্‌তে এসেছিলেন, কখনও কখনও মুসলমান দুই-একজনও ছিলেন কিন্তু আমাদের খাওয়া-দাওয়ায় পংক্তিভেদ দেখি নাই। গোঁড়া হিন্দু দুই-একটি যা হাকিম মহলে ছিলেন, তাঁরাও একটা বেখাপ্পা কিছু কর্‌তেন না, কোন রকমে নিজের জাতটা বজায় রাখ্‌তেন। কারও কারও আবার জাতিভেদ সন্ধ্যার পর থাক্‌ত না। সেই সময় আমাদের বাড়ীতে বৈঠক বস্‌ত, তাশ-পাশা খেলা হ'ত, জলযোগ নানা রকমের হ'ত, তা'তে বড় একটা কারও আপত্তি ছিল ব'লে মনে নাই। এ সব সন্ধ্যা-বৈঠক ছেড়ে দিলেও একটা বেশ সার্ব্বজনীন ভাব দেখা যেত যা অন্যত্র দুর্লভ ছিল। হয়ত এটা ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা। ছোট-বড় অনেকেই ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। বাবা সাধারণ সমাজের সভাপতি বরাবরই ছিলেন যদিও তিনি আচারঅনুষ্ঠানে পূরোপূরি ব্রাহ্ম কোনদিন হ'ন নাই। খাগড়া বাড়ীর পণ্ডিত-মণ্ডলী বা অন্য গোঁড়া ধরণের লোকেরা এই কারণে কিন্তু কোনদিন তাঁর বিরোধী ছিলেন না। মহারাজ সস্ত্রীক নববিধান সমাজভুক্ত ছিলেন। দুই সমাজের মধ্যে কুচবেহারে বা অন্যত্র

সদ্ভাব ছিল বল্‌লে মিথ্যা কথা বলা হবে। কিন্তু মহারাজ সকল রাজগুণের অধিকারী ছিলেন, ধর্ম্মমতের জন্য বিরোধ তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। বহুকাল পরে, এক ক্লাব স্থাপনের চেষ্টায় গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রবাবু ও আমি মহারাজের কাছে গেছলাম। মহারাজ সব রকমে আমাদের সাহায্য করতে রাজী হ'লেন। বল্লেন যে নগদ টাকা দেবেন, সাজ-সরঞ্জাম দেবেন, শেখাবার জন্য বিলেত থেকে খেলোয়াড় আনিয়ে দেবেন, কিন্তু বেশ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, ক্লাবে কোন রকম জাত কি সম্প্রদায় ভেদ থাকলে আমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখ্‌বেন না। রাজধানীতে গির্জা, মসজিদ, ব্রাহ্মমন্দির, হিন্দুমন্দির সবই ছিল। সবাই রাজভাণ্ডার থেকে সাহায্য পেত।

রাজবংশের কুলদেবতা মদনমোহন। আগে ঠাকুরবাড়ী ছিল রাজবাড়ীর সামনেই। মহারাজ যখন নাবালক, তখন ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি হটন্ সাহেব ঠাকুরকে দূরে সরাবার মতলব করেন, কিন্তু হঠাৎ রাত্রে সাহেবের মুখ দিয়ে রক্ত ওঠায় তাঁকে সে মতলব ত্যাগ করতে হয়, এই রকম জনশ্রুতি। তবে সাহেবের ভয় হওয়ার কথাটা বিশ্বাস করা রীতিবিরুদ্ধ। মহারাজ গদীনশীন হওয়ার পর, অনেক খরচ-পত্র ক'রে সম্পূর্ণ ফরাসী ধরণের নূতন রাজবাড়ী উঠ্‌ল। রাজবাড়ীর হাতাটা বিলেতী জমীদার বাড়ীর পার্কের মত করা হ'তে লাগ্‌ল, অর্থাৎ আঁকা বাঁকা ঝিল আর চারিদিকে উঁচু নীচু ঢেউ-খেলানো ঘাসের জমী। পুরানো ঠাকুরবাড়ী সেখানটায় আর মোটেই খাপ খেত না। তাই দূরে সহরের মাঝখানে এক পুকুরের পাড় জুড়ে মদনমোহন দেবের নূতন আবাস তৈরী হ'ল। বড় মন্দিরটি সুন্দর হ'লেও নূতন ধরণের লাগ্‌ত, কেননা বাঙ্গলা দেশের পঞ্চরত্ন নবরত্ন মন্দির না ক'রে, ফাগুর্সনের কেতাব দেখে পশ্চিমের পুরানো হিন্দু মন্দিরের নকল করা হয়েছিল। কেন যে এরকম করা হ'ল আমি জানিনা। কেন যে এই গরীব বাঙ্গলা দেশের পঞ্চরত্ন নবরত্ন মন্দিরের শোভা আমাদের চোখে পড়ে না, কেন যে বাঙ্গালীর ও বাঙ্গলার কোন গুণই আমরা দেখ্‌তে পাই না, কি বুদ্ধির বশবর্ত্তী হ'য়ে আজ আমরা মাথায় সাদা টুপী প'রে, হিন্দী বলতে বল্‌তে, দৈশ উদ্ধার কর্‌তে সকলের পেছনে চলেছি, তা বোঝা ভারী শক্ত। আমাদের কুচবেহারের মহারাজ গৌরব ক'রে বল্‌তেন, "আমি কোচ, আমি অনার্য্য, আমার আর্য্য ব'লে গণ্য হবার কোন সাধই নাই।" আমিও সেই রকম বল্‌ছি, "ভাই বাঙ্গালী, তুমি আর্য্য নও, তুমি অনার্য্য, তোমার দেশে এলে আর্য্যদের জাত যেত। তুমি কুরুপাণ্ডবদের বংশধর ব'লে নিজেকে জাহির ক'রে হাস্যাস্পদ হয়ো না। তোমার পূর্ব্বপুরুষ নমঃশূদ্র, কৈবর্ত্ত, যারা সমুদ্রগর্ভ হ'তে দক্ষিণবঙ্গ উদ্ধার

ক'রে তোমার দেশের শস্যশ্যামলা নাম সার্থক ক'রেছে। তোমার পূর্ব্বজ যারা, কোচ, মেচ, যারা গভীর জঙ্গল কেটে উত্তরবঙ্গ মানুষের বাসের উপযোগী ক'রেছে। তোমার ডিঙ্গা, ময়ূরপঙ্খী নাও নিয়ে তোমার যে মাল্লারা সাগরে পাড়ি দিত তারা তোমার পূর্ব্বপুরুষ, ভীম অর্জ্জুন নয়। সত্যি বলতে কি, তোমার অতীতের দিকে চাওয়া বিড়ম্বনা, তোমার ইতিহাস বর্ত্তমানে ও সম্মুখে। রাজা রামমোহনের শতাব্দীতে তুমি দেখিয়েছ তোমার জোর। এই শতাব্দী আরও তোমার কত কীর্ত্তি দেখবে। ভয় নেই। পাঁজী পুঁথিগুলো ছিঁড়ে ফেলে কেবল এগিয়ে চল।"

এক মন্দিরের কথা নিয়ে কি বক্তৃতাই না করলাম। পাঠকের কাছে মাপ চাইছি। নূতন মন্দির তৈরী হ'লে, এক শুভদিনে, হাতী ঘোড়া, সৈন্য সামন্ত, রসনচৌকী, ইংরেজী ব্যাণ্ড ইত্যাদি নিয়ে প্রকাণ্ড মিছিল ক'রে, মদনমোহন গৃহপ্রবেশ করলেন। সঙ্গে রাজ্যের সব কর্ম্মচারী, সাহেব পর্য্যন্ত। মহারাজ পাটহাতীতে চ'ড়ে মিছিলের আগে আগে গেলেন যদিও তিনি ব্রাহ্ম আচার্য্যের জামাতা। রাজা তিনি, রাজধর্ম্ম যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের চেয়ে অনেক বড় তা তিনি বুঝতেন। নূতন মন্দিরের জন্য কাশী থেকে অনেক খরচপত্র ক'রে নহবৎ এল, দেবতুষ্টির জন্য আরও অনেক রকম ব্যবস্থাও হ'ল। মোটের উপর, মদনমোহন বোধ হয় খুসী হ'য়েই বাড়ী বদল করলেন, কারণ এবার কারও মুখ দিয়ে রক্ত উঠল না। বৈরাগীদীঘির শোভা বৃদ্ধি হ'ল।

কুচবেহার সহরটী ছোট হ'লেও ভারী সুন্দর। একেবারে নূতন। রাস্তাগুলি সব সহরের এক প্রান্ত হ'তে আর অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সোজা চলে গেছে। লাল লাল রাস্তা, দুধারে সবুজ ঘাস। মাটি এত রসাল যে ঘাস কখনও শুকোয় না। সব জিনিসটা যেন রুলার গজকাঠি নিয়ে মেপে তৈরী। আমাদের বাড়ী ছিল সাগরদীঘির পশ্চিম পাড়ে এক টিলার উপর। উত্তর দিকে তাকালেই হিমালয়ের নীলরেখা দেখা যেত। ভোরের আলোয় সেই নীলরেখার উপর কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্ব্বতরাজের শুভ্র কিরীটের মত দেখাত। ছেলেবেলা থেকে এই ছবির মত পাহাড়ের দৃশ্য দেখা অভ্যাস, কাজেই যখন বারোবছর বয়সে প্রথম পাহাড়ে গিয়ে তার এবড়ো খেবড়ো গড়ন, এলোমেলো রং দেখলাম, তখন নিতান্তই নিরাশ হ'লাম। তারপর ত কত পাহাড়ই দেখেছি, কিন্তু কাছের পাহাড় আজও ভাল লাগল না। অনেক দূরে ঘন নীল পাহাড়ের চূড়ার শোভাই সব চেয়ে চমৎকার বোধ হয়। তার পরেই লাগে ভাল অন্ধকার অস্পষ্ট গভীর খদের তলা। অর্থাৎ দুটোই দূরের জিনিস আর দূরের বলেই idealised। এই যে সাবেক কালের কথাগুলো বলতে নিজেরই এত

আনন্দ হচ্ছে এ কেবল সে কালটা এত দূরে ব'লে। বিংশ শতাব্দীর হিন্দু আমরা, কত পালিশ করা আমাদের ভাব ভঙ্গী, অথচ আমাদের এত ভাল লাগে বৈদিক যুগের আদিম অপরিণত সভ্যতার কথা। দূর হ'ক ত? উপরে বলেছি যে কুচবেহার সহরটী খুব আধুনিক ও ভারী সুন্দর। ছেলেবেলায় কিন্তু তার চেয়ে আমাদেব অনেক ভাল লাগত সাবেক রাজধানী ফলতাপুরের ধ্বংসাবশেষ। বাড়ীগুলো ছিল সব পাথরের, সহরের চারিদিকে কেল্লা ও গড়, দেখলে মনে হ'ত, হাঁ কুচবেহার পুরানো রাজ্য বটে। নূতন মদনমোহন বাড়ীর চেয়ে অনেক ভাল লাগত ফলতাপুরের কাছের প্রাচীন দেবীমন্দির। এই মন্দিরের নাম গোসানীমারীর মন্দির, জাগ্রত দেবতা। এখানকার কচি পাঁঠার মাংসের প্রসাদ লোভনীয় জিনিষ ছিল। একটা কথা জানানো দরকার যে, আমাদের সেকালের ভাষায় মায়ের প্রসাদের নাম ছিল চরু। আমাদের বাড়ী যে প্রসাদ কালীবাড়ী থেকে নিত্য বরাদ্দ ছিল সেটা একটা পা (leg)। কৃত্তিবাসী রামায়ণে যখন পড়লাম যে দশরথের নিঃসন্তান রাণীদের চরুভক্ষণ করানো হ'ল, নিশ্চয় ভাবলাম যে তাঁদের পাঁঠার চরণ খাওয়ান হ'ল। বড় হ'য়ে অমরকোষ ইত্যাদি প'ড়ে তবে ভুল ভাঙ্গল। গোসানীমারীর যে মন্দিরের কথা বলছিলাম সেটা একটা পীঠস্থান, নাম রত্নপীঠ, প্রমাণ গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা। ঐ মন্দিরে কুচবেহারের রাজারা কখনও যান না। দেবীর অভিশাপ আছে। এ সম্বন্ধে গল্পটা এই যে, বৎসরের কোন এক অমাবস্যার রাত্রে এই মন্দিরের মধ্যে দেবী দিগম্বরীবেশে নৃত্য করেন। নৃত্যের সময় মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ থাকে। আগেকার এক মহারাজ পুরোহিতদের উপর জুলুম ক'রে সেই নাচের সময় ভেতরে উঁকি মারেন আর ফলে দেবীর শাপে তৎক্ষণাৎ ম'রে যান। সেই থেকে কোনো রাজা গোসানীমারীর মন্দিরে যান না।

রাজধানীর উত্তরে আর এক পুরানো মন্দির আছে, বাণেশ্বরদেবের। ঐ মন্দির যে পুরানো তাতে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ সেটা দেবতাদের খাদ্যাখাদ্য বিধি স্থির হওয়ার আগের প্রতিষ্ঠান। আমিও আগে এটা জানতাম না। বড় হওয়ার পরে, অর্থাৎ বন্দুক চালাবার হুকুম পাওয়ার পরে, একবার শিবরাত্রির দিন আমরা শিকার ক'রে সেই পথে ফিরছিলাম। প্রায় জনা ছয়েক ছিলাম, আর সকলের কাঁধে কাঠিতে বাঁধা মরা হাঁস। বেলা বারোটা। এমন সময় দেখি যে মন্দিরের একজন ছোকরা পুরোহিত সেই দিকে দৌড়তে দৌড়তে আসছেন। আমার ভয় হ'ল যে, আমরা একটা কিছু অব্রাহ্মণ্য কাজ ক'রে ফেলেছি। এসব ঋষিকুমারদের শিকারী নিগ্রহের বিষয়ে উৎসাহ সেই মহাভারতের যুগ থেকে। ব্রাহ্মণকুমারকে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাই ঠাকুর? আর একটু হ'লেই

জিজ্ঞাসা ক'রে ফেলেছিলাম আর কি, "আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? রাক্ষসাদির কোন উপদ্রব নাই ত? নীবার ধান্যের অবস্থা ভাল ত": হঠাৎ স্মরণ হ'ল যে, এ কলিযুগ, মৃগয়ারত হ'লেও আমরা ক্ষত্রিয় নই যবনবেশী শূদ্রমাত্র, আর ঋষিকুমারটী একজন শাস্ত্রবিষয়ে একান্ত বিগতস্পৃহ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ। পুরোহিত আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন, "জয়োঽস্তু আপনাদের আজ মন্দিরে প্রসাদ পেয়ে যেতে হবে। বাবা বিশেষ ক'রে বলেছেন।" একে শিবমন্দির, তায় শিবরাত্রি, প্রসাদ পেয়ে প্রসন্ন হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই মনে ক'রে বল্‌লাম যে, আমাদের রক্তমাখা কাপড় চোপড়, গায়ে বারুদের গন্ধ, এ অবস্থায় মন্দিরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ব্রাহ্মণকুমার ছাড়লেন না, টেনে হিঁচড়েই একরকম আমাদের নিয়ে গেলেন। ভাগ্যিস্ জিদ ক'রে বাড়ী চলে যাই নাই। সেখানে গিয়ে দেখি, প্রসাদ মানে খাসির মাংসের কালিয়া ও কবুতরের চচ্চড়ি। ক্ষুধা নিবৃত্তির পর, গাছপান ও সুপারি খাওয়ার সময় একটু প্রত্নতত্ব চর্চ্চা নিয়ে পড়লাম। বৃদ্ধ পুরোহিত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, বাণেশ্বরদেবের কাছে বলিদান কি ক'রে হ'ল। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, বলিদান মোটেই হয় নাই, খাসিটা ঠেঙ্গিয়ে মারা হয়েছিল আর পায়রাগুলোর গলা টেপা হয়েছিল, রক্তপাত আদবে হয় নাই।

সমস্যার সমাধান হ'ল। যাক্, এখানে ত রক্তপাত হ'ল না, কিন্তু দার্জ্জিলিঙে মহাকাল বাবার সামনে বলির জীব ঠেঙ্গিয়ে মারার কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে সনাতন নিয়মে গলাকাটা হয়। এরা সবাই হিন্দু, পণ্ডিতজী স্বীকার করুন আর নাই করুন। বাঙ্গলা দেশে দশভূজার সামনে অনেক বাড়ীতে পাঁঠা বলি দেওয়া হয় না, কুমড়ো খাঁড়া দিয়ে কেটে তাইতে সিঁদুর দিয়ে খানিকটা নকল রক্ত তৈরী ক'রে নিয়ে পূজা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করা হয়। এ সিঁদুর যেন আমাদের একেলে নিরামিষ ভোজের মোচার চপ্ ও ইচড়ের কাট্‌লেট্। আমার যেন মনে হয় যে, এই সব ব্যাপারগুলো খুব স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দেয় যে বাঙ্গালীর সভ্যতা বা অ-সভ্যতা নানা স্থান থেকে কুড়ানো, শুধু প্রাচীন ঋষিদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া নয়। ধর্ম্মপূজা ও শূন্যপুরাণের কথাও বলিতে পারতাম, যদি সে বিষয়ে বিদ্যার একান্ত অভাব না হ'ত। গম্ভীরা নাম, মনসার ভাসান, কুচবেহারের বিষহরির গান ও মদনকামের পূজা, এ সব শ্রুতিজাত মনে করার কারণ আছে কি? আর একটা ছোট গল্প এই সম্পর্কে বলি। কুচবেহারের মদনমোহনদেব সোনার বংশীধারী মূর্ত্তি, তাঁর মন্দিরের দুধারে কালী ও তারাদেবীর মন্দির। তিন মন্দিরই এক ইমারতের মধ্যে। দেবীর সামনে রোজ পাঁঠা বলি হয়। পরোক্ষে এই

মাংস খাওয়ার অপরাধে বছরে একবার ক'রে মদনমোহন ঠাকুরের জিম্মা হ'ত। বাণেশ্বর পাল্কী ক'রে এসে বিচার ক'রে এক টাকা জরিমানা ক'রে যেতেন। এ ব্যাপারের সঙ্গে শ্রুতিস্মৃতির সম্বন্ধ আমি ত ঠিক করতে পারি নাই। পাঠক চেষ্টা কর্‌বেন, নয়ত আজকালকার হিন্দুসভাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন।

ঠাকুরমন্দিরের কথা একটু বেশী হ'য়ে গেল। তবু আর একটা ছোট্ট গল্প বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। গল্পটা হাল্কা হ'লেও তবু ভাবুক পাঠক-এর ভেতরে তত্ত্বকথা পাবেন। তা ছাড়া, রচয়িতা একজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হওয়ায় গল্পটা অশাস্ত্রীয় বলা যেতে পারে না। গল্পের স্থান, এক নির্জ্জন প্রান্তরে ভাঙ্গা শিবালয়। সময়, শ্রাবণ মাস, সন্ধ্যাবেলা। আকাশজোড়া মেঘ আর ঝুপঝুপ বৃষ্টি, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পথশ্রান্ত এক ফকীর সেই পথে যাচ্ছিলেন। ঝড়বৃষ্টিতে হায়রান হ'য়ে, তিনি মন্দিরে আশ্রয় নিলেন। ফকীর বিধর্ম্মী, হিন্দুদের ঠাকুর সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু জানা ছিল না। শুকনো জায়গা পেয়ে শিবলিঙ্গের মাথার উপরেই ব'সে পড়লেন। বেশ ক'রে ব'সে তাঁর ঢিলে জামার ভেতর থেকে কাঠি-কাবাব বের ক'রে তিনি জঠরাগ্নির পূজা আরম্ভ কর্‌লেন। ঘন ঘন বিহ্যাতের আলোয়, শিবলিঙ্গে অধিরূঢ় সাদাদাড়ী ফকীরবাবাকে নিশ্চয়ই অপরূপ দেখাচ্ছিল। ঝড় উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। এমন সময় এক হিন্দু চাষা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসে মন্দিরে ঢুকে পড়ল। তার পা'ময় কাদা, সর্ব্বাঙ্গে জল ঝরছে। মন্দিরে নূতন দেবতা অধিষ্ঠিত দেখে সে ভয়ে অভিভূত হ'য়ে গেল। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে কোনমতে নিজেকে ঝড়ের ঝাপটা হ'তে বাঁচাতে লাগল। ফকীর কিছু বল্লেন না বটে, কিন্তু দেবতার দয়া হ'ল না। মূর্ত্তির ভেতর থেকে গম্ভীর আওয়াজ হ'ল, "মোল্লা বাবা, একবার পা-টা সরাও ত, হিন্দু ব্যাটার ঘাড়টা মটকে দিই। ব্যাটা ছোটলোক, তুমি কাদা পায়ে নোংরা কাপড়ে মন্দিরে ঢোক?" তারপর কি হ'ল শুনি নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু

পথের পাঁচালী

De jour en jour l'art diminue le respect de lui-même, se prosterne devant la réatité extérieure, et le peintre devient de plus en plus enclin à peindre non pas ce qu'il rêve, mais ce qu'it voit. Cependant c'est un bonheur de rêver, et c'était une gloire d'exprimer ce qu'on voit.

বাস্তবেরে নমি'—ধীরে শিল্পের গৌরব করে ক্ষুণ্ণ রূপকার ;
যাচে না ত চিত্রী হায়! রূপায়িতে স্বর্ণদেহে স্বপন তাহার !
আকাঙ্ক্ষে চিত্রিতে মূঢ়—শুধু দৃশ্যমানে, ভুলে—আনন্দ পরম
রাজে স্বপ্নলোকে,—যারে মূর্ত্তি দানি' লভে শিল্পী কীর্ত্তি নিরুপম।

Curiosités Esthétiques . . . . . Baudelaire.

(খোলা চিঠি)

শ্রীসোমনাথ মৈত্র প্রিয়বরেষু—

আজ "পথের পাঁচালী" নিয়ে তোমার সঙ্গে একটু আনন্দ করব। কারণ? কারণ এতে রসের সরসতা বিচিত্রতর হ'য়ে ওঠে। ভেবে দেখ, তা যদি না উঠ্‌ত তবে সমসাময়িকদের মধ্যে "সমানধর্ম্মী"-কে না পেলে কি দরদীর জন্যে কবিকে "নিরবধি কালে"-র দোহাই পাড়তে হ'ত, না "বিপুলা পৃথ্বীর" কাছে হাত পাততে হ'ত?

আর বিশেষ ক'রে তোমার সঙ্গে 'পথের পাঁচালী' নিয়ে আনন্দ করতে চাওয়ার কারণ, প্রথমতঃ ওই বইটি প'ড়ে আমার মতন তুমিও মুগ্ধ হয়েছ, ও দ্বিতীয়তঃ তুমি হচ্ছ সেই শ্রেণীর দরদী যার দেখা সব দেশেই কম মেলে, অর্থাৎ—রসিকসুজন। তাই-না, কি গানের রসগ্রহণে, কি কাব্যরসাস্বাদনে, কি প্রকৃতির উপভোগে—তুমি চাও শুধু সেই বস্তুরই সাক্ষাৎকার যা কম লোকেই প্রবুদ্ধভাবে চায়—অর্থাৎ ঐ 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য' রসের। এমন মানুষের কাছেই হৃদয়-দুয়ার খুলে আনন্দ আছে যে সত্য রসয়িতা, যে মেকিতে ভোলে না, যে নতুন কিছু দেখ্‌লেই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে না—যদি না তার মধ্যে ঐ রসবস্তুর দেখা পায়। কে না জানে বল যে সব দেশেই একদল তথাকথিত সমালোচক আছেন যাঁরা নতুন কিছু দেখ্‌লেই গদ্‌গদ হ'য়ে ওঠেন, বলেন "ওরিজিন্যাল!"—সুতরাং "ক্যাপিটাল!! ওয়ণ্ডারফুল!!!" এঁদের মনস্তত্ত্ব কী রকম? না, শিশুর। শিশু প্রতিপদে চমককেই ভাবে জীবনের সর্ব্বোত্তম রস, নিত্য সুন্দরকে ভুলে বরণমালা দেয় বিস্ময়োদ্দীপককে। তুমি জানো ওস্তাদি গানের অধিকাংশ ভক্তই ওস্তাদির এই 'পিলেচমকপ্রদ' গুণকেই রাগশিল্প ব'লে ভুল ক'রে থাকেন।

সাহিত্যেও তাই। শুধু সাহিত্যে কেন, সব ললিতশিল্পেই তাই। রোমান্টিকের পুলকোচ্ছ্বাস ব'লে ঠিকে-ভুল-করাটা হচ্ছে মানবমনের একটা চিরন্তন দুর্ব্বলতা—অনভিজ্ঞের শাশ্বত পাথেয়। বদ্‌লেয়ার এই শ্রেণীর চমকপ্রিয় শিল্পীদের পরে বেশ একটি কটাক্ষ ক'রেছেন—"Parce que le Beau est toujours étonnant, il serait absurde de supposer que ce qui est étonnant est tonjours beau"। * এবং এ ধরণের হসনীয় কথা বেরোয় কেবল তাঁদের মুখ থেকে যাঁরা বিস্ময়ের আতিশয্যে ভুল ক'রে ভুলে যান যে, শুধু ওরিজিন্যালিটির চমক রসসভার ছাড়পত্র হ'তে পারে না—ওরিজিন্যালিটির লক্ষ গুণ সত্ত্বেও না।

কিন্তু সে যাক্‌গে। আমার এ চিঠি তোমাকে লেখার প্রধান কারণ এই যে, তুমি এই দলের লোক নও, তোমার রসিক মনের খাঁটি নিকষ-পাথরে উত্তেজনার লম্ফঝম্ফ দাগটিও ফেল্‌তে পারে না। তোমার সুকুমার হৃদয়টি শ্রদ্ধাপ্রবণ—অথচ অপাত্রে শ্রদ্ধার নির্ম্মাল্য দিয়ে দেবতার ও অর্ঘ্যের অপমান করে না। কিছুদিন আগে শ্রীমতী আশালতা 'উত্তরা'য় মধ্যবর্ত্তিনী ব'লে একটি প্রবন্ধে বড় সুন্দর ক'রে লিখেছিলেন যে, এই শ্রেণীর গ্রহীতা একদিক দিয়ে স্রষ্টাও—যেহেতু তিনি স্রষ্টার সৃষ্টিশক্তিকে নিত্যনিয়ত উদ্বুদ্ধ করেন।

তুমি লিখেছ "পথের পাঁচালীর মতন বই বাংলা ভাষায় ক'টাই বা আছে?" খুব সত্য কথা। আমার বার বার মনে হ'য়েছে যে, বর্ত্তমান তরুণ যুগে যে কয়খানি কাব্যে সত্যই স্থায়ী রস ফুটে উঠেছে তাদের মধ্যে "পথের পাঁচালী" ও "বন্দীর বন্দনা"-র স্থান খুব উচ্চে। † কারণ এ দুটি কাব্যের মূল প্রেরণাটির উদ্ভব সত্য রসানুভূতি হ'তে—সৃষ্টির আনন্দ হ'তে—সাময়িকতার উত্তেজনা হ'তে না। গোড়ায়ই বদ্‌লেয়ারের যে-কথাটি উদ্ধৃত ক'রেছি "পথের পাঁচালী" পড়তে পড়তে মনে হয় না কি সে কথাটি কত সত্য? মনে হয় না কি যে কবি যখন বাস্তব নিপুণ দৃষ্টির সঙ্গে 'অবাস্তব' স্বপ্নকায়ার আভাস দিতে সক্ষম হ'ন কেবল তখনই তাঁর সৃষ্টি নিবিড়তম রসসৃষ্টি করে? মানবমনের চিরন্তন অভীপ্সা (aspiration):—

"উধাও আগ্রহভরে উর্দ্ধ নভে উঠিবারে চায়
অসীমের নীলিমারে জড়াইতে ব্যগ্র আলিঙ্গনে
আপন আসন পাতে নিদ্রাহীন নক্ষত্র-সভায়" ‡

* সুন্দর বিস্ময়োদ্দীপক ব'লে একথা বলা হসনীয় যে বিস্ময়োদ্দীপক মাত্রেই সুন্দর।
† অবশ্য "বন্দীর বন্দনা"র সব কবিতাগুলিই সমশ্রেণীর নয়। কিন্তু ক'টা কাব্যপুস্তক একথা করতে পারে যার সব কবিতাগুলিই রসোত্তীর্ণ?
‡ বন্দীর বন্দনা—বুদ্ধদেব বসু।

"পথের পাঁচালী"-র পাতায় পাতায় এই নভোপিপাসা, স্বপ্নাবেশের দেখা পাই। পাঠকের চোখের সামনে চিত্রের পর চিত্র, রেখার পর রেখা, রঙের পর রঙ ফুটে ওঠে তাদের অন্তর্লীন আনন্দঘন রসটি নিয়ে—পুলক-বেদনায়, আশা-নিরাশায়, হাসি-অশ্রুতে সলীল হ'য়ে শ্যামল হ'য়ে মেদুর হ'য়ে। আর রসিক মন কৃতজ্ঞ অন্তরে শিল্পীর সোনার কাটিকে অভিবাদন করে—যার স্পর্শে পাতালপুরীর সুপ্ত রাজকন্যা জেগে ওঠে, তুচ্ছ সার্থক হ'য়ে ফুটে ওঠে, মর-স্পন্দন কালজয়ী নীলিমার বর্ণে দীপ্ত হ'য়ে ভেসে ওঠে। ওঠে—কেননা "পথের পাঁচলী"-র কবি শিল্পী, রূপকার, ছন্দকৌশলী।

বস্তুতঃ "পথের পাঁচালী" পড়তে না পড়তে সব আগে মন মুগ্ধ হয় গ্রন্থকারের গল্পের মধ্যে এই কাব্যরসে—এই ছন্দে। প্রথম সংখ্যার "পরিচয়"-এ শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ললিত গদ্য পদ্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে ভাষার ক্রমবিকাশে ছন্দের স্থান সম্বন্ধে কয়েকটি সুচিন্তিত কথা লিখেছেন। তাঁর বক্তব্যটি আর একটু স্ফুট ক'রে তুল্‌লে তিনি ভাল করতেন, কিন্তু তা না করলেও তাঁর গোড়াকার কথাটি যে সত্য তা রসিক মাত্রেই অনুভব করতে বাধ্য। একথাটা সংক্ষেপে একটু বলি আগে, বিশেষ যখন "পথের পাঁচালী" পড়তে পড়তে মনে বেশি ক'রেই উদয় হয় এর সত্যতা। কথাটা এই যে, সাহিত্যের রস অপেক্ষা রাখে শুধু ভাবের বা চিন্তার নয়—ছন্দেরও। ছন্দ বল্‌তে আমরা প্রায়ই গোলমাল ক'রে ফেলি—তার বাহ্য বাহনটিকেই একান্ত ক'রে দেখি। অর্থাৎ ছন্দ বল্‌তে আমাদের মনে সর্ব্বাগ্রেই জাগে metre এর-কথা। ইংরাজীতে metre ও rhythm দুটো আলাদা কথা আছে। ছন্দের গভীরতম অর্থ—এই rhythm; metre-এর আলাদা বাংলা নেই ব'লেই মনে হয়, তাই সাঙ্গীতিক পরিভাষায় ওকে "তাল" ব'লে অনুবাদ করাই বোধ হয় সবচেয়ে সুষ্ঠু হবে।

এখন আমার বক্তব্য এই যে, ললিত-সৃষ্টিতে মানুষ প্রায়ই ছন্দের এই বাহ্য পাদপূরণকে—এই তালকে—একান্ত ক'রে দেখে ভুল ক'রে বসে। কিন্তু একটু গভীরভাবে প্রণিধান ক'রে দেখ্‌লেই বোঝা যায় যে তাল ললিত-সৃষ্টিকে সুগ্রথিত করলেও—সলীল করলেও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তথা ললিত-সৃষ্টিতে "এহ বাহ্য"। মানে, তাল অনবদ্য হ'লেও তাতে ক'রে গানে বা কাব্যে ছন্দের অন্তর্গূঢ় সেই নিহিত কিঙ্কিণীটি, সেই গোপন কল্লোলটি না বেজে উঠ্‌তে পারে। ধ্বনির মধ্যে এই যে রলরোল, গতির মধ্যে এই যে কিঙ্কিণী, বাক্যবিন্যাশের মধ্যে এই যে নিগূঢ় উদাত্ত সমুদ্রগর্জ্জন এ ফুটে ওঠে কেবল ছন্দের নিবিড়তম অনুভূতিতে, দুর্ব্বার প্লাবনাসারে—যখন সৃষ্টি ওঠে রসঘন হ'য়ে—যাকে বলি—"জ'মে-ওঠা"। শ্রীঅরবিন্দ

সেদিন তাঁর একটি চিঠিতে ছন্দের এ অদৃশ্য ও দৃশ্যমান রূপের বড় সুন্দর আভাস দিয়েছেন—সংক্ষেপে। সেইটুকু উদ্ধৃত ক'রে এ ভূমিকার ইতি করি। শ্রীঅরবিন্দ লিখ্ছেন:

"There are two factors in poetic rhythm,—the technique (the variation of movement without spoiling the fundamental structure, right management of vowel and consonantal assonances and dissonances, the masterful combination of the musical element of stress with the less obvious element of quantity), and the secret soul of rhythm which uses but exceeds these things. The first you can learn if you read with your ear always in a tapasya of vigilant attention to these constituents ; but without the second what you achieve may be technically faultless and even skilful, but poetically a dead letter. This soul of rhythm can only be found by listening in to what is behind the music of words and sounds and things. You can get something of it by listening for that subtler element in great poetry, but mostly it must either grow or suddenly open in yourself."

(শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁর "কাব্যের মুক্তি" প্রবন্ধে প্রথম সংখ্যার "পরিচয়ে" এই কথাটিই ব'লেছেন দু'একটি উদাহরণ দিয়ে। তাঁর মোট কথাটি (১) "কাব্যের শব্দ আবেগবাহী" ও (২) "আবেগপ্রবণ গদ্য আর কাব্য অভিন্নাত্মা"—খুবই সত্য কথা।)

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র ভাষার ছত্রে ছত্রে এই দুর্লভ "soul of rhythm"-এর ঝঙ্কার পাওয়া যায়। বেশ বোঝা যায়, এই অশ্রুত ছন্দের কান তাঁর তৈরী হ'য়ে গেছে। নিপুণ গায়ক যেমন জানেন কোন্ আবেগটি কী সুরে সব চেয়ে উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে ওঠে, কোথাও তিনি লাগান মিড়, কোথাও বিজ্‌লি-তান, কোথাও গম্ভীর গমক, কোথাও উদাত্ত স্বরস্থিতি,—'পথের পাঁচালী'র কবি-গায়কও তেম্‌নি জানেন কোথায় ভাষাকে কি ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। অপূ বা দুর্গার কলকাকলি শুন্‌তে শুন্‌তে চোখের সাম্‌নে ফুটে ওঠে শিশুর আত্মার সরল প্রাণকাড়া সৌন্দর্য; সর্ব্বজয়ার স্নেহ-আদর, বকুনি-ঝকুনি, আশা-আকাঙ্ক্ষা শুন্‌তে শুন্‌তে দীপ্ত হ'য়ে ওঠে পল্লীগ্রামের নিরক্ষরা স্নেহশীলা জননীর স্নেহদুর্ব্বলতার সজল ছবি; তাঁর গলগ্রহ বৃদ্ধা ননদ ইন্দির ঠাক্‌রুণের মিনতি শুন্‌তে শুন্‌তে হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে ওঠে আমাদের দেশের বিধবার গভীর অসহায়তায়; নদীঘাট, তরুলতা, ফুলফল, মাঠঝোপ, বনবাদাড়, ঝড়বৃষ্টি সবেরই চিত্রণের মধ্য দিয়ে ঝ'রে পড়তে থাকে—ঐ যে বল্‌লাম যেন গুণীর "সুরের সুরধুনী"—যিনি জানেন "কেমন ক'রে গান করতে হয়।" যেখানে যে-সুরের যে-মোচড়টি দরকার ঐ শোনো, ঠিক্ সময়ে সেইটি বাজছে, আর তার যথাযথ ওজন নিয়ে, ছন্দ নিয়ে, ব্যঞ্জনা নিয়ে;—এতটুকু বেশি না, এতটুকু কম না। বস্তুতঃ বইটির আদ্যন্ত সুরেলা—এতটুকু বেসুর কোথাও কানকে প্রতিহত করে না।

আর ততোধিক দুর্লভ দৃষ্টি!—পথের প্রতি বাঁকেই ত দেখার জিনিষের অফুরন্ত মেলা বিছিয়ে প্রকৃতিদেবী আবহমান কাল ডাক্‌ছেন আমাদের শিশুপ্রবৃত্তির সদাসজাগ কৌতূহলকে। কিন্তু সে নিমন্ত্রণে সাড়া দেয় ক'জন? দেখে ক'জন? যে-সব অকিঞ্চিৎকর ঘটনা নিত্য আমাদের চোখে পড়ে অথচ চির অচেনাই থেকে যায় 'পথের পাঁচালী'র কবি তাদের নিকট-পরিচয়ের আনন্দেই আত্মহারা, সমীপ-স্পর্শেই বিভোর। ঘটনার জাঁকজমক, অভাবনীয়তার হৃৎস্তম্ভন, অবিশ্বাস্য নাটুকেপনা, সস্তা রোমহর্ষকতা—এসব নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি কখনো। তিনি আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন তাঁর জীবনের অকৃত্রিম বাণীটি সম্বন্ধে: "আমি কোনো বড় ঘটনায় বিশ্বাসবান্ নই। দৈনন্দিন ছোটো-খাটো সুখদুঃখের মধ্যে দিয়ে যে-জীবনধারা ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর মত মন্থরবেগে অথচ পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ও আনন্দের সঙ্গে চ'লেচে—আসল জিনিষটা সেখানে। কোনো কৃত্রিম প্লট সাজানো—প্যাঁচ্ কসা, কৃত্রিম 'সিটুয়েশন' তৈরী করা—আমি মানি না। নভেল কেন কৃত্রিম হ'বে? প্রতিদিনের অমূল্য দানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃত্রিমতার মালা গাঁথা ও তারই বেসাতি—শুধু টেক্‌নিকের বেসাতি হ'য়ে দাঁড়ায়। কোনো সুস্থ সতর্ক ও অনলস মনের বিভিন্নমুখী কৌতূহল তাতে চরিতার্থ হয় না।"

অবশ্য কথাগুলির মধ্যে খানিকটা একদেশদর্শিতা যে নেই তা বলি না। জীবন জ্যামিতির সরলরেখায় চলে না, কোনো একটা মূলসূত্র দিয়ে তার ইতি করা যায় না। "বড় ঘটনা" "বড়" ব'লেই "কৃত্রিম" হবে কেন? জীবননাট্যের অঙ্কগুলি সব ত সমান নয়। তার সব খাদে, সব পরিখায়, সব ক্ষেত্রে একই "ছোটো-খাটো সুখদুঃখের নদী" বইবে কেন? সেখানে কলস্বনা নদীও আছে—উত্তাল পারাবারও আছে, ছায়ানিরালা নীড়ও আছে—নিরাশ্রয় ধূ ধূ মরুও আছে, মলয়হিল্লোলও আছে—ভীষণ প্লাবনও আছে, "দৈনন্দিন" দিনগতপাপক্ষয়ও আছে—আবার সঙ্কটের বিশ্বরূপে "কালানলসন্নিভ" "দংষ্ট্রাকরাল"ও আছে। এই ধূলাবালির জীবনে শুধু স্বপ্ন-মগ্ন পৌরজনের ক্ষুদ্র ভাঙাগড়াই ত নেই, রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয় এমন বুদ্ধও দেখা দেয়, যমুনা ভেবে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় এমন চৈতন্যও প্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়ে যান। প্রতি মানুষের মধ্যেই একজন বীর আছে—সন্ন্যাসী আছে—দিগ্বিজয়ী আছে। কাজেই "আসল জিনিষটা" শুধু যে "প্রতিদিনের অমূল্য দানের" মধ্যেই উপ্ত, বিপুল দুরভিসারের মধ্যে নয়—সর্ব্বত্যাগী অসীমাশের মধ্যে নয় একথা বল্‌লে জীবনকে একটু ছোট ক'রে দেখা হয়। কিন্তু একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বলা যায় যে, বিভূতিভূষণ একটা গভীর সত্যের পরিচয় পেয়েছেন তাঁর উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে। সে-

উপলব্ধি এই যে, জীবনে তুচ্ছতমের মধ্যেও সেই "মাধ্বী-ধারা" প্রবহমান যার বারতা ঋগ্বেদের ঋষিরা তাঁদের প্রতি ঋকে বহন ক'রে এনেছেন, অবশ্য বলাই বেশি যে, নিতান্ত একঘেয়ে আটপৌরে ঘটনাবলীর মধ্যে এই অন্তঃসলিলা "মাধ্বী-ধারা"র হদিশ পেতে হ'লে চাই বিধাতার কৃপা, বাণীর অঞ্জন, মহেশের তৃতীয় নয়ন। কিন্তু তা ব'লে বলা চলে না যে এ তৃতীয় নয়নে মানুষ যে-স্বপ্নসত্যের স্পর্শ পায় তা কবিকল্পনা, অলীক। "পথের পাঁচালী"-র প্রতি পৃষ্ঠায় মেলে এর পরিচয়। কবির দেখার ভঙ্গী ও আঁকার নৈপুণ্যে প্রতিপদে মনটা ভ'রে ওঠে। আর বিশেষ ক'রে আনন্দ হয় দেখে যে "পথের পাঁচালী"র কবি অনাড়ম্বর সহজ বিকাশের পথ ধ'রে চ'লেছেন—তাঁর আন্তরিকতার মুগ্ধকর আবেদনটিকে মাঝপথে জলাঞ্জলি দেন নি, কুশ্রী মৌলিকতার প্রাপ্য সস্তা অর্ঘ্যে প্রলুব্ধ হ'ন নি। থ্যাকারে তাঁর অপূর্ব্ব উপন্যাস "পেন্‌ডেনিসের" ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি যা জানেন তারই বর্ণনা করেছেন, সত্য কথাই বল্‌তে চেয়েছেন,—অভাবনীয় যোগাযোগের বাহ্বাস্ফোটে পাঁচজনের তাক্ লাগাতে যান নি। "পথের পাঁচালী"র চারণকবিও ঠিক এই কথা কয়টি তাঁর ভূমিকায় গর্ব্ব ক'রে বল্‌তে পারতেন।—তিনি যাকে তাঁর সমগ্র চেতনা দিয়ে দেখেছেন, ভালোবেসেছেন, ও সে ভালোবাসার স্নিগ্ধ অঞ্জনে মেদুররূপে দেখেছেন—নিত্য-নতুন ঢঙে, নিত্য-নতুন রঙে, নিত্য-নতুন আবেশবিহ্বলতায়—তার বেদিকামূলেই তিনি বার বার তাঁর প্রাণের নৈবেদ্য বিছিয়েছেন, সুন্দরকেই দিয়েছেন বরণমালা, দরদকেই ক'রে চ'লেছেন তাঁর পাথেয়। উষার তারকাঞ্চিত আকাশ, নদীর উচ্ছল উল্লোল, উষার স্মিত শিশিরস্নিগ্ধ হাসি, অস্তগোধূলির ম্লান বিদায়-মৌন চাহনি—এই সবেকেই তিনি ডাক দিয়েছেন তাঁর আরতিপাত্রের অর্ঘ্যরূপে, তাঁর ধূপাধারের ধূপরূপে, তাঁর মানসী-প্রতিমার উপচাররূপে। গ্লানির মাদকতা, ক্লেদের উত্তেজনা, আবর্জ্জনার প্রলোভন তাঁকে দলে টান্‌তে পারে নি। সে-বাস্তবতাকে তিনি প্রশ্রয় দিন নি যে-বাস্তবতা "subjects man's life and psychology to the scalpel and the microscope, exaggerates all that strikes the outward view of him, his littlenesses, imperfections, uglinesses, morbidities and comes easily to regard these things as the whole or greater part of him and to treate life as if it were a psychological and physiological disease, a fungoid growth upon material nature।"* বিভূতিভূষণ মানুষের

*The Future Poetry.

ক্ষুদ্রতাকে কোথাও ভোলেন নি, নানা ছন্দে তারই ধুয়ায় ফিরে এসে কর্কশ বাস্তবতার জয়গান করেন নি। তিনি জানেন যে, এ-ধরণের বিজ্ঞম্মন্য দার্শনিকতা "falsifies the true measure of the ideal, which is a part of the totality of human life and nature, by bringing the idealism in man down to the level of his normal daily littlenesses"।* "পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত"-তে অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, আকাশকুসুম স্বপ্নভঙ্গ, ভাঙা-গড়া, কল্পনা-কুহক দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনে হয় যে লেখক জানেন—"the truth of the ideal consists essentially in its aspiration beyond the limitations of its immediate actuality, in what our strain towards self-exceeding figures, and not in the moment's failure to accomplish।* মনে হয় ভাগ্‌নারের বাণী: "আর্টে আমরা সেই স্বপ্নই খুঁজি—যা জীবনে পদে পদে ভঙ্গ হয়—ব্যর্থ হয় —লুণ্ঠিত হয়।" † মনে হয় কবির অপরাজেয় আত্মসম্মান যেন গেয়ে চলেছে—

Thoughts hardly to be packed
Into a narrow act,
Fancies that broke through language and escaped,
All I could never be,
All men ignored in me,
This was I worth to God whose wheel the pitcher shaped.

বইখানি পড়তে পড়তে আর-একটা কথা স্বতঃই মনে হয়। সেটা এই যে, ওরিজিন্যালিটির ভূত যাদের ঘাড়ে না চাপে তারাই সত্য ওরিজিন্যাল হ'তে জানে—ওরিজিন্যাল হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা যার সে হ'য়ে উঠতে পারে কেবল—উৎকট। মনে হয়, ওরিজিন্যালিটি-বস্তুটি মিষ্টি হাসির মতন; —আপনা থেকে ফুটে উঠ্‌লে তবেই সে প্রাণ কাড়ে, চেষ্টা ক'রে যারা মিষ্টি হাসে তাদেরই বলে ককেট্।

প্রমাণ—শিশুর চোখে জগতকে দেখার এ-ধরণের বই বাংলাভাষায় কখনো পড়া যায় নি। এক রোলাঁর জন ক্রিশ্‌টফারে অনেকটা এই ধরণের রস পাওয়া যায়। দৃশ্যের 'পর দৃশ্য প্রবর্দ্ধমান বালকের সাম্‌নে দিয়ে অভিনীত হ'য়ে যাচ্ছে আর তাকে পথচলায় একটু একটু ক'রে এগিয়ে দিচ্ছে। কবি নিজে পিছনেই র'য়েছেন, জগৎকে শিশুর চোখে দেখেই তিনি ক্ষান্ত। টেক্‌নিকটি অবশ্য নতুন নয়—কিন্তু যেভাবে তিনি বালক অপু ও বালিকা দুর্গার চোখ দিয়ে গ্রামকে দেখেছেন তার প্রতি তুলিপাতে

*The Future Poetry. †Musiciens d'Autrefois—Rolland. ‡Browning.

তাঁর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দেবার লোভ সংবরণ করতেই হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলাই ভালো, ফুল ছিঁড়ে বাগানের সৌন্দর্য্য দেখাতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তবু দু'একটি দৃষ্টান্ত না দিয়েই পারছি না।

"এক একবার ঝিরঝিরে হাওয়ায় কত কি লতাপাতার তিক্তমধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে; ঠিক্ দুপুর বেলা, অনেক দূরের কোনো বড় গাছের মাথার উপর হইতে গাঙ্‌চিল টানিয়া টানিয়া ডাকে, যেন এই ছোট্ট গ্রামখানির অতীত ও বর্ত্তমান সকল ছোটো খাটো দুঃখসুখ শান্তিদ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে শরৎমধ্যাহ্নের রৌদ্রভরা নীলনির্জ্জন আকাশ-পথে এক উদাস গৃহবিরাগী পথিকদেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছে।"

আর একটি ছবি ঃ

"উত্তর মাঠের কলা-বেগুনের ক্ষেত হইতে কৃষাণেরা ফিরিয়া আসে, কেউ থাকে না কোনো দিকে—সোনাডাঙা মাঠের পারের অনাবিষ্কৃত বসতিশূন্য অজানা দেশে চন্দ্রহীন রাত্রির ঘন অন্ধকার ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে, তখন হাজার হাজার বছরের পুরাতন মানব-বেদনা কখনো বা দরিদ্র পিতার প্রবঞ্চনামুগ্ধ অবোধ বালকের উল্লাসে, কখনো বা এক ভাগ্যহত, নিঃসঙ্গ, অসহায় রাজপুত্রের ছবিতে তাহার প্রবর্দ্ধমান উৎসুক মনের সহানুভূতিতে জাগ্রত সার্থক হয়। ঐ অজ্ঞাতনামা লেখকের বইখানা পড়িতে পড়িতে কতদিন যে তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিয়াছে!

"তাহার পরে সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হয়, ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের আঁচলাগা শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু ভরিয়া যায়। মধ্য রাত্রে বেণুবন-শীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না উঠিয়া শিশিরসিক্ত গাছপালায় ডালে-পাতায় চিক্ চিক্ করে। আলো আঁধারের অপরূপ মায়ায় বনপ্রান্তে ঘুমন্ত পরীর দেশের মত রহস্যভরা। শন্ শন্ করিয়া হঠাৎ হয়ত এক ঝলক হাওয়া সোঁদালির ডাল দুলাইয়া তেলাকুচো ঝোপের মাথা কাঁপাইয়া চলিয়া যায়।"

আশ্চর্য্য এই যে, লেখক এ-রকম সরল দীপ্ত ভাষার জের টেনে চলেছেন বইখানির গোড়া থেকে শেষ অবধি। কৃতী লেখকমাত্রেরই লেখার মাঝে মাঝে দীপ্তি ফুটে ওঠে—কিন্তু সে-দীপ্তির ঔজ্জ্বল্য এ-রকম সমান তালে বজায় রেখে চলা সম্ভব কেবল সত্য শিল্পীর পক্ষে। আমি উদ্ধৃতাংশ ক'টি বেছে নিয়েছি খেয়ালমত বইটির যে-কোনো পাতা উল্‌টে—খুঁজে পেতে না। উপন্যাসটির আদ্যোপান্ত এই শ্রেণীর মনোজ্ঞ বর্ণনা "সূত্রে মণিগণা ইব" গাঁথা। কখনও সে-মণিমালা মৃদুহাস্যে মধুর, কখনও অশ্রুতে সজল, কখনও প্রশান্তিতে স্তব্ধ, কখনো উদাস দীর্ঘশ্বাসে নিবিড়। বীণাপাণির বীণার অনাবিল সুর যেন লেখকের হৃদয়ের তারে তারে অধীর আগ্রহে ঘা দিয়েছে—এম্‌নিই সরল, এম্‌নিই প্রশান্ত, এম্‌নি স্বতঃস্ফূর্ত তাঁর নিসর্গচিত্র! ("অপরাজিতে" মধ্যভারতের বন্যশোভা চিত্রণে লেখকের

এ-নিসর্গচিত্র আরও উদাত্ত আরও অপরূপ হ'য়ে ফুটে উঠেছে। কী গম্ভীর দৃষ্টি সে! কী স্বপ্নময়! অথচ কী বাস্তব! প্রতি কাঁকরটি অবধি ফুটে উঠেছে—কবি তাকে সমগ্র চেতনা দিয়ে দেখ্‌তে পেরেছেন ব'লে।)

আর আশ্চর্য্য এই যে, এ-ধরণের গ্রাম্য বর্ণনা বইখানির মধ্যে অজস্র সম্ভারে ঢেলে দেওয়া সত্ত্বেও কোথাও একঘেয়ে মনে হয় না। কোথাও মনে হয় না লেখক বর্ণনার জন্যেই বর্ণনা করতে চেয়েছেন। মনে হয় তাঁর স্বপ্নাবিষ্ট চোখের সামনে যেন বাণীর ছায়া-অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ছবির পর ছবি ভেসে উঠ্‌ছে আর তিনি স্রষ্টার তুলি দিয়ে সেগুলিকে একের পর এক ফুটিয়ে তুলেছেন। আর কী অজস্র ছবি! কী অফুরন্ত সম্ভার!

Art conceals art কথাটি যে কত সত্য তা 'পথের পাঁচালী'র ছত্রে ছত্রে দীপ্ত হ'য়ে প্রমাণ হয়েছে যেন। শুধু একবার ক'রে অঙ্কনীয় বিষয়টির দিকে তাকানোর অপেক্ষা। তারপর দুটো আঁচড়—তিনটে ফুট্‌কি—একটু chiaroscuro অম্‌নি সমগ্র ছবিটা ফুটে ওঠে। মনে বিস্ময় লাগে! প্রশ্ন জাগে—দুটো রেখায়, একটুখানি আলোছায়ায়, কয়েকটি বিন্দুতে একটা পূর্ণ ছবিকে এমন ভাবে মূর্ত্ত করে শিল্পী কোন্ যাদুতে!··· আর শুধু কি ছবি! শুধু কি মানুষটা। তার হাস্‌বার বিচিত্র ভঙ্গীটুকু, তার ঠোঁটের আব্‌ছা কুঞ্চনটুকু, তার ললাটের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বলিরেখাটি—সমস্তই কি এমন ভাবে ধরা প'ড়ে যায়! যে অতি-পরিচিতকে সাদাচোখে নিত্যই দেখেছি অথচ কখনো ভুলেও তিলার্দ্ধ অসাধারণ ঠেকে নি, দুটি আখরেই কি সে হ'য়ে ওঠে গন্ধর্ব্বকুমারের চেয়েও চিত্তাকর্ষী, অচিন্তনীয়তম যোগাযোগের চেয়েও চিত্তহরা! সাধে কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতন গুণী 'পথের পাঁচালী'র "উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি" ক'রেছেন!

দুর্গা ও অপুর যা যা ভাল লাগে যা নিয়ে তাদের সমস্ত জীবন—গ্রাম্য বনস্থলীর সে-ছবিটি ত সকলেই চল্‌তে ফির্‌তে দেখেছেন। কিন্তু এমন ক'রে দেখেছেন কয়জন? গুহার মধ্যে দিনের আলোয় ছায়ান্ধকার কার না চোখে প'ড়েছে? কিন্তু তার মধ্যে হিমালয়ের আশ্রয়দান-গৌরব কল্পনা করতে পারে কে? বল্‌তে পারে—

দিবাকরা দ্রক্ষতি যো গুহাসু লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারম্।
ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে মমত্বমুচ্চৈঃ শিরসাংসতীব ?*

মেঘ কে না দেখে প্রতিদিন? কিন্তু তার নীলাভায় নীলাঞ্জন পর্‌তে পারে ক'জন? বল্‌তে পারে—

"নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে নয়নে লেগেছে।"

* গুহালীন ভীত আঁধারে দিবায় দিবাকর হ'তে বাঁচান নিতি,
আশ্রিত সৎ-অসতে সমান মমতা—মহদাশয়েরি রীতি। (কুমারসম্ভব)

বুলবুলের গান কে না শুনে? কিন্তু তার স্বরলহরীতে কার নয়নে ঢেউ তোলে :—

> Charm'd magic casements, opening on the foam
> Of perilous seas, in faery lands forlorn? †

প্রকৃতির তুচ্ছতম দৃশ্যের মধ্যেও ছবি দেখার, গান শোনার, মধুস্বাদের এ-পরিচয় "পথের পাঁচালী"র ছত্রে ছত্রে মেলে।

ধর—"চারিধারে বনঝোপ, ওদিকে তেলাকুচা লতার ঝুলুনি, বেলগাছের তলে জঙ্গলে সেওড়া গাছে ফুলের ঝাড়, আধ পোড়া কটা দূর্ব্বাঘাসের উপর খঞ্জন পাখীটা নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নির্জ্জন······নিরালা স্থানটি। প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে ঝোপে নতুন কচি পাতা। ঘেঁটুফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটাটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে ······(শিশু ছুটির) বড় ভাল লাগে।"

শুধু কি এই ছুটি শিশুরই ভাল লাগে? সে "স্নিগ্ধ হাওয়া" সে "হাল্‌কা আনন্দভরা দিনগুলি"-তে আকস্মিক খুসির বার্ত্তা কি শুধু এই গ্রামশিশু ছুটিরই মনে পৌছিয়ে দেয়? পাঠকও কি তাদের এ সহজ অনাবিল আনন্দ-ঐশ্বর্য্যের সরিক না হ'য়ে পারেন? পাঠক যখন শোনেন যে বালিকা "তুর্গা আজকাল যেন এই গাছপালা, পথঘাট, এই অতি-পরিচিত গ্রামের অন্ধিসন্ধিকে অত্যন্ত বেশি করিয়া আঁক্‌ড়াইয়া ধরিতেছে;" যখন শোনেন "আসন্ন বিরহের কোন্ বিষাদে এই কত প্রিয় গাবতলার পথটি, ওই তাদের বাড়ীর পিছনের বাঁশবন, ছায়াভরা নদীর ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে;" যখন শোনেন তুর্গার ছোট্ট ভাইটি "অপূ—তাহার সোনার খোকা ভাইটি—যাহাকে একবেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন হু-হু করে—তাহাকে ফেলিয়া সে কতদূরে চলিয়া যাইবে!"—তখন তাঁর মনটাও কি হু-হু ক'রে ওঠে না? তুর্গা কোথায়—কোন্ দেশে যাবে কল্পনা ক'রে? এই সামান্য গ্রাম্য বালিকার "আসন্ন বিরহের বিষাদে" তাঁর নিজের চোখতুটিও কি অশ্রু-আভাসে সজল দেয় না? "ছায়াভরা নদীর ঘাটটিকে···পরিচিত গ্রামটির অন্ধিসন্ধিকে" কি তিনিও এই বন্য হরিণীর মতন আঁকড়ে ধরেন না? ইচ্ছা জাগে না তার কাছে গিয়ে তাকে শুধাতে—কার জন্যে তার ছোট্ট বুকে এত বেদনা, এত মধু, কার তরে তার এই অতৃপ্ত স্নেহতৃষ্ণা? হৃদয়ের তারে তার জন্যে এই সান্ত্বনাটি কি বেজে ওঠে না: "ওগো ছোট্ট মেয়েটি, এ জীবনের ভিড়ে নাম-না-জানা ভয়েও ত তুমি একলা নও। আমরা যে এ পান্থশালায় প্রত্যেকেই তোমার সুখে সুখী, খেলার সাথী, ব্যথার ব্যথী। মনে কি নেই তোমার যে তোমাদের বেগুনপোড়া ও অর্দ্ধপক্ব অন্নের চড়ুই ভাতিতে আমরাও তোমার সঙ্গে নিত্যই পাত পাতি? জান না

† Ode to a Nightingale—Keats.

কি যে তোমার টোক্‌লা মাথায় বাঁশবন ঝোপঝাড় কুলগাছ আমের গুটির অভিসারে আমরাও তোমার নিত্য-সঙ্গী, নিত্য-অভিসারী? তোমার গাব পাড়া, নোনা আনা, বেগুনবীচি জড় করা, নিত্য "মিষ্টি যেন গুড়" কামরাঙা পাকার খবর রাখা, সেজদির বাগান থেকে নিষ্ঠুরভাবে বিতাড়িত হ'য়ে অপূকে ভরসা দিয়ে অন্যত্র ঝোড়ো আম কুড়ুতে চলা, লোভে প'ড়ে সোনার সিঁদুরকৌটো চুরি ক'রে দেয়ালে মাথাঠুকুনি খেয়ে রক্তপাত হওয়া, সহুরে যুবক নরেনের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পূজোর সময় নিরালায় বালিকা-হৃদয়ে তাকেই কামনা করা, বর্ষায় জলভরা ঘরে সিক্ত বিছানায় শুয়ে জ্বরের ঘোরের মধ্যেও রেলগাড়ীর স্বপ্ন দেখা,—শেষটায় কুঁড়িতেই ঝ'রে যাওয়া—ওসবেই যে আমরাও তোমার চিরসাথী! কে বলে তুমি এক্‌লা? কে বলে—তুমি অকালে ঝ'রে গেছ? তুমি যে সমাপ্তিহীন ঝঙ্কারে অণুক্ষণ বাজো আমাদের স্মৃতিবীণার তারে। বিশ্বের যেখানেই দরদীর ছোট্ট দরদটুকু ধুক্ ধুক্ করে, যেখানেই স্নেহের ছোট্ট উত্তাপটুকু স্পন্দিত হয়, যেখানেই শান্তির ছোট্ট পিদিমখানি নিরালা আশ্রয়ের মধ্যে স্নিগ্ধ আলো বিছিয়ে দেয়, সেখানে যে সব মানুষেরই প্রবেশ অধিকার। সেখানে যে আমরা সবাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। যা কিছু ফোটে, চিরদিনের জন্যেই ফোটে না কি? গন্ধ বর্ণ রেশ তরঙ্গ মিলিয়ে যায়—কিন্তু লোপ পায় কে বলে? লক্ষ যোজন দূরের তারার একটি সূক্ষ্ম রশ্মিও পথহারা হয় না—বৃত্তাকারে ফিরে আসে। শুধু যে-চেতনায় সব আলো অনুস্যূত, সব গান গাঁথা, সব ছবি আঁকা, সব স্বপ্ন বোনা সেই চেতনাই মর—সান্ত? কবি জানেন যে এ হ'তে পারে না। মনস্বী সুকবি মোহিতলাল সেদিন আমাকে একটি চিঠিতে যথার্থই লিখেছেন যে—"বিভূতিভূষণের কল্পনার মূলে আছে সৃষ্টির প্রাণলীলার অসীম রহস্যে আত্মহারা শিশু-মানবের সুস্থ অনুভূতি,—দারিদ্র্য শোক-তাপ এমন কি মৃত্যুবিভীষিকাও যে জীবনানন্দকে দমন করতে পারে না—সেই 'অপরাজিত' হৃদয়ের তুর্দ্দমনীয় বস্তুর সচেতনা; অসীম কৌতূহল, যাপ্য রূপপিপাসা। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর যেন শক্তিপরীক্ষা চ'লেছে—বন্ধনের সঙ্গে মুক্তির, তুঃখের সঙ্গে আনন্দের। একটি আত্মনির্লিপ্ত বা আত্মহারা রসচৈতন্য নিয়তির ওপরেও জয়ী হচ্ছে। সর্ব্বস্ব হারিয়েও চিত্ত-গহনের কোনখান থেকে নিরন্তর সান্ত্বনা কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না।"*

এই সূত্রে "পথের পাঁচালী"র কবি ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিহৃদয়ের আর-একটি নিবিড়তম অনুরাগ—তাঁর গ্রামপ্রীতি।

* লেখককে লেখা একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃত।

গ্রামের জীবনকে কবি হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছেন। গ্রামের আনাচে কানাচে তাঁর পরিচিত! আর কী নিবিড় সে পরিচয়! গাছপালা, লতাপাতা, ফলফুল, ঝোপঝাপ, তৃণশষ্প প্রতিটির সূক্ষ্মতম আকৃতিটিও তাঁর চেনা। তাদের মৃদুতম হাসিটিও তাঁর রক্তে দোলা দেয়। তাদের প্রতি কটাক্ষ, প্রতি ইঙ্গিত, প্রতি গ্রীবাভঙ্গীতে তিনি সাড়া দিতে জানেন। এক প্রেমিকই প্রেমাস্পদকে এভাবে "হাজাররূপে দেখে বারে বারে।" তাই গ্রাম্যলক্ষ্মী তাঁর দয়িতা, ঋতুচক্রে বনশ্রীর চিরপুরাতন উৎসব তাঁর চোখে চিরনূতন; তাই এ জৈবলীলার সাঙ্গহীন আলোছায়া তাঁর প্রাণতটে চির-কল্লোলময়ী; তাই একই দৈনন্দিন একটানা জীবন তাঁর কানে কানে কথা কয়—নিতুই নব আগমনী শুনিয়ে। অতি তুচ্ছ তৃণাঙ্কিত মাঠও তাঁর কাছে নগণ্য নয়, অতি সামান্য ঘটনাও তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর নয়, অতি একঘেয়ে ব্যাপারও তাঁর কাছে সাদামাটা নয়। জীবনের প্রতি বর্ণের সূক্ষ্মতম তন্তুও তাঁর কাছে অনন্ত রহস্যময়—দুর্ভেদ্য। জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই কবি গেয়ে ওঠেন "বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।" এ সম্ভব হ'য়েছে শুধু এই জন্যে যে, দ্রষ্টার তৃতীয় নয়ন বিভূতিভূষণের সহজাত। তাই তীব্র বেদনার মধ্যেও তাঁর অনুভূতি কখনো মুহূর্ত্তের জন্যেও ঝাপ্‌সা হ'য়ে যায়নি—গভীর শোকের মধ্যেও তিনি কখনো উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি করেন নি—নিবিড় নিরাশার মধ্যেও বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদুনি গান নি। কারণ তিনি যে কবি—ভুল্‌বেন কেমন ক'রে যে কবির বাণী সস্তা হাহুতাশ নয়। কেঁদে করুণা জাগাতে চায় সেই যার অন্য সম্বল নেই। যার হাতের তার নেই সেই বেশি মশ্‌লার কাঙাল।

সত্য সংযমে অদ্বিতীয় শরৎচন্দ্রের পরে এ-শ্রেণীর লিপি-সংযম, এ-শ্রেণীর ওজনজ্ঞান বড় একটা চোখে পড়ে না। যা সাময়িক তাকে বিভূতিভূষণ কোথাও উচ্ছ্বাসের কুয়াশা দিয়ে চিরন্তন দাঁড় করাতে ছোটেন নি, যা অবশ্যম্ভাবী তার দিকে কখনো বিজ্ঞ সিনিসিজিম্‌-এর সস্তা বাণ নিক্ষেপ করেন নি, যা রুদ্র তাকে নিয়ে থেকে থেকে বুক চাপ্‌ড়ে হাহাকার করেন নি। তাঁর সমস্ত কারুণ্য, অনুকম্পা, ব্যথা, দরদ তিনি মূর্ত্ত ক'রে তুলেছেন, ছোট ছোট পেলব রেখাপাতে। তিনি ছবি এঁকে গেছেন, সুর বুনে গেছেন, গান গেয়ে গেছেন। আর যেটা সব চেয়ে স্পর্শ করে সেটা এই যে, এ গান আসক্তির গান নয়—অনাসক্তির গান; ঘরের গান নয়—পথের গান; অচলায়তনের গান নয়—চলার গান। জীবন যে চলচঞ্চল, গতি-উচ্ছল, আনন্দ-বেদনা-হাসি-অশ্রু-ছলছল, মায়ারসে অভিষিক্ত সেই রসই কবির পথের একমাত্র পাথেয়। সেই ছন্দেই কবির গীতিকাব্য আদ্যন্ত গ্রথিত। তাই দার্শনিক তত্ত্ব-উদ্‌ঘাটনে অনেক স্থলে কবির লিপিদৌর্ব্বল্য প্রকাশ

পেলেও—(এইখানেই তাঁর একমাত্র গুরুতর দৌর্ব্বল্য)—রস-পরিবেষণের সময় তাঁর কবিদৃষ্টি কখনো ব্যাহত হয় নি। আর মুগ্ধ করে তাঁর অনুপম আন্তরিকতা। তিনি যা বুকের দরদ দিয়ে দেখেছেন তাই এঁকেছেন, কোথাও বিজ্ঞম্মন্যতার ধূপমোহে শূন্যবাদে পথহারা হ'ন নি। এক কথায়, তাঁর রচনাটি হ'য়ে উঠেছে একটি সৃষ্টি—গদ্যকাব্য, ছন্দে, রূপে, রসে, কারুণ্যে, মৃদুহাস্যে, সংযত অশ্রুতে—বিচিত্র সমগ্রতায়।

বলেছি, বইটি আদ্যন্ত লেখা—শিশুর দৃষ্টিতে। প্রথমে বালিকা দুর্গা ও পরে তার প্রিয়দর্শন ছোট্ট ভাই অপুর চোখ দিয়ে সংসারটাকে দেখা। এদিক্ দিয়ে—অর্থাৎ শিশু-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক্ দিয়ে ঠিক্ ওরিজিন্যালিটি যাকে বলে তার হয়ত তিনি দাবী করতে পারেন না। রোলাঁর বালক ক্রিস্টফারের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ হয়ত বেশি ওরিজিন্যাল, নিপুণ ও সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে মাতার ও শিশুর মন সম্বন্ধে হয়ত বেশি গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এমন কি প্রকৃতি-চিত্রণেও বিভূতিভূষণ আমাদের সাহিত্যে অতুলনীয় নন্। রবীন্দ্রনাথের "ছিন্ন পত্রের" নানা বর্ণনা সূক্ষ্মতায়, দার্শনিকতায়, উপমায়, কারুকার্য্যে ও চিন্তার প্রসারে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-চিত্রণের চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তে অন্ধকার, নদী, ঝড়, নৌকাচিত্র, শ্মশানের গল্প প্রভৃতি নানা বর্ণনা, তাঁর অপূর্ব্ব বর্ণনভঙ্গী, সংযম ও সংহত গাম্ভীর্য্যের পটভূমিকার পরে 'পথের পাঁচালী'র প্রকৃতি-বর্ণনার চেয়ে গরীয়ান্ হ'য়ে ফুটেছে। কিন্তু যেখানে বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বা অন্য কারুর চেয়েই ছোট না সেটা হচ্ছে গ্রাম্যজীবনের প্রতি তাঁর দরদ। রবীন্দ্রনাথ গ্রামকে প্রকৃতিকে ভালবেসেছেন—কিন্তু তার মূলে আছে তাঁর বিপুল কবিকল্পনা। দিগন্তপ্রসারী তাঁর কবিদৃষ্টি। রবি শশী তারা, মেঘ জল মাটি, ফল ফুল লতা, নদী চর বন—সবই তাঁকে বিশ্বোৎসবের বিরাটত্বের দিকেই বিশেষ ক'রে চোখ মেল্‌তে শিখিয়েছে। শরৎচন্দ্রও গ্রামকে প্রকৃতিকে ভালবেসেছেন—কিন্তু তার মূলে আছে তাঁর অতল বেদনা। গ্রাম্যজীবনের সমস্ত বিষ পান ক'রে নীলকণ্ঠ তিনি। তাই গ্রামের বনশ্রী তাঁর চোখকে মুগ্ধ করলেও হৃদয়কে বন্দী করতে পারে নি। গ্রামকে বড় করতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু গ্রামের প্রকৃতিকে নয়, সমাজকে। সেইজন্য গ্রামের সঙ্কীর্ণতা, ব্যাধি, ঈর্ষা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা, অন্ধতা, তামসিকতা—এসবে তাঁর অশ্রুও ঝরেছে, প্রেমও দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু বিভূতিভূষণের গ্রামপ্রীতির প্রকৃতি অন্যরূপ। তিনি সব জড়িয়ে গ্রামকে ভালবেসেছেন। গ্রামের জীবনকে উদার-পরিসর করবার জন্যে তিনি ব্যস্ত নন্। গ্রামের ইদানীন্তন ছোট্ট এইটুকুখানি দিক্-চক্রবালেই তিনি আত্মহারা। গ্রাম্যশ্রীর স্নিগ্ধতা তার সব অভাবের ক্ষতিপূরণ ক'রেছে তাঁর চোখে। একথা বলার

উদ্দেশ্য নয় যে, প্রকৃতির বিরাটরূপে তিনি সাড়া দেন না, শুধু পেলব রূপেই দেন। 'অপরাধী'তে নিবিড় বনের গাম্ভীর্য্য বর্ণনায় বা 'পথের পাঁচালী'তে দু-একস্থলে ঝড়বৃষ্টিপ্লাবনের বর্ণনায় তাঁর চিত্রীর তুলি সর্ব্বাংশেই জয়শ্রী-মণ্ডিত হ'য়েছে। গ্রামের অপূর্ণতার সম্বন্ধেও যে তিনি সচেতন নন্ তাও বলি না। তাঁর নানা ছোটখাট চিত্রে গ্রামবাসীদের দৈন্য, ঈর্ষা, নিষ্ঠুরতা ও সঙ্কীর্ণতার একটু-আধটু ভাসা-ভাসা পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতির বিরাটরূপে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতন ডুবে যেতে চান্ না—গ্রামের তামসিকতায় তিনি শরৎচন্দ্রের মতন অসহ বেদনা অনুভব করেন না। তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র এ দুইয়ের একটাও নয়। তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র হচ্ছে :—"অপূ মাটি দেখিতে না পাইলে থাকিতে পারে না।" এইখানেই তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর গ্রামপ্রীতি ঠিক্ গ্রাম্যজীবনের প্রীতি নয়, তাঁর প্রকৃতিপূজা ঠিক্ প্রকৃতির চির-রম্যোৎসবের ঐকান্তিক পূজা নয়—তাঁর ভালবাসা এই "মাটির" ভালবাসা। মাটির ওপরে জন্মায় যে "সাঁইবাব্‌লা, গাবগাছ, টোপাকুল, আশ্‌সেওড়া, জগ্‌ডুমুর, ঠেঁচিপোপ, বাঁশবন, সোঁদালিফুল," তাদেরই তিনি একজন। তাই সহরের ধূলোকাদায় অপূ নিজেকে খুঁজে পায় না, পায় ঐ "কাঁচামাটির গৃহত্যাগী উদাস বাউলের মত চওড়া পথটার" ডাকে; সহরের নানা উৎসব সভায় স্থায়ী আসন পাত্‌তে সক্ষম হয় না, মনটা তৃষিত থাকে—তার ঐ "চিরকালের রহস্যভরা সোনাডাঙার মাঠের" ধূসর নিমন্ত্রণের জন্যে। আর এসব তার কাছে দূর থেকে উপভোগ কর্‌বার বস্তুও নয়,—আঁক্‌ড়ে ধ'রে থাক্‌বার বস্তু! 'এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি' এই যে অপূর অন্তরের অন্তরতম কামনা। তাই সে নিত্য স্বপ্ন দেখে: "বেলাশেষের স্বপ্নপটে শৈশব-কল্পনার আসা-যাওয়া"-র। তাই সে মানসনেত্রে নিত্য চারণ করে সেই "আষাঢের হাটে" যেখানে হাটুরেরা রোজ "কলরব করিতে করিতে ওপার হইতে খেয়ানৌকায় এপারে আসিতেছে। ছোট বাজার, সারি সারি ঝাঁপতোলা দোকান, খেজুর গুড়ের আড়তের সাম্‌নে বহু গরুর গাড়ীর ভিড়...দু'ধারে নীলকুঠির সাহেবদের আমলে রোপিত বট, অশ্বত্থ, তুঁতগাছ···সারাপথটা প্রাচীন বটের সারি ঝুরি দোলানে রক্তাভ জ্যোৎস্না-লাগা স্বচ্ছ কচিপাতার রাশি।" তাই সে শুন্‌তে পায়: "সেকরার দোকানের ঠুক্‌ঠাক্", "শঙ্খচিলের টানিয়া টানিয়া ডাকা", "পথিপার্শ্বের বট অশ্বত্থের ডালের মধ্যে কোকিলের ডাকিয়া-ডাকিয়া-সারা-হওয়া।" গন্ধ পায়: "সোঁদা সোঁদা ভিজে মাটির", "নত-পল্লব নাগকেশরের অজস্র ফুলের", "বনফুলের গন্ধভরা জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ দক্ষিণ হাওয়ার।" আর মনে পড়ে: "এক ঘন বর্ষার রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরানো কোঠার অন্ধকার ঘরে রোগশয্যাগ্রস্ত এক গ্রাম্য বালিকার কথা—'অপূ,

সেরে উঠ্‌লে আমায় একদিন রেলগাড়ী দেখাবি?'" কিন্তু হায় রে, এ গরীব ঘরের মেয়েটি—তার শৈশবের সাথী, স্নেহময়ী খেলার সঙ্গিনী ছোট্ট দিদিটি মুকুলেই ঝ'রে যায়—সেরে ওঠে না,—তাকে রেলগাড়ী দেখানো বাকি থেকে যায়। অপূর বুকটা কেমন ক'রে ওঠে! সে সহরের পাকাবাড়ীর একতলায় আস্তাবলের কাছের একটা ঘরে শুয়ে স্বপ্ন দেখে তার দিদির, তাদের নদীর, তাদের সোনাডাঙার মাঠের, তাদের বিশালাক্ষীর মন্দিরের—ওই "আস্তাবলের মাথায় যে আকাশটা, ওরই ওপারে পূবদিকে বহুদূরে তাদের নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের।" এই গ্রামের স্বপ্নই কবি এঁকেছেন তাঁর হৃদয়ের কবোষ্ণ রক্তের শেষ বিন্দুটি দিয়ে। নইলে কি সমস্ত গ্রামটাই থেকে থেকে অপূর স্বপ্নচোখের মধ্যে দিয়ে এমন প্রাণকাড়া ডাক ডাক্‌তে পার্‌ত? ডাকে কেন?···তা কি বল্‌তে হবে?

"এতদিনে যে সেখানে তাহাদের ইছামতীতে বর্ষার ঢল নামিয়াছে। ঘাটের পথে শিমুলতলায় যে জল উঠিয়াছে। ঝোপে-ঝাপে যে নাটাকাঁটার ফুল ধরিয়াছে। বন-অপরাজিতার নীল ফুলে বনের মাথা যে ছাওয়া।"

আর না গেলে কি চলে? বনলক্ষ্মীর বাঁশি যে বাজে!···

"কতদিন যে সে নিশ্চিন্দিপুর দেখে নাই!—তিন—বৎসর! কতকাল!

"সে জানে নিশ্চিন্দিপুর তাহাকে দিনে রাতে সব সময়ে ডাকে, শাঁখারী পুকুর ডাক দেয়, বাঁশবনটা ডাক দেয়, সোনাডাঙার মাঠ ডাক দেয়, কদমতলার সায়েরের ঘাট ডাক দেয়, দেবী বিশালাক্ষী ডাক দেন।"

শুধু কি তাই!···

"পোড়া ভিটার মিষ্ট লেবুফুলের গন্ধে সজ্‌নেতলার ছায়ায় ছায়ায় আবার কবে গতিবিধি? আবার কবে তাহাদের বাড়ীর পিছনে শিরীশ সোঁদালি বনে পাখীর ডাক? মাঠের মধ্যে রাঙা আগুনের ফেনার মত সূর্য্য অস্ত যাওয়া? ঠাকুরঝি পুকুরের সেই বটগাছটা যেখানে ঝাঁকড়া চুল দস্যুর মত দিগন্তের মধ্যে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে—সেখানে?"

কবে সে সেখানে ফিরে যাবে? সহরের ক্লেদ, মালিন্য, সিমেন্ট, ইট, চুন, সুরকি, ঘর্ঘর, গোলমাল, ব্যস্ততা—এসব থেকে কবে সে ফিরে যাবে ঐ বনশ্রীর স্নিগ্ধ অঙ্গনে! যাবে কি? যদি না যায়? যদি সহরের দাবী তাকে পল্লীজননীর কোলছাড়া করে?···উঃ, সে কথা কি ভাবা যায়? তা'হলে যে

"তাহাদের সে-ভিটায় সন্ধ্যার অন্ধকার হইয়া যাইবে, কিন্তু সে-সন্ধ্যায় কেহ সাঁজ জ্বালিবে না, প্রদীপ দেখাইবে না, রূপকথা বলিবে না।···জনহীন ভিটার উঠানভরা কালমেঘের জঙ্গলে—দিদির সেই কাঁচপোকাটা যেখানে উড়িত—সেখানে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিবে, গভীর রাত্রে পিছনের ঘন বনে জগ্‌ডুমুর গাছে লক্ষ্মীপেঁচার রব শোনা যাইবে।···

ক্রমে আরও দিন চলিয়া যাইবে, সারা বাড়ী জঙ্গলে ঢাকিয়া ফেলিবে, কেহ কোনোদিন সেদিক্ মাড়াইবে না, কেহ কোনোদিন পা দিবে না সে-ভিটায়! ওড়কলমী ফুল ফুটিয়া আপনা আপনি ঝরিয়া পড়িবে। কুল নোনা মিথ্যাই পাকিবে, বনের ধারে সেই অপুর বৈকালগুলি মিছামিছি নামিবে, হল্‌দে ডানা তেড়ো পাখীটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে।"

"মায়ের হাতের যত্নে পোঁতা লেবু গাছটা কোথায় কোন্ জঙ্গলে চাপা পড়িয়া যাইবে, কেহ সন্ধানও পাইবে না কোনো দিন।"

"ভাবিতে ভাবিতে তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠে।"

পাঠকেরও কি ওঠে না? লেখকের জ্ঞাতসারে কি-না জানি না—এই সূত্রে তাঁর কথাচিত্রের মধ্যে একটি সমাজ-সমস্যাও ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে। জানি না বইটির পাতার মধ্যে দিয়ে এ-সমস্যাটি তোমার চোখের সাম্‌নেও মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌বে কি-না। কিন্তু শেষের দিক্‌টায় যেখানে অপুর বাবা-মা তাকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে সহরে গেল ও অপুর বাবার মৃত্যুর পর তার মাকে রাঁধুনীবৃত্তি অবলম্বন ক'রে সহরে জীবন যাপন করতে হ'ল সেখানে গ্রাম বনাম সহর সমস্যাটি বড় অপূর্ব্বভাবে আপনা আপনি ফুটে উঠেছে। হয়ত লেখক সমস্যার প্রশ্ন ওঠাতে মোটেই চান নি—কিন্তু তা সত্ত্বেও কবির তুলিকাপাতে বাস্তবের নানা ট্রাজিডি অনেক সময়েই স্বতঃ উৎসারিত হ'য়ে উঠে থাকে, নয় কি! "পথের পাঁচালী"র গান হয়ত পথেরই গান কিন্তু এখানে-সেখানে সমাজচিত্রও তার মধ্যে ফুটে না উঠে পারে নি। সহুরে জীবন যখন পল্লীর রক্ত-সম্বন্ধকে অস্বীকার করতে ছোটে—তখন প্রাকৃত বনশ্রীর স্তুতির যে সে-জীবনকে শান্তিবিধুর ক'রে তোলে, কী পঙ্কিল ক'রে তোলে, কী অনামা ক্ষুধায় বুভুক্ষু ক'রে তোলে, নাগরিক সভ্যতার সে বিয়োগগাথা কবির বাঁশিতে বড় করুণ, বড় সজল, বড় মধুর হ'য়েই ফুটেছে। এ যান্ত্রিকতার যুগে জগতের সব দেশে বনলক্ষ্মীর যে-বিসর্জ্জনী গাওয়া সুরু হ'য়েছে, তার বিদায়-পূরবী যেন কবির প্রতি মিড়টিতে ফুটে উঠতে চাইছে। গ্রামের কান্ত শ্যামলিমা, শান্ত কাকলি, মিষ্ট কুলুধ্বনি, অনবগুণ্ঠ দিগন্তকে ছেড়ে স্বর্ণকিরীটিনী বৈরোচনী সভ্যতার বিবর্দ্ধমান কর্ম্মধূম, শ্রান্তিহীন উৎকণ্ঠা, উচ্চণ্ড সমারোহ ও লেলিহান গৃধ্নুতার বাহুপাশে এসে যে মানুষ তার চিরবাঞ্ছিতকে পাবার পথে এক পা-ও অগ্রসর হয় নি, তার কোজা-গরব্রত বরলাভের পথে এক তিলও এগোয় নি,—শুধু একটা গভীরায়মান ব্যর্থতার মসীকৃষ্ণ ছায়া দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হ'য়ে তার অন্তরের মৃত সঞ্জীবনী রসধারাকে নিঃস্রোত ক'রে তুল্‌ছে, আবিল ক'রে তুল্‌ছে, বিবর্ণ ক'রে তুল্‌ছে,—'পথের পাঁচালী'র ভাটিয়ালির নানা মূর্চ্ছনায়ই নানা সারিগানই এ ইঙ্গিতটি দীর্ঘশ্বাসের ছন্দে এক অপূর্ব্ব মধুর বিষাদরাগিণী সৃষ্টি ক'রেছে।

সে বিষাদগাথার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে গত শতাব্দীর এক ভাবুক দার্শনিকের অনুরূপ দীর্ঘশ্বাস।

"Les progrès de la civilization sont marqués par un recul du bonheur. Plus l'appareil de la vie est compliqué, plus il y a des raisons de malheur. La sensibilite à la douleur devient plus grande, et la refléxion croissante perce plus facilement les illusions. La civilization laisse grandir plus vite les besoins que les moyens de les satisfaire."*

আর সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে এই প্রশ্নটি ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়ায়, কোথায় পথ? গ্রাম্যজীবনের বিসর্জ্জনী কি এখন মানুষকে গাইতেই হবে? বরণ ক'রে নিতেই হবে এই অর্থহীন ইঁটকাঠের বোঝা, ঠোকাঠুকির চক্‌মকি, উত্তেজনার হর্‌রা, কর্ম্মযজ্ঞের ধূম? লীলার চরম সার্থকতা নিহিত কি এই শ্রীহীন বৈচিত্র্যে,—অর্থহীন জটিলতায়? মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে নাড়ীর টান, হৃদয়ের রসের সঙ্গে নীরবতার যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, মনের কুঞ্জে ফুল ফোটানোর সঙ্গে শিশিরবর্ষী অবসরস্নিগ্ধ সমাহিত জীবনের যে অপরিহার্য্য যোগসূত্র—সে-সবকে কি নির্দ্দয় হ'য়ে ছিন্ন না করলেই চল্‌বে না? এই-ই কি এখনকার নিষ্করুণ যুগধর্ম্ম? শান্তির সঙ্গে গতির কি কোনো সন্ধি, কোনো সামঞ্জস্যই সম্ভব হবে না, হ'তে পারে না? সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বৈচিত্র্যের? মানুষের সঞ্চলমান জীবনের লক্ষশত নিত্য-নূতন দাবীদাওয়ার সঙ্গে তার অন্তরতম অচঞ্চল রসদীপ্তির? 'পথের পাঁচালী'র কবি এ-সব প্রশ্নের সমাধান নিয়ে মাথা ঘামান নি, "বিচিত্র যাত্রাপথের অদৃশ্য তিলক" পথিকের "ললাটে পরিয়েই" যাত্রা শেষ করতে চেয়েছেন। "পথের দেবতা" যে আমাদের চিরদিন "ঘরছাড়া ক'রে"ই আনেন এই বারতা বহন ক'রে এনেই তাঁর ছবিটির সমাপ্তি টেনেছেন। ঘরছাড়া মানুষ যদি পথের মরীচিকায় লুব্ধ হ'য়ে বেরিয়ে এসে পুনরায় তার ছায়ানিবিড় নীড়ে ফিরে যেতে চায় তাহ'লে তার গতি কী হবে সে-সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করেন্ নি। তবে ইঙ্গিতে জানিয়েছেন যে, তাহ'লে তার গতিকটা বড় সুবিধের হবে না। কিন্তু বলা বাহুল্য, এটা দুঃখবাদীর বিয়োগগাথা মাত্র—শিবনেত্রী দার্শনিকের প্রাতিভ জ্ঞান নয়। এখন দেখা যাক্ "অপরাজিতে" কবি কী সুরে এর পরিণতি দেন?

* ভাবার্থ:—সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সুখের হয় অধোগতি। জীবনের সাজ-সরঞ্জাম যতই জটিল হ'য়ে ওঠে, অশান্তির কারণ ততই বেড়ে ওঠে। বেদনার অনুভূতি উত্তরোত্তর তীক্ষ্ণই হ'য়ে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার সচেতনতা বেড়ে-ওঠার দরুণ নিজেকে ভুলিয়ে রাখাও উত্তরোত্তর কঠিন হ'য়ে ওঠে। ফল হয় এই যে, সভ্যতার প্রতি পদক্ষেপে অভাব যত দ্রুত ফুলে ওঠে, তার পূরণের উপায় তত দ্রুত বেড়ে উঠতে পারে না।

বস্তুতঃ 'পথের পাঁচালী'র সব চেয়ে দুর্ব্বল স্থান বোধ হয় তার শেষ কয়টি ছত্র—যেখানে কবি তাঁর দৃষ্টির সম্বল ছেড়ে দার্শনিকের চিন্তার সান্ত্বনা পেতে গিয়েছেন। তাই বল্‌ছিলাম "পথের পাঁচালী"র লেখক কবি—দার্শনিক নন্, স্রষ্টা—গবেষক নন্, চিত্রী—ভাষ্যকার নন্। ছবি ধরাই তাঁর স্বধর্ম্ম—আলডুস হাক্‌স্‌লি বা ডি এইচ লরেন্স বা রবীন্দ্রনাথ বা রোলাঁর মতন জীবনচিত্র থেকে কোনো গভীর suggestive দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তিনি সিদ্ধহস্ত নন্। ও তাঁর পরধর্ম্ম। হোক্। যায় আসে না। কারণ স্রষ্টা যে মুহূর্ত্তে সত্য স্রষ্টা হ'য়ে ফুটে ওঠে সে মুহূর্তে তাঁর শত ত্রুটিও নগণ্য হ'য়ে উঠ্‌তে বাধ্য। তা ছাড়া তাঁর মধ্যে কী নেই তা দিয়ে কবির বিচার করা চলে না—কী আছে সেই দিয়েই তাঁকে বিচার করতে হবে। "The greatness of a man is the greatness of his greatest moments" তাই "পথের পাঁচালী"র মধ্যে যে কোনো বৃহৎ দিগ্বলয়ের পরিচয় নেই, শিশু চরিত্র ছাড়া অন্য কোনো চরিত্র নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়াস নেই, ঘটনার বৈচিত্র্য নেই, কল্পনার সুদূর বিস্তীর্ণতা নেই, চিন্তার গভীরতা নেই—এ সবে খুব বেশি আসে যায় না। কারণ তার মধ্যে আছে একটি সেরার-সেরা বস্তু—আছে রস, যা হচ্ছে—"a concentrated taste, a spiritual essence of emotion, an essential aesthesis, the soul's pleasure in the pure perfect sources of feeling."* বিশেষ ক'রে শিল্পসৃষ্টিতে রূপায়নে এই রসই—এই essential aesthesis-ই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা। যেখানে শিল্পের মাঝ দিয়ে আমরা, "রসো বৈ সঃ" এই গভীরতম সত্যকে ছুঁই সেখানেই শিল্পানন্দ সার্থকতম হ'য়ে ওঠে। যেখানে না ছুঁই সেখানে রচনা "সৃষ্টির" কোথায় পড়ে না—তার অন্য অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও। অবশ্য রসের ওপরেও যদি দার্শনিকতার দ্যোতনা থাকে, চিন্তার গভীরতা থাকে, বুদ্ধির দীপ্তি থাকে, তবে সেটা শুধু উপরি লাভ নয়—তাতে রসের বৈচিত্র্য, সমগ্রতা ও সমৃদ্ধি বাড়তে বাধ্য। এবং এই জন্যেই আমি সেই শ্রেণীর উপন্যাসেরই বেশি পক্ষপাতী যাতে শুধু আমাদের গল্পপ্রিয় শিশুমনেরই খোরাক নয়—প্রবর্দ্ধমান ভাবুকতারও খোরাক মেলে—যে কারণে শিল্পসৃষ্টি হিসেবে নিকৃষ্ট না হ'য়েও সব জড়িয়ে 'গোরা'র চেয়ে 'চোখের বালি' ছোট, 'শ্রীকান্তের' চেয়ে 'চন্দ্রনাথ', Brothers Karamajov-এর চেয়ে Poor Folk, Virgin Soil-এর চেয়ে Smoke ইত্যাদি। আমরা যে "Sons of an intellectural ape" একথা গায়ের জোরে অস্বীকার ক'রে আগেকার যুগের নিছক্ রূপসৃষ্টিতে পূর্ণ তৃপ্তি পেতে পারিনা।

* The Future Poetry.

যুগধর্ম্মকে আত্মসাৎ আমাদের করতেই হবে;—কাজেই বুদ্ধির মধ্যে দিয়েও সেই "রসো বৈ সঃ"-র দেখা পেতেই হবে। কিন্তু শিল্পসৃষ্টিতে চিন্তার গভীরতা কাম্য হ'লেও কখনো শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারে না, মুখ্য হ'তে পারে না, এই আমার বলবার কথা। শিল্পকারুতে সবচেয়ে বড়—রস, আনন্দ, যে-আনন্দ হ'তে 'খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" কাজেই মানুষের যে-কীর্ত্তি এই আনন্দের স্পন্দনে স্পন্দিত, রসের দীপ্তিতে উজ্জ্বল, প্রাণের আত্ম-উৎসারণে মহিমময় সেই-কীর্ত্তিই রসোত্তীর্ণ—মৃত্যুঞ্জয়। 'পথের পাঁচালী'র ছত্রে ছত্রে উৎকীর্ণ হয়েছে এই অনাসক্ত আনন্দের শান্ত দীপ্তি, unheard melody-র উচ্ছল প্রবাহ, "Le phosphore que les poetes ont au bout des doigts." *। ইতি

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

* সেই স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণ যা কবির একান্ত ইচ্ছাধীন—Les Contemporains.—Jules Lematlre.

প্রগতি

মানুষের সত্যসত্যই ক্রমিক উন্নতি হইয়াছে কি? জীবনের পথে বরাবর সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে? কি হিসাবে, কোন্ দিকে, কতখানি?

এক সময়ে এই উন্নতি—আধুনিক ভাষায়, এই প্রগতির কথাটা খুব জোর গলায় ঘোষণা করা হইয়াছিল। মানুষ যে অতি দ্রুত আপনাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া চলিয়াছে, মনকে প্রাণকে শুদ্ধ শাণিত সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, সত্বরই সে যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সম্পূর্ণ জীব হইয়া উঠিবে—এ-সম্বন্ধে রোমান্টিক্ যুগের প্রথম স্বপ্নালুদের কোন সন্দেহই ছিল না। প্রাচীনতর যুগের মানুষ হইতে আধুনিকেরা কত দিকে কত ভাবে কত দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, আধুনিকের তুলনায় প্রাচীনেরা যে মোটের উপর শিশু—এই কথাটা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তারপর জড়বিজ্ঞান যখন তাহার অত্যদ্ভুত জ্ঞান ও শক্তি সব মানুষের হাতের মধ্যে আনিয়া দিল তখন ত আর দ্বিরুক্তি করিবার কিছুই রহিল না।

বিজ্ঞান তাহার বিবর্ত্তনবাদে এই সত্য আবিষ্কার করিল যে, সমস্ত সৃষ্টিই ক্রমিক উন্নতির পথে চলিয়াছে—প্রথমে ছিল কেবল জড়, পরে আদিম জীবন, তারপরে চেতনা ও মন বুদ্ধি; আদিতে ছিল আগুন উত্তাপ, তারপর জলবায়ু, তারপর গাছপালা, তারপর জীবজন্তু—সকলের শেষে আবির্ভাব মানুষের। মানুষও প্রথমে ছিল বন-মানুষ, বন-মানুষ ক্রমে হইল আদিম অসভ্য মানুষ, আদিম অসভ্য মানুষ উন্নত হইতে হইতে আধুনিক সভ্য মানুষে পরিণত হইয়াছে। উন্নতি আর কাহাকে বলে? শীঘ্রই যে মানুষ আকাশ ফুঁড়িয়া এক দেবলোকে উঠিয়া বসিবে, তাহারও আশু সম্ভাবনায় অনেকে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

প্রথম যুগের এই সরল অনাবিল আস্থা ও উৎসাহ কিন্তু বেশিদিন টিঁকিয়া রহিল না। অতীতের ইতিহাসের সহিত বিজ্ঞান যতই ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে লাগিল, অতীতকে যতই গভীরতর ব্যাপকতর ভাবে খুঁড়িয়া চুঁড়িয়া চলিতে লাগিল, ততই সে দেখিল উন্নতি যদি বাস্তবিক হইয়া থাকে তবে ও জিনিষটি সোজা একটানা পথে অল্প মেয়াদে—দুই-চার সহস্র বৎসরের মধ্যে ঘটে নাই। মানুষের উৎপত্তি-স্থান আবিষ্কার করিতে গিয়া আমরা ক্রমেই দূর হইতে দূর অতীতে চলিয়া যাইতেছি। মানুষ দূরের কথা, সভ্য মানুষেরই গোড়া পাওয়া যায় না। সভ্যতার পশ্চাতে সভ্যতার ক্রম যে কত অতীতে প্রসারিত, তাহার হিসাব লওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। জগতে আজও তথাকথিত আদিম অসভ্য মানুষ আছে—কিন্তু কবে সমগ্র মানবজাতিই ছিল আদিম অসভ্য? তাই অনেক বৈজ্ঞানিক বলিতে শুরু

করিয়াছেন, আদিম অসভ্য নামে আজ যাহাদিগকে আমরা অভিহিত করি, তাহারা একটা প্রাচীন সুমহান সভ্যতার বিকৃত ধ্বংসাবশেষ মাত্র। অজ্ঞাত অতীতের ওদিকে ধীরে ধীরে আমরা যতই চলি না কেন, দেখি কোন না কোন মানব-সঙ্ঘ তাহার সভ্যতার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের কথা, এইসব সভ্যতা সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে মোটের উপর প্রায় একই ধরণের ছিল। অতি-আধুনিক আমরা, আমাদের অশন বসন ব্যসনের যত উপচার লইয়াই গর্ব্ব করি না কেন—তদনুরূপ দ্রব্যসম্ভারই আজ আমরা আবিষ্কার করিতেছি মিশরের ভূগর্ভে, গোবিমরুর বালুতলে, ইরাকের ক্রীটের সিন্ধুর মাটির অন্তরালে। হাতে-কলমে প্রমাণ পাইতেছি, আজ আমরা যত যত্নে নৈপুণ্যে প্রসাধন করি, প্রেম করি, শিল্প রচনা করি, রাজ্যশাসন করি, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও মানুষ মোটের উপর একই ভাবে ঐ একই জিনিষে অভ্যস্ত ছিল।

তবুও অতীতে ও অধুনায় যদি কিছু বা যাহা কিছু পার্থক্য আসিয়া থাকে, তবে তাহা দেখাইতে হইলে যাইতে হয় বিজ্ঞানেরই দুয়ারে। জড়বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতির উপর মানুষ যে কর্তৃত্ব পাইয়াছে এবং তদ্দ্বারা জীবনযাত্রার প্রণালীকে যতখানি সুগম সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, তাই আধুনিকের বিশেষত্ব। প্রকৃতিকে আমরা করায়ত্ত করিয়াছি, প্রকৃতিকে দিয়াই প্রকৃতিকে আমরা বাঁধিয়া ফেলিয়াছি, তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছি মানুষের সেবায়। অবশ্য এখানেও বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতির উপর আধুনিকের দখল আকারে বা পরিমাণে যতই বিপুল হোক্ না কেন, প্রকারে বা গুণ হিসাবে তাহা যে প্রাচীনের অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহা সন্দেহের বিষয়। আগে যে কাজের জন্য সহস্র লোক খাটিত, এখন হয়ত একটি কি দুটি লোক আছে একটি যন্ত্র লইয়া। আগে শত শত প্রদীপ যেখানে প্রয়োজন হইত, এখন তাহার কাজ করিতেছে দুই চারিটি বৈদ্যুতিক আলো। আগে যাহা সম্পন্ন করিতে লাগিত বৎসর, এখন তাহাতে মাস বা সপ্তাহই যথেষ্ট। মাস মাস ধরিয়া পূর্ব্বে যে-পথ অতিবাহন করিতাম, এখন সেখানে যাই তিন ঘণ্টায় উড়িয়া। এই ভাবে যন্ত্রপাতির কল-কারখানার কল্যাণে আমাদের সকল কার্য্য সংহত ক্ষিপ্র ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্য্যের আকৃতি নয় প্রকৃতি, জীবনের রূপ নয় ছন্দ তাহাতে কতখানি পরিবর্ত্তিত? জড়বিজ্ঞান জীবনের কাঠামো অনেকখানি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নতুন করিয়া গড়িতেছে, কিন্তু জীবনের অন্তঃস্থলে মর্ম্মে কতখানি স্পর্শ করিয়াছে—মানুষের চেতনায় আনিয়াছে কোন্ নূতন দর্শন, নূতন গতি?

এই ভাবে এক দিক্ দিয়া দেখিলে মনে হয় মানুষের আসল উন্নতি দূরের

কথা, বিশেষ পরিবর্ত্তনও কিছু ঘটিয়াছে কি-না সন্দেহ—মানুষ আছে মানুষ যথাপূর্ব্বং তথাপরং।

কিন্তু তাহা নয়, আরও গভীরতর দৃষ্টিতে দেখিব মানুষের পরিবর্ত্তন উন্নতি, প্রগতি ঘটিয়াছে, ভিতরের দিক্ দিয়াই—মতিগতির, চেতনারই হিসাবে। চেতনারই বিকাশ বা বৃদ্ধি হওয়াই সেই পরিবর্ত্তনের লক্ষণ; সেই প্রগতির মূল কথা এই যে, মানুষ দিনে দিনে বেশি সচেতন হইয়া উঠিতেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ বহির্জীবনে, কর্ম্মের আয়তনে মানুষ যে বর্দ্ধিত জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় দিতেছে তাহা এই বর্দ্ধিত চেতনার ফল—বাহিরে মানুষের জ্ঞান ও শক্তি ততখানি প্রসার পাইয়াছে, ভিতরে ততখানি তাহার চেতনা জাগিয়াছে বাড়িয়াছে। জ্ঞান এবং শক্তি হইতেছে চেতনারই বাহ্য প্রকাশ ও প্রয়োগ। মানুষ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে নিজের সম্বন্ধে, জগতের সম্বন্ধে—নিজেকে নিজে ঘুরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, জগতের ছুঁইয়া টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া চালিয়াছে। চেতনা বাড়িয়া যাইতেছে, অর্থ এমন নয় যে, মানুষ নৈতিক হিসাবে উন্নত হইয়া উঠিতেছে। নৈতিক উন্নতি বা স্বভাবের শুদ্ধি হইতেছে চেতনার ঊর্দ্ধমুখী গতি—আমরা এখানে বলিতেছি চেতনার তির্য্যক্ গতির কথা। মানুষের চেতনা প্রসারিত হইয়াছে—বিস্তৃতির সাথে সাথে তাহা আবার বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে—"চিত্র প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা।"* এই প্রসারণ ও সমৃদ্ধির অর্থ সত্যই ভালমন্দ দুই রকম বৃত্তিকেই আলিঙ্গন করা—হয়ত অনেক ক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষা বেশির ভাগ মন্দকেই বরণ করা। বাইবেলের মতে, মানুষ ত আগে নিষ্পাপই ছিল, যখন তাহার ছিল শিশুসুলভ সারল্য ও অজ্ঞান। সয়তান তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল সেদিন যেদিন তাহার জাগিল কৌতূহল, সে পাইল জ্ঞানের আস্বাদ।

জ্ঞানের প্রসারণ অর্থে সাধারণতঃ বুঝি নূতন নূতন অনেকানেক বিষয়কে ক্ষেত্রকে বুদ্ধির, প্রত্যয়ের গোচর করিয়া তোলা। এই দিক দিয়া আধুনিকের জ্ঞানের প্রসার অনেক হইয়াছে, সন্দেহ নাই—অন্ততঃ বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে। জড়প্রকৃতির নব নব বহুতর রহস্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি, এক দিকে অণোরণীয়ান্ অন্যদিকে মহতো মহীয়ান কতরূপ কত গতিবিধি আমরা উদ্ঘাটিত করিয়াছি। প্রাচীনের তুলনায় এই পথে আমরা অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছি। তবে, অন্তরের জগৎ সম্বন্ধে যে কথা কতটুকু বলিতে পারি তাহা বিচার্য্য—ভিতরের চেতনায় নূতন নূতন লোক, নূতন নূতন তথ্য খুব বেশি যে আমরা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি, তাহা বোধ

* ঊষার সাথে সাথে এক জ্ঞান "বহুমুখী ও বিশ্বব্যাপী হইয়া জন্মিল" (ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, সূ ১১৩—১)

হয় না। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও এক হিসাবে প্রাচীনের সাথে আধুনিকের বিশেষ পার্থক্য ফুটিয়া উঠিতেছে—এবং সেখানেও দেখি ঘটিয়াছে জ্ঞানের প্রসারণ চেতনার বিস্তৃতি।

আগে মানুষ—যে মানুষ বুদ্ধির স্তরে উঠিয়াছে, শিক্ষায়-দীক্ষায় মার্জ্জিত হইয়াছে সে—তাহার ব্যক্তরূপ বা আধারকে অর্থাৎ দেহকে প্রাণকে ও মনকে, এবং প্রকৃতিরও এই ত্রিধা ভূমিকে, দেখিত বুঝিত বিষয় হিসাবে। জ্ঞাতার চক্ষে—কর্ত্তার হাতের ত কথাই নাই, সমস্ত সৃষ্টিই ছিল জড় বস্তু। কর্ম্মীর, কাজের কাজীর স্থূল চক্ষুই হৌক্, দার্শনিকের বুদ্ধি-বিচারের চক্ষুই হৌক্, কিম্বা যোগীর অন্তরস্থ চৈতন্য-পুরুষের চক্ষুই হৌক্—যে চক্ষু দিয়াই আমরা জগৎকে এ যাবৎ দেখিয়াছি তাহাতে সর্ব্বত্র বিষয়ের জড়ত্বই ধরিয়া লইয়াছি—দেহের, প্রাণের বা মনের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য চেতনা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। সাংখ্যের জবাব ত স্পষ্ট; বেদান্তের সিদ্ধান্তও তদনুরূপ—প্রকৃতি জগৎ জড় অচেতন, অবিদ্যা অজ্ঞান। প্রকাশের মধ্যে—প্রকৃতিতে জগতে, যদি চেতনার আভাস পাই তবে তাহা প্রকৃতির জগতের উপরে অতীতে যে পুরুষ বা ব্রহ্ম তাঁহারই চেতনার সংক্রমণ বা আরোপ বা প্রতিচ্ছায়া। নিজের নিজের রূপে ব্যক্তরূপ সব স্বভাবতই জড় অজ্ঞান—ব্যক্তরূপের গণ্ডী মুছিয়া ফেলিয়া যতখানি অরূপে তাহারা মিশিয়া যাইতেছে ততখানিই তাহারা হইতেছে চৈতন্যময়—নিজেকে হারাইয়া তবে তাহারা পাইতেছে তাহাদের জ্ঞানময় আদি সত্তা।

আধুনিক চেতনার বৈশিষ্ট্যই এইখানে যে, তাহার কল্যাণে মানুষ আপন ব্যক্ত প্রকৃতিরই মধ্যে, স্থূল রূপায়নকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহারই মধ্যে সজ্ঞান সচেতন হইয়া উঠিতেছে। মন প্রাণ, এমন কি দেহ পর্য্যন্ত, নিজে নিজের পরিচয় লইতেছে—তাহারা কেবল জড় বিষয় নয়, বিষয়ীর স্বভাবও তাহাদের প্রত্যেকরই আছে। আগে বড় জোর মনই ছিল একাধারে বিষয় ও বিষয়ী—মনই দেখিত প্রাণকে দেহকে এবং নিজেকে—মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনো সেঠ্ঠা মনোময়া; কিন্তু এখন মন ত মনকে জানিতেছেই প্রাণও জানিতেছে প্রাণকে, দেহও জানিতেছে দেহকে—ইহারা প্রত্যেকে নিজের নিজের চেতনা আবিষ্কার করিতেছে, তাহাতেই সম্বুদ্ধ সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে। আজকালকার বিজ্ঞান জড়ের সম্বন্ধে এই ভাবেই না সত্যের সন্ধান করিতেছে, যাহাতে বস্তু নিজেই নিজের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রহস্য ব্যক্ত করিয়া ধরে? জগদীশচন্দ্রের যাদুবলে গাছ-পালা আজ নিজেরাই নিজেদের জীবনের গুপ্ত কাহিনী লিখিয়া চলিয়াছে। এ সকল কি ঐ তত্ত্বেরই প্রকাশ বা ইঙ্গিত নয়? প্রাণের ক্ষেত্রেও দেখি, আমরা ঐ একই প্রণালী অনুসরণ করিতে সুরু করিয়াছি। প্রাণকে

বুঝা যায় প্রাণ দিয়া প্রাণকে প্রাণের সহিত একাত্ম করিয়া, প্রাণের চেতনায় জাগিয়া। তাই বের্গসন বলিতেছেন, সাক্ষাৎ অনুভূতি (Intuition) হইতেছে একটা সহ-অনুভূতি (Sympathy)।

মনের ক্ষেত্রেও মন যে রকমে আত্ম-চেতনায় সম্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, আত্ম-ছন্দে আপনাকে চালিত করিতেছে তাহাও দেখাইতেছে আধুনিকের বৈশিষ্ট্য। মন অবশ্য চিরকালই মনকে দেখিতে এবং বুঝিতে অভ্যস্ত— কিন্তু সে যেন ছিল মনকে মনের বাহিরে স্থাপিত করিয়া, জড়বস্তু হিসাবে দেখিয়া। আজকাল মনের জ্ঞান পাইতেছি মনকে মনের সাথে মিশাইয়া ধরিয়া—এখানেও একাত্মতাই হইয়াছে জ্ঞানের পন্থা। মনের মধ্যে মনোময় পুরুষ তন্ময় হইয়া গিয়াছে—এই এক মানসিক সমাধির সহায়ে আপন অন্তর হইতে উর্ণনাভের মত সে যেন আবিষ্কার করিতেছে, রচনা করিতেছে অনুভূতির প্রতীতির, ভাবের প্রত্যয়ের, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিচিত্র তথ্যাবলী সূত্রাবলী; আধুনিক সাহিত্যের ইহা একটা বিশেষ ধারা (Proust, Valery, Gide, Jean Giraudoux)।

আগের আগের যুগে দেহ প্রাণ মন—মানুষের সমগ্র আধারটি অনেকটা অবুঝের মত, অন্ধের মত, নির্ব্বিচারে একটা আদর্শকে ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া লইত, মানিয়া চলিত—যুগভেদে দেশভেদে কখন কোথাও তাহা হইয়াছে দেহগত ধর্ম্ম, কখন কোথাও প্রাণগত, আবার কখন কোথাও মনোগত ধর্ম্ম। তখন সতীর যেমন সংস্কার ছিল পতির পদতলে আত্মবলি দিয়াই তাহার সকল সার্থকতা—তেমনি মানুষের আধারেও এই শিক্ষা দীক্ষা ছিল, সর্ব্বথা আপনাকে অনুগত করিয়া রাখা। রীতি, নীতি, আচার, ইষ্ট, ধর্ম্ম, সত্য প্রভৃতি নানা নামে ও রূপে তাহার প্রভুকে সম্মুখে স্থাপন করা হইত।

কিন্তু বর্ত্তমানে মানুষের আধার, আধারের প্রতি স্তর তাহাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দিয়াছে—শ্রীরাধার মত তাহারা তাদের প্রভুকে মুখ ফুটিয়া বলিতেছে—

শুন মানব রাধা স্বাধীনা ভেল।

বাহিরের কোন একটা আদর্শ বা ব্যবস্থা তাহাদের নিজস্ব প্রকৃতিকে আর চাপিয়া বা দাবাইয়া রাখিতে পারিতেছে না—অন্য কোথাও হইতে আরোপিত মানদণ্ড অনুসারে তাহারা নিজেকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতে চাহিতেছে না। প্রতি অঙ্গ আজকালকার যুগে পাইতেছে এক স্বাতন্ত্র্য, স্বাচ্ছন্দ্য, আত্ম-সংস্থা (self determination)। তাহারা নিজের ভার নিজে গ্রহণ করিতেছে, নিজের পথে নিজের সত্য ও ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া অনুসরণ করিতে চাহিতেছে।

আজকাল সর্ব্বত্র যে একটা স্বেচ্ছাচার, অনাচার, যে নৈতিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে তাহার নিদান এইখানে। মানুষের ইতরা বা অপরা প্রকৃতির স্তরে স্তরে একটা আত্মসম্বিতের আলো, স্পন্দন প্রকাশ পাইতেছে। এই আত্মজাগরণের প্রথম ফল হইয়াছে যে পুরাতনের অন্ধ সংস্কারের শৃঙ্খলা টুটিয়া গিয়াছে কিন্তু নূতনের পূর্ণ চেতনার শৃঙ্খলা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বর্ত্তমান হইতেছে সন্ধিকাল—পরিবর্ত্তনের যুগ—স্থিতির নয়।

মানুষের অঙ্গে অঙ্গে, তাহার সত্তার স্তরে স্তরে এই যে স্বাতন্ত্র্য বা আত্ম-চেতনার সূত্রপাত তাহাকেই পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি চেতনার তির্য্যক্ গতি বা সম্প্রসারণ। অবশ্য প্রসারণের পশ্চাতে, অন্তরালে আছে হয়ত একটা ঊর্দ্ধলোক হইতে জ্যোতির ক্রমিক অবতরণ—এবং ফলে নূতন একটা ঊর্দ্ধায়নের আরোহণের প্রেরণা; কিন্তু এ সকল প্রচ্ছন্নলোকের শক্তি, আমাদের জাগ্রত চেতনায় তাহা আসিয়া এখনও ধরা দেয় নাই— তাহাতে হয়ত রহিয়াছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা; কিন্তু বর্ত্তমানে রূপায়িত ছন্দায়িত হইয়া উঠিয়াছে চেতনার বহির্ম্মুখী বহুধা গতি।

পূর্ব্বতন যুগে মানুষের মধ্যে একটা অন্তর্ম্মুখী, ঊর্দ্ধমুখী প্রেরণাই হয়ত অধিকতর স্পষ্ট জাগ্রত ছিল; কিন্তু সে প্রেরণা চলিত সরল রেখায়, একটিমাত্র ধারা অবলম্বন করিয়া। যেমন, মনকে আশ্রয় করিয়া কি মানসিক চেতনার একটি সূত্র ধরিয়া উপরে মানসাতীত লোকে মানুষ উঠিয়া যাইত—কিম্বা হৃদয়ের মধ্যে নামিয়া তেমনিভাবে ডুবিয়া তলাইয়া যাইত একটি অতীন্দ্রিয় চেতনায়। বর্ত্তমান যুগের মানুষের পক্ষে এই ধরণের উপলব্ধি তেমন সহজ ও সুলভ নয়; সে ডুবিয়াও যায় না, উপরে উঠিয়াও চলে না—সে দেয় আপনাকে সমানভাবে চারিদিকে প্রসারিত করিয়া।

তাই বর্ত্তমান যুগের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, মানুষ জিনিষকে, নিজেকে কেবল একদিক্ হইতে নয়—সে দিক্ যতই উপরের বা গভীরের হৌক্ না কেন—সে দেখিতে বুঝিতে চাহে নানা দিক্ হইতে নানা ভাবে। শুধু নিজের চক্ষু দিয়া নয়, পরের চক্ষু দিয়া, সকলের চক্ষু দিয়া জিনিষ দেখিতে কি রকম তাহাও জানিতে সে চায়। এমন কি, একটির পর আর একটি পর্য্যায়ক্রমে নয়, কিন্তু যুগপৎ সকল দিক্ হইতে দেখিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতেছে। শিল্পে Cubism ও Futurism-এর উদ্ভব হইয়াছিল এই প্রেরণায়। প্রাচীনের শিল্পের রীতি ছিল এক জিনিষকে এক সময়ে একই স্থান হইতে, একই দৃষ্টি দিয়া দেখা—সে দৃষ্টি স্থূল চক্ষুর হৌক্ আর অন্তরের অনুভব হৌক্। কিন্তু বর্ত্তমানে দৃষ্টির এই একনিষ্ঠা—এই unity of

apperception—আমরা বাতিল করিয়া দিয়াছি। দৃষ্টিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছি—জিনিষের বহুধা বিচিত্ররূপ দেখিতে।

সর্ব্বাঙ্গে আত্মচেতনার ফলেই যেন মানুষ এইভাবে আপনাকে কেমন পাশাপাশিই প্রসারিত করিয়া দিয়া চলিয়াছে। তাহার প্রতি অঙ্গ জিনিষকে ধরিতে ছুঁইতে চাহিতেছে আপন আপন ভাবে ভঙ্গীতে—মন চাহিতেছে এক ধারায়, প্রাণ আর এক ধারায়, দেহ তৃতীয় আর এক ধারায়; এবং প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধারাকে চাহিতেছে ঐকান্তিক, আত্যন্তিক ভাবে। আর এই জন্যই পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব সজ্ঘর্ষ বাধিয়া গিয়াছে এবং মানুষের মধ্যে দেখা দিয়াছে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলতা।

চেতনার এই যে বিস্তার, যে বিক্ষেপ ঘটিয়াছে, তাহা মূলতঃ বৃহতের দিকে অস্পৃহার ও প্রগতির ফল। কিন্তু সত্যকার বৃহৎ চেতনা মানুষের আসিবে তখনই, যখন এই তির্য্যক্ গতির সহিত যোগ করিয়া দিতে পারিবে অথবা এই তির্য্যক্ গতিকে প্রকাশ করিবে, রূপ দিতে থাকিবে একটা উর্দ্ধমুখী অন্তর্ম্মুখী গতি।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

রুষ-বিপ্লবের ইতিবৃত্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬

বিদেশের সহিত যোগের কথা আলোচনা করিবার সময় তৃতীয় সার্ব্বভৌমিক শ্রমিকসজ্ঘের (Third International) নাম স্বতঃই মনে আসে। এই প্রতিষ্ঠানের একটু ইতিহাস আছে।

১৮৪৭ সালের সাম্যবাদের ঘোষণাপত্রে মার্ক্স্ বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদিগকে একতার জন্য অনুরোধ করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই নেতৃত্বে লণ্ডন নগরে প্রথম সার্ব্বভৌমিক শ্রমিকসজ্ঘ স্থাপিত হয়। কিন্তু দেশে দেশে তখনও শ্রমিক-আন্দোলন প্রবল না হওয়াতে এবং মার্ক্স্ ও বাকুনিনের মতের অনৈক্যের ফলে ইহার অকালমৃত্যু ঘটে। ১৮৮৯ সালে দ্বিতীয় সার্ব্বভৌমিক সজ্ঘের উৎপত্তি। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সোসিয়ালিষ্ট দলগুলি এই সময় হইতে তিন বৎসর পরে পরে মহাসভায় সম্মিলিত হইত বটে কিন্তু কোন কেন্দ্রীয় পরিচালক সমিতি তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে নাই। এমন কি, মহাযুদ্ধের সময়ে অধিকাংশ সোসিয়ালিষ্ট্ই অসঙ্কোচে নিজ নিজ দেশের শাসকদের সহিত যোগদান করিয়াছিল।

রুষবিপ্লবের অব্যবহিত পরে কমিন্টার্ণ্ বা তৃতীয় সজ্ঘটি স্থাপিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত সাম্যবাদীদলগুলিকে বল্শেভিক্দের নেতৃত্বে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করা ইহার উদ্দেশ্য। প্রফিন্টার্ণ্ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ট্রেড্ ইউনিয়ন্গুলির সমষ্টি মাত্র। জগতের যাবতীয় শ্রমিকদল এখন আম্ষ্টার্ডামের দ্বিতীয় সঙ্ঘ ও মস্কোস্থিত তৃতীয় সজ্ঘের মধ্যে বিভক্ত।

জগদ্ব্যাপী বিপ্লব আনয়ন করাই তৃতীয় সার্ব্বভৌমিক শ্রমিকসজ্ঘের উদ্দেশ্য। ইহার নেতৃবৃন্দ সোভিয়েট্ রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের মধ্যে অন্যতম। এইজন্য বিদেশের লোকে স্বভাবতই রাশিয়ার শাসকবর্গকে এই সজ্ঘের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। অন্যদেশের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের পথে এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ অন্তরায়। চীনের সহিত সোঁভিয়েট্ রাষ্ট্রের প্রথমে অতি সদ্ভাব হয়—কেননা বল্শেভিকেরা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে চীনদেশে তাহাদের সমস্ত অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু ১৯২৭-এর পর বল্শেভিক্-বাদ প্রচারের ফলে চীনের জাতীয় দল ও সোভিয়েট্ রাশিয়ার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। সাম্যবাদীগণ অন্যদেশেও বিশেষ সাফল্যলাভ করে নাই এবং সেইজন্য বোধহয় সম্প্রতি সজ্ঘের প্রভাব ও কার্য্যপদ্ধতির আর তেমন প্রসার হইতেছে না। রাশিয়ার জাতিগত স্বার্থের খাতিরে জগদ্ব্যাপী

বিপ্লবের আদর্শ হয়ত খর্ব্ব করা হইবে। কিন্তু তৃতীয় সার্ব্বভৌমিক শ্রমিক-সঙ্ঘ বল্‌শেভিক্-বাদের একটি প্রধান অঙ্গ—ইহাকে ত্যাগ করা সম্ভবপর নহে।

৭

নবীন রাশিয়ায় বল্‌শেভিক্ বা সাম্যবাদীদলই সর্ব্বশক্তিমান। অতএব ইহাদের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

রাশিয়ার জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা একজনের অধিক সাম্যবাদী নাই। রুষবিপ্লবের বহুপূর্ব্ব হইতেই সংখ্যাবৃদ্ধির অপেক্ষা উপযুক্ত সভ্য সংগ্রহের প্রতিই নেতারা অধিক মনোযোগ দিয়া আসিয়াছেন। এখনও পর্য্যন্ত কিছুদিন পরে পরে সভ্যদিগের মধ্যে বাছাই করা হয়। দুর্ব্বলচেতা ও অবাধ্য লোকদিগকে দল হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য একটি বিশেষ সমিতি আছে। কম্‌সোমল্ ও পাওনিয়ার্স্ সাম্যপন্থী যুবক ও কিশোরদের দুইটি স্বতন্ত্র সমিতি। তাহাদের সভ্যেরা অন্যদের অপেক্ষা সহজে মূল দলে প্রবেশ করিতে পারে।

রাশিয়ার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম ও কারখানাগুলিতে সাম্যবাদীদের প্রায় পঞ্চাশ সহস্র ক্ষুদ্র শাখা আছে। তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গকে লইয়াই মহাসভা গঠিত। সকল ব্যাপারের চূড়ান্ত নির্দ্ধারণ এই সভার কাজ। অধিবেশনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সভ্যেরা স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে পারে কিন্তু অধিকাংশের মতানুসারে কোন প্রস্তাব গৃহীত হইবামাত্র সকল সভ্যই তাহা মান্য করিতে বাধ্য। কেহ এ-নিয়মের অন্যথা করিলে তাহাকে দলত্যাগ করিতে হয়।

দেশের শাসনযন্ত্রে প্রধান প্রধান যে পদগুলি আছে তাহার প্রত্যেকটিতে কোন না কোন সাম্যবাদী অধিষ্ঠিত। তাহারা সকলে মহাসভার আদেশ অনুসরণ করিতে বাধ্য। সুতরাং সোভিয়েট্ রাষ্ট্রের সমস্ত ব্যবস্থা সাম্যবাদীদলের অধিকাংশের মতানুসারে চলে। লেনিনের মতবাদে শ্রমিক-নেতৃত্বের যে কথা পাওয়া যায় কার্য্যতঃ তাহা সাম্যবাদীদের প্রভুত্বে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তাহা না হইলে রাশিয়ায় নূতন যুগের প্রবর্ত্তন সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। সভ্যগণ শ্রমিক ও কৃষকবৃন্দের সহিত সর্ব্বদা মিশিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ বুঝিতে পারে বলিয়াই তাহাদের হাতে নেতৃত্ব অবাধে সমর্পিত হইতেছে।

সাম্যবাদী মহাসভা হইতে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি নির্ব্বাচিত হয়। তাহারা আবার একটি কর্ম্মসমিতি গঠন করিয়া সমস্ত কার্য্যভার তাহার উপর অর্পণ করে। নয়জন সভ্যে গঠিত এই কর্ম্মসমিতিটিই বস্তুতঃ রাশিয়ার

ভাগ্যবিধাতা। বর্ত্তমান কর্ম্মসচিব ষ্টালিন্ রাশিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি।

সাম্যবাদীদিগের সর্ব্বব্যাপী কর্ত্তৃত্বের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর নহে। দেশের সর্ব্বত্র তাহাদের দলের লোকেরা প্রধান প্রধান পদে ও নেতার আসনে বিরাজ করিতেছে। দলের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষদিগের সকল আদেশ পালন করিবার কঠোর অভ্যাসই যে তাহাদের কর্ম্মকুশলী ও ক্ষিপ্র করিয়া তুলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সাম্যবাদীরা কখনও জনসাধারণের সহিত যোগ হারায় না—দলের কর্ম্মপ্রণালী সোভিয়েটে প্রকাশিত লোকমত অনুসারে বারম্বার পরিবর্ত্তিত হয়। সেইজন্য এখন পর্য্যন্ত তাহাদের উপর জনগণের আস্থা আছে। বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর যতটুকু লাভ হইয়াছে তাহার মূলে সাম্যবাদীদল, এ-কথা তাহারা ভুলে নাই। কৃষকদিগের সম্বন্ধে অবশ্য এখনও কিছু সন্দেহ আছে—বল্‌শেভিক্-তন্ত্রের প্রধান ভয়ের কারণ এই কৃষক-সম্প্রদায়। মনে রাখিতে হইবে যে, রাশিয়াতে অন্য কোন দলের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা নাই। বল্‌শেভিক্-দিগের মতে, নূতন রাষ্ট্র গঠনের সময়ে কোনপ্রকার অসাবধানতা বা শিথিলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া অসম্ভব। সেইজন্য বিরোধী মত ছাপাইবার বা বক্তৃতায় প্রচার করিবার স্বাধীনতা রাশিয়াতে নাই। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে নির্ম্মম শাস্তির ব্যবস্থা আছে। সাম্যবাদ অনুসারে, দেশে যতদিন শ্রেণীবিভাগ ও ধনতন্ত্রের চিহ্নমাত্র থাকিবে ততদিন এই কঠোর নিয়ম ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

৮

বল্‌শেভিক্‌দিগের মধ্যে নানা বিষয়ে বহুবার মতভেদ হইয়াছে। মতান্তর দলের জীবনী-শক্তির পরিচায়ক। সাম্যবাদের পণ্ডিতদিগের মতে শ্রমিকশ্রেণীর নানা বিভিন্ন চিন্তাধারা দলের মধ্যে প্রকাশ পাইতে বাধ্য। সাম্যবাদের মূল আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা বল্‌শেভিক্‌দের মধ্যে এতই সুদৃঢ় যে, মতদ্বৈধ কখনও দলভঙ্গে পরিণত হয় নাই।

রুষবিপ্লবের পূর্ব্বে লেনিনের সহিত জিনোভিয়েভ্ ও কামেনেভের মতের পার্থক্য হয়। তাঁহারা নভেম্বরের বিপ্লবচেষ্টার বিরোধী ছিলেন কিন্তু লেনিন্ ও ট্রট্স্কি সে চেষ্টায় আশাতীতভাবে সফল হইবার পর তাঁহারা ভুল স্বীকার করেন।

বিপ্লবের পরে, ১৯১৮ সালের প্রারম্ভে, লেনিনের সাবধানতা বুখারিন্, রাডেক্ প্রভৃতির নিকট কাপুরুষতা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল।

সামরিক সাম্যতন্ত্রের যুগে ইহাদের মতকেই লেনিন্ সময়োপযোগী মনে করিলেন। নেপের আমলে চরমপন্থীরা আবার অসন্তুষ্ট হইল।

১৯২৩ সালে লেনিনের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও ১৯২৪-এর জানুয়ারীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার সহকর্ম্মিদিগের মধ্যে ট্রট্স্কি বহির্জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইলেও নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত হইলেন না। ট্রট্স্কি বল্‌শেভিকদলে নবাগত—১৯১৭ সালের পূর্ব্বে তিনি মেন্‌শেভিক্ ছিলেন বলিয়া প্রবীণ বল্‌শেভিকেরা তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না। লেনিনের তিরোধানে রাইকভ্ প্রধান অমাত্যের পদে নিযুক্ত হইলেন কিন্তু বস্তুতঃ নেতৃত্ব রহিল অন্য তিন জনের হাতে—সাম্যবাদীদলের কর্ম্মসচিব ষ্টালিন্, লেনিনগ্রাড সোভিয়েট্ ও তৃতীয় সার্ব্বভৌমিক শ্রমিক-সঙ্ঘের সভাপতি জিনোভিয়েভ্, এবং মস্কো সোভিয়েটের অধ্যক্ষ কামেনেভ্। ইহারাই এই সময়ে ত্রয়ী নামে সুপরিচিত ছিলেন। ট্রট্স্কির সহিত ইহাদের বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল।

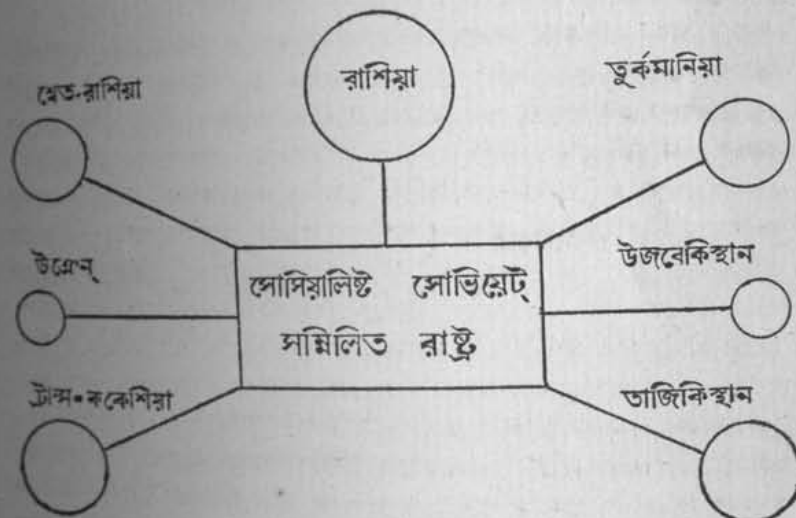
১৯২৬ সালে অকস্মাৎ জিনোভিয়েভ্ ও কামেনেভ্ পূর্ব্ববৈরী ট্রট্স্কির সহিত যোগ দিয়া ষ্টালিনের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করেন। দুই বৎসর ধরিয়া এই দ্বন্দ্ব চলে। ট্রট্স্কির মতে বল্‌শেভিক্ নীতি বিশ্ববিপ্লবের আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া সংকীর্ণ জাতীয়তায় পর্য্যবসিত হইতেছিল। কেবল একটি দেশকে অবলম্বন করিয়া সোসিয়ালিষ্ট সমাজ গড়িয়া তোলা স্বপ্নমাত্র। রাশিয়ার কৃষকদিগের প্রতি যে-অন্যায় যত্ন অতি-মাত্রায় দেখানো হইতেছিল তাহা ধনতন্ত্রের প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাস। ফরাসী-বিপ্লবের সময় থার্ম্মিডর্-যুগে যে ভাবে বিপ্লবের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছিল, ষ্টালিনের নেতৃত্বে তাহাই যেন রাশিয়ায় পুনরভিনীত হইতেছে। কিন্তু ষ্টালিন্ ও তাঁহার সমর্থক সাম্যবাদীদলের অধিকাংশের মতে এই অভিযোগগুলি অমূলক; অন্যদেশে বিপ্লব না ঘটিলেও রাশিয়াতে সোসিয়ালিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর। ১৯২৭ সালে ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ্, কামেনেভ্, রাডেক্, রাকভ্‌স্কি প্রভৃতি সুবিখ্যাত নেতাগণ সাম্যবাদীদল হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। অন্য সকলে অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্রমে ক্রমে দলে ফিরিয়া আসেন কিন্তু নিজ মতে অবিচলিত থাকার দোষে ট্রট্স্কির নির্ব্বাসনদণ্ড হয় (১৯২৯)।

চরমপন্থীদিগের পতনের পর অন্য এক মতের সহিত ষ্টালিনের সজ্ঘর্ষ হইল। অচিরে সোসিয়ালিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া, বুকারিন, টম্স্কি, রাইকভ্ প্রভৃতি নেতারা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অবস্থাপন্ন কৃষকদিগকে অধিক উৎসাহদানের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। কিন্তু এবারেও দলের অধিকাংশের পৃষ্ঠপোষণে ষ্টালিনেরই জয় হইল

(১৯২৮)। বিপ্লবের পর লেনিন্ যেমন সাম্যবাদীদলকে মধ্যপন্থায় চালিত করিয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে, ষ্টালিন্‌ও ঠিক সেই ভাবে নেতৃত্ব করিতে সমর্থ।

৯

রাশিয়ায় বিভিন্ন জাতির বসবাস। সম্রাট্‌দিগের যুগে সংখ্যান্যূন জাতিদিগের উপর অনেক অত্যাচার হয়। বল্‌শেভিকেরা কিন্তু প্রথম হইতে ইহাদের স্বায়ত্ত-শাসন সমর্থন করে। বিপ্লবের পর সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া নূতন নূতন যে স্বাধীন রাজ্যগুলির উদ্ভব হইল, তাহাদের অনেকের সহিত বল্‌শেভিকেরা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। ঘটনাচক্রে যে সমস্ত রাজ্যে সাম্যবাদীদিগের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল তাহারা ১৯২৩ সালে এক বিরাট সংহত রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিল।



সাতটি ভিন্ন ভিন্ন সোভিয়েট্ সাধারণতন্ত্র একত্র হইয়া যুক্তরাষ্ট্রটি গঠন করে। ইহাদের মধ্যেও আবার অনেকগুলির ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বায়ত্ত-শাসিত খণ্ডরাজ্য আছে। এক রাশিয়ার মধ্যেই তেইশটি প্রদেশ এইভাবে আত্মশাসিত।

ফেডারেশন্ হওয়া সত্ত্বেও কার্য্যতঃ সোভিয়েট্ যুক্তরাষ্ট্রটি একই রাজ্য। একই বিরাট্ দলে সন্নিবিষ্ট সাম্যপন্থীগণ ইহার প্রতি অংশে প্রভুত্ব করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার নামোল্লেখ না থাকিলেও অর্থ ও

সামরিক সাম্যতন্ত্রের যুগে ইহাদের মতকেই লেনিন্ সময়োপযোগী মনে করিলেন। নেপের আমলে চরমপন্থীরা আবার অসন্তুষ্ট হইল।

১৯২৩ সালে লেনিনের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও ১৯২৪-এর জানুয়ারীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার সহকর্ম্মিদিগের মধ্যে ট্রট্স্কি বহির্জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইলেও নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত হইলেন না। ট্রট্স্কি বল্শেভিকদলে নবাগত—১৯১৭ সালের পূর্ব্বে তিনি মেন্শেভিক্ ছিলেন বলিয়া প্রবীণ বল্শেভিকেরা তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না। লেনিনের তিরোধানে রাইকভ্ প্রধান অমাত্যের পদে নিযুক্ত হইলেন কিন্তু বস্তুতঃ নেতৃত্ব রহিল অন্য তিন জনের হাতে—সাম্যবাদীদলের কর্ম্মসচিব ষ্টালিন্, লেনিন্গ্রাড্ সোভিয়েট্ ও তৃতীয় সার্ব্বভৌমিক শ্রমিক-সঙ্ঘের সভাপতি জিনোভিয়েভ্, এবং মস্কো সোভিয়েটের অধ্যক্ষ কামেনেভ্। ইহারাই এই সময়ে ত্রয়ী নামে সুপরিচিত ছিলেন। ট্রট্স্কির সহিত ইহাদের বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল।

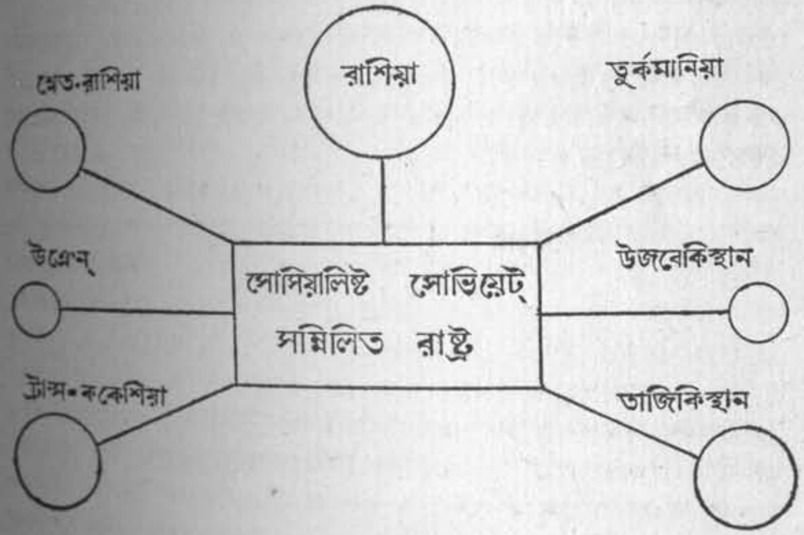
১৯২৬ সালে অকস্মাৎ জিনোভিয়েভ্ ও কামেনেভ্ পূর্ব্ববৈরী ট্রট্স্কির সহিত যোগ দিয়া ষ্টালিনের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করেন। দুই বৎসর ধরিয়া এই দ্বন্দ্ব চলে। ট্রট্স্কির মতে বল্শেভিক্ নীতি বিশ্ববিপ্লবের আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া সংকীর্ণ জাতীয়তায় পর্য্যবসিত হইতেছিল। কেবল একটি দেশকে অবলম্বন করিয়া সোসিয়ালিষ্ট সমাজ গড়িয়া তোলা স্বপ্নমাত্র। রাশিয়ার কৃষকদিগের প্রতি যে-অন্যায় যত্ন অতি-মাত্রায় দেখানো হইতেছিল তাহা ধনতন্ত্রের প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাস। ফরাসী-বিপ্লবের সময় থার্ম্মিডর্-যুগে যে ভাবে বিপ্লবের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছিল, ষ্টালিনের নেতৃত্বে তাহাই যেন রাশিয়ায় পুনরভিনীত হইতেছে। কিন্তু ষ্টালিন্ ও তাঁহার সমর্থক সাম্যবাদীদলের অধিকাংশের মতে এই অভিযোগগুলি অমূলক; অন্যদেশে বিপ্লব না ঘটিলেও রাশিয়াতে সোসিয়ালিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর। ১৯২৭ সালে ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ্, কামেনেভ্, রাডেক্, রাকভ্‌স্কি প্রভৃতি সুবিখ্যাত নেতাগণ সাম্যবাদীদল হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। অন্য সকলে অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্রমে ক্রমে দলে ফিরিয়া আসেন কিন্তু নিজ মতে অবিচলিত থাকার দোষে ট্রট্স্কির নির্ব্বাসনদণ্ড হয় (১৯২৯)।

চরমপন্থীদিগের পতনের পর অন্য এক মতের সহিত ষ্টালিনের সঙ্ঘর্ষ হইল। অচিরে সোসিয়ালিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া, বুকারিন, টম্স্কি, রাইকভ্ প্রভৃতি নেতারা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অবস্থাপন্ন কৃষকদিগকে অধিক উৎসাহদানের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। কিন্তু এবারেও দলের অধিকাংশের পৃষ্ঠপোষণে ষ্টালিনেরই জয় হইল

(১৯২৮)। বিপ্লবের পর লেনিন্ যেমন সাম্যবাদীদলকে মধ্যপন্থায় চালিত করিয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে, ষ্টালিন্ও ঠিক সেই ভাবে নেতৃত্ব করিতে সমর্থ।

৯

রাশিয়ায় বিভিন্ন জাতির বসবাস। সম্রাট্দিগের যুগে সংখ্যান্যূন জাতিদিগের উপর অনেক অত্যাচার হয়। বল্শেভিকেরা কিন্তু প্রথম হইতে ইহাদের স্বায়ত্ত-শাসন সমর্থন করে। বিপ্লবের পর সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া নূতন নূতন যে স্বাধীন রাজ্যগুলির উদ্ভব হইল, তাহাদের অনেকের সহিত বল্শেভিকেরা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। ঘটনাচক্রে যে সমস্ত রাজ্যে সাম্যবাদীদিগের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল তাহারা ১৯২৩ সালে এক বিরাট সংহত রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিল।



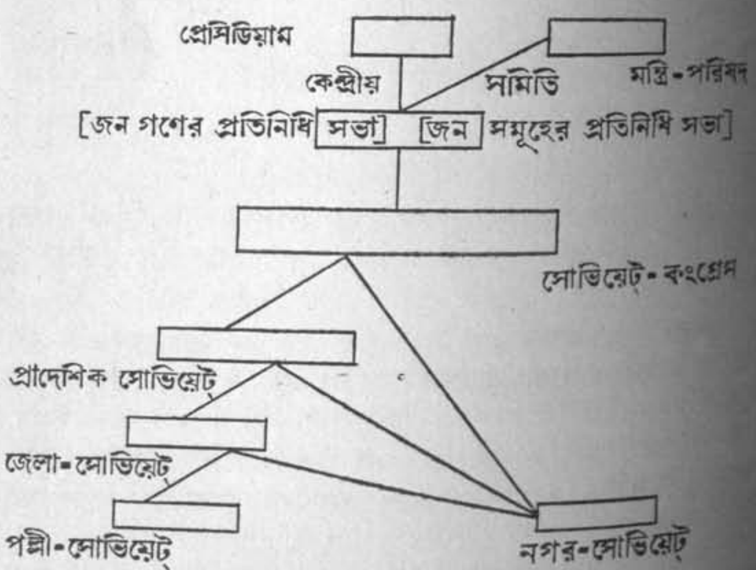
সাতটি ভিন্ন ভিন্ন সোভিয়েট্ সাধারণতন্ত্র একত্র হইয়া যুক্তরাষ্ট্রটি গঠন করে। ইহাদের মধ্যেও আবার অনেকগুলির ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বায়ত্ত-শাসিত খণ্ডরাজ্য আছে। এক রাশিয়ার মধ্যেই তেইশটি প্রদেশ এইভাবে আত্মশাসিত।

ফেডারেশন্ হওয়া সত্ত্বেও কার্য্যতঃ সোভিয়েট্ যুক্তরাষ্ট্রটি একই রাজ্য। একই বিরাট্ দলে সন্নিবিষ্ট সাম্যপন্থীগণ ইহার প্রতি অংশে প্রভুত্ব করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার নামোল্লেখ না থাকিলেও অর্থ ও

জনবলে রাশিয়া অন্য ছয়টি রাজ্যের দ্বিগুণ। ভবিষ্যতে অন্য দেশও এই রাষ্ট্রে যোগ দিতে পারে এই আশাতে সম্ভবতঃ এরূপ নামকরণ হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে রাশিয়ার প্রভাব জার্ম্মানীর সহিত প্রাশিয়ার সম্বন্ধের অনুরূপ। যুদ্ধ, বিদেশী বাণিজ্য, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি ব্যাপারে ফেডারেশনের অন্তর্ব্বর্ত্তী সাধারণতন্ত্রগুলির কোনপ্রকার স্বাধীনতা নাই, ইহাও মনে রাখিতে হইবে।

সোভিয়েট্ শাসন-পদ্ধতি এই যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। নগরে নগরে ও পল্লীসমূহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোভিয়েট্ বা সমিতি আছে। তাহাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত সোভিয়েট্ কংগ্রেসের হাতে দেশশাসনের ভার। এই কংগ্রেসের অধিবেশন সাধারণতঃ দুই বৎসরে একবার হয়।

সোভিয়েট্ কংগ্রেস্ একটি কেন্দ্রীয় সমিতি নির্ব্বাচন করিয়া তাহার হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে। ইহার একটি শাখা সম্মিলিত রাষ্ট্রের জনসংখ্যার অনুপাতে গঠিত—অন্যটি বিভিন্ন জাতি-সমূহের প্রতিনিধির সমষ্টি। কেন্দ্রীয় সমিতি হইতে প্রেসিডিয়াম্ বা ক্ষুদ্র একটি চালক-সমিতি গঠিত হয়—ব্যবস্থাবিধির সকল ভার বৎসরের অধিকাংশ সময়েই ইহার হস্তে ন্যস্ত থাকে। শাসন কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সমিতি অন্য একটি মন্ত্রিপরিষদও নিযুক্ত করে।



নির্ব্বাচন প্রথা সম্বন্ধে পৃথক্ আলোচনা প্রয়োজন।

১০

সোভিয়েট্-তন্ত্রে সকলের ভোট্ দিবার অধিকার নাই, একথা সত্য। যাহারা মজুর খাটায়, সুদভোগ যাহাদের জীবিকা, যাহাদের স্বাধীন কারবার আছে, পৌরহিত্য যাহাদের ব্যবসায়—এই সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা রাশিয়াতে ভোট্ দিতে পারে না। জগতের প্রায় সকল দেশেই কোন না কোন শ্রেণীর লোক ভোট্ হইতে বঞ্চিত। সোভিয়েট্ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, জনসাধারণের ভোটে অধিকার আছে অথচ ধনীদিগের নাই।

রাশিয়াতে আইনতঃ সাম্যবাদী ভিন্ন অন্যদলের কোনো অস্তিত্ব নাই। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে জনসাধারণকে দলের উদ্দেশ্য ও মতামত বুঝাইবার জন্য স্থানীয় বলশেভিকদলের নির্ব্বাচন-সমিতি-সমূহ সভা আহ্বান করে। ভোটারের তালিকা প্রস্তুত করিবার ভারও তাহাদের উপর। গুপ্ত-নির্ব্বাচন প্রথা না থাকায় সাম্যবাদী বা নিরপেক্ষ (non-party) ব্যতীত কাহারও নির্ব্বাচনের সম্ভাবনা নাই।

পল্লীগ্রামে অধিবাসীরা সমবেত হইয়া পল্লী-সোভিয়েট্ গঠন করে। বিভিন্ন কারখানা, বিবিধ কর্ম্মস্থল ইত্যাদিই নগরগুলির নির্ব্বাচন-কেন্দ্র, ইহার সহিত নগরের পল্লী-বিভাগের কোনো সম্বন্ধ নাই।

প্রতি জেলার অন্তর্গত গ্রামের ও নগর-সোভিয়েট্গুলির প্রতিনিধি লইয়া এক-একটি জেলা-সোভিয়েট্ গঠিত হয়। প্রাদেশিক সোভিয়েটে কিন্তু শুধু জেলা-সোভিয়েটের প্রতিনিধি থাকে না, নগর-সোভিয়েট্গুলি হইতেও কতকগুলি প্রতিনিধি সেখানে আসে। এইরূপে আবার সোভিয়েট্ কংগ্রেস্ গঠনের সময়েও, প্রাদেশিক সোভিয়েটের প্রতিনিধি আসিবার সঙ্গে সঙ্গে নগরগুলির তৃতীয়বার নির্ব্বাচনের অধিকার রহিয়াছে।

সোভিয়েট্ কংগ্রেস্ নির্ব্বাচনের সময়, নগর সমুদয় হইতে প্রতি ২৫,০০০ নির্ব্বাচক একজন প্রতিনিধি পাঠায় কিন্তু প্রাদেশিক সোভিয়েট্ হইতে ১,২৫,০০০ অধিবাসীর জন্য একজন প্রতিনিধি মাত্র আসিতে পারে।

কৃষকদিগের প্রভাব কমাইবার এই দুই উপায়ের অর্থ এই যে, রাশিয়াতে কৃষকদের সংখ্যা শ্রমিকদিগের অপেক্ষা অনেক বেশী অথচ সাম্যবাদে কৃষকশ্রেণীর উৎসাহ নাই। নগরবাসী শ্রমিকেরা উন্নতির সহায়, গ্রামের কৃষকেরা তাহার পরিপন্থী—এই বিশ্বাসে, শ্রমিক-কর্ত্তৃত্ব অটুট রাখিবার অভিপ্রায়ে, নির্ব্বাচন-পদ্ধতিতে তাহাদের অতিরিক্ত অধিকারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৯২১ সালে সামরিক সাম্যতন্ত্রের অবসানের সময় সকলে ভাবিয়াছিল যে, রাশিয়াতে সমষ্টিবাদ ব্যর্থ হইল। ১৯২৮ সালে চরমপন্থী

ট্রট্স্কির পরাজয়ের সময় সেই সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু সেই বৎসরেই ভবিষ্যদ্বক্তাদের অপ্রস্তুত করিয়া বল্‌শেভিকেরা নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে।

এই নূতন নীতির নাম পঞ্চবার্ষিক সংকল্প। ১৯২৮-এর অক্টোবর হইতে ১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচবৎসর কালব্যাপী এক বিপুল প্রচেষ্টার আরম্ভ রাশিয়ার ইতিহাসে এক নূতন পরিচ্ছেদের প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

ট্রট্স্কি-আন্দোলনের মূল কথা ছিল, দুইটি বিশ্ববিপ্লব ব্যতীত রাশিয়ার নূতন সমাজ গঠনের আশা স্বল্পমাত্র; এবং অবস্থাপন্ন কৃষক বা 'কুলাক্'-দিগকে অযথা আদর দিয়া রাশিয়াতে সাম্যতন্ত্রের পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করা উচিত নহে। প্রথম মতের যাথার্থ্য ষ্টালিন্ স্বীকার করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যাটির সমাধান আরম্ভ হইয়াছে।

নূতন ব্যবস্থার একটি সংকল্প এই যে, নানা উপায়ে একত্রিত কৃষিপদ্ধতির প্রচার করিতে হইবে। কোন কোন অঞ্চলে প্রথম হইতে ষ্টেট্-পরিচালিত কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থা ছিল। এখন কৃষকেরা যাহাতে সমবেত কৃষিকার্য্যে যোগ দেয় তাহার বিধিমত চেষ্টা চলিতেছে। জমি ভাড়া লইবার স্বাধীনতা থাকায় রাশিয়াতে 'কুলাক্' শ্রেণী আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন নানা প্রকারে তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস করাই শাসকদিগের উদ্দেশ্য।

উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বহুলভাবে বৃদ্ধি নব-পদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। দেশব্যাপী সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার ফলে এই অল্প সময়ের মধ্যেই উৎপাদিকা শক্তি প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বল্‌শেভিক্‌দের আশা আছে যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির সমান হইয়া দাঁড়াইবে।

বিদেশ হইতে ঋণ পাওয়ার উপায় নাই বলিয়া এই প্রয়াসের মধ্যে রাশিয়ার অধিবাসীদিগকে অনেক ত্যাগস্বীকার করিয়া সংকল্প সাধনের অর্থ জোগাইতে হইতেছে। শ্রমিকদিগের তাহাতে অসন্তোষ নাই, কেননা তাহাদের স্বার্থের জন্যই এই উদ্যম।

বল্‌শেভিক্‌বাদের সমালোচকেরাও স্বীকার করিবেন যে, জনসাধারণের উন্নতির জন্য এইরূপ পরিশ্রম ও চেষ্টা পৃথিবীর ইতিহাসে নিতান্ত বিরল।

শ্রীসুশোভন সরকার

বৌদ্ধধর্ম্মের দান

(২)

বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র

যে-বিপুল বৌদ্ধসাহিত্যের পরিচয় দিয়েছি তা'র তুলনামূলক আলোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে, বুদ্ধের নিজের ধর্ম্মমত পরবর্ত্তীকালে নানা সম্প্রদায়ের হাতে বিভিন্ন রূপ নিয়েছিল। যে কোন শক্তিশালী ধর্ম্মমতের ক্রম-বিকাশে কেউ বাধা দিতে পারে না। বুদ্ধের ধর্ম্মমত সঙ্কীর্ণ ছিল না—সেইজন্যই বহু শতাব্দী ধ'রে সে-ধর্ম্মমত প্রসারলাভ করেছিল। প্রতিভাবান বৌদ্ধ আচার্য্যদের যুক্তিতর্কপূর্ণ ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে সে-ধর্ম্মমত নিত্য নূতন ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালের এই পল্লবিত বৌদ্ধধর্ম্ম বিচার করবার পূর্ব্বে আমরা বুদ্ধের নিজের ধর্ম্মমতের আভাস দেবার চেষ্টা করব।

বুদ্ধ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড মান্‌তেন না সত্য—কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নষ্ট করাই যে তাঁর ধর্ম্মের একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল এমন কথা বলা চলে না। কেউ কেউ বুদ্ধকে সোসিয়ালিষ্ট্ আখ্যা দিয়েছেন, কেউ বা প্রমাণ কর্‌তে চেষ্টা করেছেন যে, বুদ্ধ বর্ণবিভাগ ভেঙ্গে দিয়ে ব্রাহ্মণের প্রভাব খর্ব্ব করেছিলেন, আবার অনেকে দেখিয়েছেন যে, তিনি ছিলেন পতিতপাবন, কারণ তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই নীচজাতীয়। এ-সকল মতের কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ সোসিয়ালিষ্ট্ বা 'পতিতপাবন' কিছুই ছিলেন না। কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের সামাজিক অবস্থার উন্নতিবিধান তাঁর ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ছিল না—মানুষের ব্যক্তিগত মুক্তির পথ খুঁজে বে'র করবার জন্যই তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। দীর্ঘ সাধনায় সে-পথের সন্ধান পেয়ে দশজনকে সেই পথে চালিত করবার চেষ্টাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়েছিল। এই মুক্তিমার্গ হচ্ছে গৃহত্যাগী ভিক্ষুর মার্গ—কোন বিশিষ্ট বর্ণের নিজস্ব নয়। বস্তুতঃ এই মার্গ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বানপ্রস্থ ও যতিরই রূপান্তর। এই বানপ্রস্থকেই বুদ্ধ সার্ব্বজনীন করতে চেষ্টা করেছিলেন। বানপ্রস্থধর্ম্মে জাতি বা বর্ণ বিচার নেই—তাই বুদ্ধের ধর্ম্মেও তা' নেই।

বুদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রভাব খর্ব্ব করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন এমন কথাও ঠিক নয়। বৌদ্ধধর্ম্মের সব চেয়ে প্রাচীন বইতে ব্রাহ্মণের প্রশংসাই রয়েছে। অবশ্য এ ব্রাহ্মণ সত্যকার ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করলেই এ ব্রাহ্মণ হয় না। উপনিষদের ব্রহ্মদ্রষ্টা ব্রাহ্মণই এই ব্রাহ্মণ। ধর্ম্মপদে বুদ্ধ বলছেন—সূর্য্য যেরূপ দিনে, চন্দ্র রাত্রে, ও রাজা সেনানী

পরিবেষ্টিত হ'য়ে প্রদীপ্ত হ'ন, ব্রাহ্মণ সেইরূপ ধ্যান বলে [illegible] যিনি পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, যাঁর অন্তর ও বাইরের ইন্দ্রিয় [illegible] যাঁর আত্মপর জ্ঞান নষ্ট হ'য়ে সমদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে, যিনি [illegible] সংযোগ বা আসক্তিশূন্য তিনিই ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণকে প্রহার [illegible] তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহারকে বুদ্ধ গর্হিত কাজ মনে করেছেন।

বুদ্ধ যে ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা'কে কতকগুলি [illegible] কানুন মেনে চল্‌তে হ'ত। পরিধেয় বস্ত্র, পান ভোজন, ভিক্ষাগ্রহণ [illegible] বাইরের ব্যাপারে ভিক্ষুর নিজের স্বাধীনতা ছিল না। [illegible] বিনয়-ব্যবহারের দ্বারাই এগুলি নিয়ন্ত্রিত হ'ত। এই বিনয়-ব্যবহার বিধিবদ্ধ করতে গিয়ে পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধ-সাহিত্যে বিপুল বিনয়-[illegible] সৃষ্টি। কিন্তু এই বিনয়ের মূলসূত্রগুলি বৌদ্ধধর্ম্ম বা বুদ্ধের [illegible] মনে করা অসঙ্গত হবে। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ [illegible] বিধিগুলির ওপরই বৌদ্ধ-বিনয়-ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মচর্য্য পালন [illegible] সত্য কথা বলা, অহিংসা, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ প্রভৃতি ব্রত [illegible] উভয় ধর্ম্মেরই মূলসূত্র। নির্দ্দিষ্ট সময়ে লব্ধ ভিক্ষায় দেহপোষণ [illegible] সকল প্রাণীর ওপর সমদৃষ্টি, অধ্যয়ন ও ধ্যান-ধারণায় সময় [illegible] ক'রে মুক্তিকামনা বৌদ্ধভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক উভয়েরই লক্ষ্য। [illegible] বাইরের আচার ব্যবহারের দিক্ দিয়ে যে বুদ্ধের 'ধর্ম্মের একটা [illegible] ছিল এ-কথা মনে করবার কারণ নেই। অনেকে এই সব ভ্রান্ত [illegible] পল্লবিত ক'রে বল্‌তে চেয়েছেন যে, বুদ্ধের সময়ে উত্তর ভারতে [illegible] (কল্পিত?) গণতন্ত্র বা রিপাব্লিক ছিল বুদ্ধ তা'রই আদর্শে নিজের [illegible] তৈরী করেছিলেন—অর্থাৎ বুদ্ধের স্থাপিত বৌদ্ধসঙ্ঘও নাকি ক্ষুদ্র [illegible] এ-কথাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ভিক্ষু হচ্ছে মুক্তিকামী বা মুক্ত। [illegible] গুরু ব্যতীত আর কোন ব্যক্তির আদেশ তা'কে মান্‌তে হয় না। [illegible] জীবদ্দশায় এই গুরু ছিলেন বুদ্ধ—পরবর্ত্তীকালে সঙ্ঘনায়কেরা। [illegible] নিজে কা'রো নির্ব্বাচনের অপেক্ষা করেন নি। সঙ্ঘনায়কেরা [illegible] হ'তেন ভোটে নয়—অধ্যাত্ম-সাধনায় যে উৎকর্ষলাভ করতেন তা'রই [illegible]

তাহ'লে প্রশ্ন উঠ্‌বে, বুদ্ধের ধর্ম্মে বৈশিষ্ট্য কোথায়? এ-বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হবে বুদ্ধের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বা দর্শনে। গল্পের কথায় [illegible] গেলে বুদ্ধ মানুষের জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু দেখেই প্রথম দুঃখে অভিভূত হ'ন। সেই সার্ব্বজনীন দুঃখের কারণ ও উপশমের উপায় নির্দ্ধারণ করবার [illegible] গৃহত্যাগ করেন। দ্বাদশ বৎসর সাধনার পর তিনি যে বোধিজ্ঞান [illegible] অন্তর্দৃষ্টি লাভ কর্‌লেন—তা'তেই জগতের সকল রহস্য তাঁর [illegible] উদ্ভাসিত হ'ল ও তিনি দুঃখের কারণ ও তা'র উপশমের উপায় নির্দ্ধারণ

করতে সমর্থ হলেন। এই দুঃখবাদ আলোচনা কর্‌বার পূর্ব্বে জগতের অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে বুদ্ধ কি ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন দেখা যাক্।

উপনিষদের শিক্ষার সার মর্ম্ম হচ্ছে—ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা। প্রকৃতি বা দৃশ্যমান জগৎ ও জীবের পেছনে কোন আত্যন্তিক সত্য নেই—জীব ও প্রকৃতি শুধু প্রতিভাস মাত্র—কল্পলোকের সৃষ্টি। আত্যন্তিক সত্য হচ্ছে—ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মেই জীবাত্মার একমাত্র অস্তিত্ব। বুদ্ধ এই অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রথমটা মান্‌লেন—কিন্তু দ্বিতীয় অংশটা বর্জ্জন কর্‌লেন। বুদ্ধের দর্শনেও জীব ও প্রকৃতি বা জগৎ প্রতিভাসমাত্র। কল্পলোকের 'অনিত্য' বা অস্থায়ী রচনা। বুদ্ধের ভাষায়—জীব ও জগৎ কতকগুলি 'ধর্ম্ম' ও 'সংস্কারের' প্রবাহমাত্র। এখানে ধর্ম্ম ও সংস্কার বিশেষ অর্থে বুঝ্‌তে হ'বে। ধর্ম্মের ধাতুগত অর্থ হচ্ছে—'যা' ধারণ করে' আর সংস্কারের অর্থ হচ্ছে—'যাদের একসঙ্গে (সমীকৃত) করা যায়'।

তাই ধর্ম্মের অনুবাদ করা হয়েছে formation বা presentation এবং সংস্কারের অনুবাদ হয়েছে—mental aggregate বা coefficient। মানুষের পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্জ্জগতের যে সতত সংযোগ, তা'তেই বহির্জ্জগত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাই এই সংযোগ বাদ দিলে বহির্জ্জগতের কোন অস্তিত্ব থাকে না। সংযোগ নিত্য নয়—প্রতিমুহূর্ত্তে সেই সংযোগেরও পরিবর্ত্তন হচ্ছে। প্রতিমুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়ের এই গ্রহণ কর্‌বার ব্যাপারকেই ধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই ধর্ম্ম অনিত্য ও বিনাশশীল। প্রথম মুহূর্ত্তে যে ধর্ম্ম উৎপন্ন হচ্ছে, তার বিনাশ হ'য়ে পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে অন্য ধর্ম্মের উৎপত্তি সাধিত হচ্ছে। নানা মুহূর্ত্তের ধর্ম্মের সমীকরণ ক'রে যে কল্পলোক সৃষ্ট হচ্ছে তাই হ'ল সংস্কার। সুতরাং এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম ও সংস্কারের প্রবাহেই বহির্জ্জগতের অস্তিত্ব। অন্য সত্তা তা'র নেই। তাই বুদ্ধ বল্‌লেন—"সর্ব্বম্ অনিত্যম্ সর্ব্বম্ শূন্যম্"—সমস্তই অনিত্য ও শূন্য অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা। উপনিষদের শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধের মতের ঐক্য এই পর্য্যন্ত—জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ব্রহ্ম—এ সবের অস্তিত্ব বুদ্ধ মানেন নি। জীবাত্মাই যদি না থাক্‌লো তবে 'আমি' কোথায়—কে এই মিথ্যা জগতের রচনা কর্‌ছে?

এই কথাই দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক রাজা মিলিন্দ (Menander) বৌদ্ধআচার্য্য নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

মিলিন্দ নাগসেনের নাম জিজ্ঞাসা কর্‌তে নাগসেন তা'র উত্তরে বল্‌লেন—লোকে তাঁকে নাগসেন বলে। বস্তুতঃ সেটা ব্যবহারিক সংজ্ঞা মাত্র—তা'তে কোন 'পুদ্গল' বা জীবাত্মা বুঝায় না। তা'তে মিলিন্দ বল্‌লেন—এ-কথা যদি সত্য হয় তাহ'লে কে তাঁর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কে তাঁকে

পাত্র চীবর শয়নাসন ও ভিক্ষা দিচ্ছে—কেই বা সংঘের নিয়ম প্রতিপালন ক'রে সাধনায় রত হচ্ছে ও নির্ব্বাণলাভ করছে। একথা সত্য হ'লে পাপ পুণ্য থাক্‌ছে না—পুণ্য কাজও কেউ করছে না, লোককে পীড়নও কেউ করছে না। নাগসেন যখন সংজ্ঞা মাত্র তখন সত্যকার নাগসেন কে? লোম, নখ, মাংস, দন্ত প্রভৃতি নাগসেন নয়, 'রূপ' নাগসেন নয়, 'বেদনা' নাগসেন নয়, 'সংজ্ঞা বিজ্ঞান সংস্কার' প্রভৃতিও নাগসেন নয়—তাহ'লে নাগসেন নেই! তা'র উত্তরে নাগসেন বল্‌লেন—মহারাজ, আপনি রথে চ'ড়ে এসেছেন—রথ কি? চক্রকে রথ বল্‌বেন কি? যুগকাষ্ঠকে রথ বল্‌বেন কি? বা দণ্ড, রশ্মি, প্রতোলী প্রভৃতিকে রথ বলবেন কি? এ গুলি যখন রথ নয় তখন রথ নেই—আপনি রথে চড়ে এসেছেন, এ মিথ্যা কথা।

উভয়ে শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লেন যে—চক্র, দণ্ড, রশ্মি প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে যা'কে 'রথ' এই ব্যাবহারিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা'কেই রথ বলা হয়। সেইরূপ লোম নখ মাংস প্রভৃতি ও 'রূপ বেদনা সংস্কার সংজ্ঞা বিজ্ঞান' প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে নাগসেন এই ব্যাবহারিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—ইহা নাম মাত্র। পারমার্থিক হিসাবে দেখ্‌লে নাগসেন ব'লে কোন পুদ্গল বা জীবাত্মা নেই। আছে শুধু নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বিজ্ঞান বা চিৎশক্তির প্রবাহ। এই বিজ্ঞান-সন্তান বা বিজ্ঞান প্রবাহেই জীবের বৈশিষ্ট্য বা আমিত্ব নিবদ্ধ। এই বৈশিষ্ট্য যতক্ষণ থাক্‌ছে যতক্ষণ 'ধর্ম্ম' ও 'সংস্কারের' উৎপত্তি ও লয় অর্থাৎ মিথ্যা জগতের রচনা চল্‌ছে ততক্ষণই 'দুঃখের' অনুভূতি হচ্ছে।

জগতের অন্তর্নিহিত রহস্য সম্বন্ধে বুদ্ধ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন বলেই প্রথমে তাঁর দুঃখবাদ প্রচার করেন। এই দুঃখবাদকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভাষায় আর্য্যসত্য (চত্বারি আর্য্যসত্যানি) বলা হয়। এই চারটি সত্য হচ্ছে দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ, দুঃখ-নিরোধের উপায়। এই সত্যই হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলসূত্র। সাধনায় বুদ্ধ যে জ্ঞান-দৃষ্টি লাভ করলেন তা'তে দেখতে পেলেন যে, জগৎ দুঃখময়, এই দুঃখের সমুদয় বা উৎপত্তির নির্দ্ধারণ ক'রে সেই সব হেতুকে নষ্ট কর্‌বার উপায়ও তাঁকে বের করতে হ'ল। সত্যকথা বল্‌তে গেলে এই বিশ্লেষণ প্রণালী বুদ্ধের নিজের নয়। এ হচ্ছে চিকিৎসা শাস্ত্রের চিরন্তন প্রথা—যোগ শাস্ত্রেও এই প্রণালী অবলম্বন করা হয়েছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলসূত্র হচ্ছে রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও ভৈষজ্য। চিকিৎসক রোগ দেখে প্রথমে তা'র হেতু নির্দ্ধারণ করেন, আরোগ্যের আবশ্যকতা অনুভব করেন ও আরোগ্যের একমাত্র উপায় ভৈষজ্য প্রয়োগ করেন। যোগশাস্ত্রেরও মূলসূত্র হচ্ছে সংসার, সংসারহেতু, মোক্ষ

ও মোক্ষোপায়। জীব দুঃখবহুল সংসারে পতিত, তার কারণ হচ্ছে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ, সেই সংযোগের নিবৃত্তিতেই মোক্ষ; মোক্ষের উপায় হচ্ছে সম্যক্ অধ্যাত্ম দৃষ্টিলাভ করা। বুদ্ধও তাই দুঃখ, দুঃখহেতু, দুঃখ নিরোধ ও নিরোধোপায় স্থির করাই তাঁর নূতন ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করলেন।

[যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহম্ঃ রোগো রোগহেতুরারোগ্যম্ ভৈষজ্যমিতি এবমিদমপি শাস্ত্রম্ চতুর্ব্যূহমেব, তদ্যথা সংসারঃ, সংসারহেতুর্মোক্ষো মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ, প্রধান পুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানম্ হানোপায়ঃ সম্যগদর্শনম্।]

তাঁর মতে জগৎ দুঃখময়। এই দুঃখ আট প্রকারের—জন্ম, ব্যাধি, জরা, মরণ, প্রিয়-বিপ্রয়োগ, অপ্রিয়-সম্প্রয়োগ, ঈপ্সিত বস্তুর অলাভ ও পঞ্চ উপাদান বা পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু। জীবমাত্রেই এই আট প্রকারের দুঃখে অভিভূত, প্রত্যেকেরই জন্ম, ব্যাধি, জরা, মরণ আছে, প্রত্যেককেই প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ভোগ কর্‌তে ও অপ্রিয়জনের সংস্পর্শেও আস্‌তে হয়। নিজের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সব সময় সে পায় না। পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বস্তুও সব দুঃখজনক।

এই দুঃখের সমুদয় বা উৎপত্তি কোথায়? দুঃখের উৎপত্তি আলোচনা কর্‌তে গিয়ে বুদ্ধ কতকগুলি কার্য্য-কারণের পরম্পরা নির্দ্ধারণ করেছেন—তা'কে বৌদ্ধধর্ম্মের ভাষায় বলা হয় 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'। এর ধাতুগত অর্থ হচ্ছে একের অবলম্বনে অন্যের উৎপত্তি,—সেই জন্য প্রতীত্যসমুৎপাদের অনুবাদ হয়েছে chain of dependant causation। প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রতীত্যসমুৎপাদের ব্যাখা করা হয়েছে—অস্মিন্ সতীদং ভবতি, অস্যোৎপাদাৎ ইদমুৎপদ্যতে—অর্থাৎ একটী কারণ ঘট্‌লে অন্যটী ঘটে, একের উৎপত্তি হ'লে অন্যের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধ দুঃখসমুদয়ের কারণ দেখিয়েছেন বারোটী—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরামরণ।

অবিদ্যা হচ্ছে, অন্তরের ও বাইরের অ-জ্ঞান। জগৎ দুঃখময়, সে দুঃখের স্বভাব, দুঃখের কারণ, দুঃখোৎপত্তির কারণকে বন্ধ করার আবশ্যকতা ও তা'র উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই হচ্ছে অবিদ্যা। কার্য্য-কারণের পারম্পর্য্য ও বহির্জগতের সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে যে সমস্ত ধর্ম্মের (formation) উৎপত্তি হচ্ছে তা' না জানাও অবিদ্যা।

এই অবিদ্যার থেকেই সংস্কারের উৎপত্তি হচ্ছে। বহির্জগতের সঙ্গে দেহ বাক্য ও মনের যে প্রথম সংযোগ স্থাপিত হয় তা'তেই সংস্কারের উৎপত্তি। এই সংস্কারের উৎপত্তির সঙ্গেই পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের কার্য্য আরম্ভ

হয় ও বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। যখনই প্রকৃতির সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের সম্পূর্ণ যোগ স্থাপিত হয় তখনই নামরূপের উৎপত্তি হয়। বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞানের সমষ্টিকেই 'নাম' ও চারটি মহাভূত (ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ) ও চতুর্মহাভূতাত্মক বস্তুকেই 'রূপ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই উভয়ের উৎপত্তিতেই পুদ্গল বা বিশিষ্ট জীবের উদ্ভব। এই নামরূপ উৎপন্ন হ'লেই জীবের ষড়ায়তন বা চক্ষু, কর্ণ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন প্রভৃতি ষড়েন্দ্রিয়ের আভ্যন্তরিক শক্তির বিকাশ হয়। যখন ইন্দ্রিয়গুলির এই আভ্যন্তরিক শক্তির বিকাশ হয় তখনই প্রথম বহির্জগতের সঙ্গে তাদের স্পর্শ বা সংযোগ সাধিত হয়। এই সংস্পর্শেই নানারূপ দুঃখ, অদুঃখ বা সুখময় 'বেদনা' বা অনুভূতির উৎপত্তি। সেই বেদনা বা অনুভূতিই হ'ল তৃষ্ণার কারণ। তৃষ্ণা তিন প্রকারের—কামতৃষ্ণা (sensual), রূপতৃষ্ণা (formal) ও অরূপ তৃষ্ণা, এই তৃষ্ণা থেকেই উপাদান বা গ্রহণ করবার আকাঙ্ক্ষা আসে। উপাদানই হচ্ছে 'ভব' বা জন্মগ্রহণ কর্‌বার আকাঙ্ক্ষার কারণ। এই কারণ ঘটলেই জীব 'জাতি' বা জন্মান্তর গ্রহণ করে ও জরামরণ প্রভৃতিতে অভিভূত হয়। সুতরাং জীবের এই দুঃখময় সংসার (transmigration) বা আসা-যাওয়ার মূলে রয়েছে এই কার্য্য-কারণের শৃঙ্খল। এই সব কারণের নিরোধ বা নিবৃত্তিতেই সকল দুঃখের অবসান।

দুঃখের এই হেতু নিরোধের উপায় হচ্ছে নির্ব্বাণ। এই নির্ব্বাণই বৌদ্ধসাধকের প্রধান কাম্য। তাই নির্ব্বাণের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করতে গিয়েই যত তর্কবিতর্কের অবতারণা ও নানা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ভিতর গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। নির্ব্বাণের ধাতুগত অর্থ সম্পূর্ণ নিবৃত্তি। নির্ব্বাণের এই অর্থ গ্রহণ করেই অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মকে দুঃখবাদ মনে করেছেন। সংসার যখন দুঃখময়, ইহজগতে বা পরজগতে যখন এমন কিছুই নেই যাকে অবলম্বন ক'রে মানুষ চিরানন্দ উপভোগ কর্‌তে পারে তখন এই দুঃখময় সংসার থেকে অব্যাহতি লাভ কর্‌বার একমাত্র উপায় দেহের বিনাশ বা নির্ব্বাপণ। কিন্তু নির্ব্বাণ যে তা' নয় সে কথা সব চেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ থেকেই বোঝা যায়। নির্ব্বাণ দেহের বিনাশে নয় প্রবৃত্তির বিনাশে। তাই ধর্ম্মপদে বুদ্ধ বল্‌ছেন—

"সারথি যেরূপ অশ্বকে দমন করে সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়কে শান্ত করেছেন—যিনি নিরভিমান ও কলুষহীন—দেবতারাও তাঁকে ঈর্ষ্যা করেন।"

"যিনি সম্যক্‌ব্রতধারী, শত্রুমিত্রে ও শুভাশুভে সমভাবাপন্ন, অনুরাগ ও বিরাগশূন্য তিনি পঙ্কহীন হ্রদের মত নির্ম্মল ও শান্ত। তাঁর সংসার বা আসা-যাওয়া নেই।"

এই সমভাব ও শান্তির অবস্থাই হচ্ছে নির্ব্বাণ। এ অবস্থা আনন্দের, নিরানন্দের নয়, তাই ধম্মপদে নিবৃত্ত বুদ্ধ বল্‌ছেন—

সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো।
বেরিনেসু মনুস্‌সেসু বিহরাম অবেরিনো॥
সুসুখং বত জীবাম আতুরেসু অনাতুরা।
আতুরেসু মনুস্‌সেসু বিহরাম অনাতুরা॥
সুসুখং বত জীবাম উস্‌সুকেসু অনুস্‌সকা।
উস্‌সুকেসু মনুস্‌সেসু বিহরাম অনুস্‌সুকা॥
সুসুখং বত জীবাম যেসং নো নত্থি কিঞ্চনং।
পীতিভক্কা ভবিস্‌সাম দেবা আভস্‌সরা যথা॥

"বৈরিগণের মধ্যে আমরা বৈরিহীন হ'য়ে সুখে জীবনযাপন করব, বিদ্বেষভাবাপন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে বিদ্বেষশূন্য হ'য়ে বিচরণ করব। আতুরগণের মধ্যে আমরা ক্লেশরহিত হ'য়ে সুখে জীবনযাপন করব ও বিচরণ করব। আসক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে আমরা অনাসক্ত হ'য়ে সুখে জীবনযাপন করব ও বিচরণ করব। আমাদের মধ্যে যা'দের কোন আসক্তি নেই তা'রা ভাস্বর দেবগণের ন্যায় প্রীতিভক্ষা বা আনন্দভাজ হ'য়ে সুখে জীবনযাপন কর্‌বে।"

সুঞ্ঞাগারং পবিট্ঠস্‌স সন্তচিত্তস্‌স ভিক্‌খুনো।
অমানুসী রতী হোতি সম্মাধম্মং বিপস্‌সতো॥

"যিনি শূন্যাগারে প্রবিষ্ট বা আসক্তিশূন্য হয়েছেন, যিনি শান্তচিত্ত, ও ধর্ম্মের প্রকৃতরূপ দেখ্‌তে পেয়েছেন সেই ভিক্ষু অমানুষী রতি বা দিব্য আনন্দ লাভ ক'রে থাকেন।

নির্ব্বাণ যে আনন্দময় সে সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাজা মিলিন্দও এই সন্দেহ করেছিলেন। রাজা মিলিন্দ ছিলেন গ্রীক্, তাঁর মনও সম্পূর্ণ গ্রীসীয় মন। তাই তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনকে বল্‌লেন—নাগসেন, আপনি যে বল্‌লেন নির্ব্বাণ সর্ব্বতোভাবে সুখময় তা' আমার মনে হয় না। নির্ব্বাণ নিশ্চয়ই দুঃখমিশ্রিত। তার কারণ আপনিই বলেছেন যে, যাঁরা নির্ব্বাণলাভ করেন তাঁরা দেহ ও চিত্ত ক্লেশময় উপলব্ধি করেন, বাসস্থান, শয়ন, আহার প্রভৃতি বর্জ্জন করেন, আয়তন বা ষড়েন্দ্রিয়ের আভ্যন্তরিক শক্তির বিনাশ করেন ও ধনধান্য এবং প্রিয়তম জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করেন। তা'ই যদি নির্ব্বাণের অবস্থা হয়, তাহ'লে আর নির্ব্বাণে আনন্দ কোথায়। জগতে সুখই যাঁদের কাম্য ও যাঁরা সত্যই সুখী তাঁরা আয়তনকে অবলম্বন করেই সুখভোগ করেন। রূপময় সৌন্দর্য্যকে চক্ষুদ্বারা, শব্দময় গীতিবাদ্যকে শ্রবণের দ্বারা, ফুলফল প্রভৃতি গন্ধময় দ্রব্যকে ঘ্রাণের দ্বারা, খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি সুমধুর দ্রব্যকে স্পর্শের দ্বারা শুভাশুভ—বিতর্ক ও মনসিকারের দ্বারা উপভোগ করেন। আর আপনারা চক্ষু শ্রবণ ঘ্রাণ জিহ্বা কায় ও মন প্রভৃতিকে হনন ক'রে, ছেদন ক'রে ও রোধ ক'রে সুখ ভোগ কর্‌তে চান—এতে দেহ ও চিত্তই শুধু পীড়িত

হয়, আনন্দলাভ হয় না। তাই আপনাদের নির্ব্বাণ যে দুঃখমিশ্রিত তাতে আর সন্দেহ কি।

এর উত্তরে নাগসেন বল্‌লেন—একথা ঠিক নয় মহারাজ, নির্ব্বাণ সর্ব্বতোভাবেই আনন্দময়। আপনি যা'কে নির্ব্বাণ মনে করেছেন সে শুধু নির্ব্বাণের পূর্ব্বভাগ, সেই অবস্থাতেই ভিক্ষু দেহ ও চিত্তকে ক্লেশময় উপলব্ধি করেন, ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও আয়তনের বিনাশ সাধন করেন, কিন্তু ঠিক নির্ব্বাণের অবস্থা তা' নয়। আপনি যে রাজ্যসুখ উপভোগ করেন—সে সুখকে দুঃখমিশ্রিত বলা ভুল হ'বে। এ কথা সত্য, আপনাকে প্রত্যন্ত রাজাদের দমন কর্‌তে হয়, মন্ত্রী অমাত্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে প্রবাস যাপন কর্‌তে হয়, ও রাজ্যপালনের জন্য আরও বহুবিধ ক্লেশভোগ করতে হয়, কিন্তু এ সব হচ্ছে রাজ্যসুখের পূর্ব্বাংশ মাত্র। এ সমস্ত কষ্টভোগ করবার পর আপনি রাজ্যসুখ উপভোগ করেন। সে সুখ তখন আর দুঃখমিশ্রিত নয়, নির্ব্বাণের অবস্থাও তেমনি দুঃখমিশ্রিত নয়, সর্ব্বতোভাবে আনন্দময়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

তিনরাত্রি

তর্ক তুমুল হইয়া উঠিয়াছে সতীত্ব লইয়া। বক্তারা সকলেই আধুনিক, অর্থাৎ তার্কিক, অর্থাৎ স্বল্প অভিজ্ঞতায় বড় বড় সিদ্ধান্ত গড়িয়া তুলিতে অতিমাত্রায় ব্যগ্র। বিষয়টীও মনোমদ, কারণ সতীত্ব কথাটা শুধু নারীর বেলায়ই প্রযোজ্য, পুরুষের নহে। তাই পুরুষের প্রতি নারীর মনোভাব কিরূপ হওয়া উচিত, তাহারই একটা পাকাপাকি মীমাংসা এই কয়জন যুবকে মিলিয়া স্থির করিতে চায়।

শাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইত্যাদির ঠেলায় মূল বক্তব্যটা ক্রমাগত পাক খাইয়া ফিরিতেছিল, এমন সময় শৈলেন সমস্ত তর্কের মোহ কাটাইয়া বলিয়া উঠিল—দেখ্‌ছি, তর্ক কোরে এর কোন শেষ পাওয়া যাচ্ছে না। সুবোধ কি একটা বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে দমাইয়া রাখিয়া শৈলেন বলিতে লাগিল—থামো তোমরা, আমার কথা এখনও শেষ হয় নি। আমি বল্‌তে চাই, আমার সতীত্বের আদর্শকে আমি কথার বাঁধনে বাঁধ্‌তে পার্‌ছি না বটে, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমার ভুল হয় না। যেমন মিষ্টতা কাকে বলে তা বর্ণনা কোরে বোঝান না গেলেও, কোনো জিনিস মিষ্টি কি-না, তা সহজেই ঠিক করা যায়।

সুবোধ বলিল,—তার মানে কি এই বুঝ্‌তে হবে যে, তোমাকে যদি কোন রমণীর কাহিনী শোনানো যায়, তাহ'লে তুমি তার ভালমন্দ বিচার কোরে দাম ঠিক কোরে দিতে পার?

শৈলেনের অসন্দিগ্ধ উত্তর আসিল,—হাঁ, পারি বৈকি!

রমেন বলিল—তাহ'লে আমি তোমাদের একটা গল্প বলি শোন।

পরেশ হাঁকিয়া কহিল—গল্প হ'লে হবে না, সত্যি হওয়া চাই।

শৈলেন বলিল—পরেশটা ত আচ্ছা নিরেট। আমার মত-পরীক্ষার জন্য সত্য উদাহরণের কি দরকার? অসম্ভব না হলেই হোল।

সুবোধ বলিল—তাছাড়া, নিছক সত্য অতি শুক্‌নো জিনিস। রমেন, তুই যা বল্‌তে চাচ্ছিস্, বল্, কিন্তু তা যদি গল্প না হয়, তাহ'লে কিন্তু মাঝপথে থামিয়ে দেব।

রমেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—কিন্তু আমি যা বল্‌তে চাচ্ছি, তা যদি বেশীর ভাগই সত্য হয়—

সুবোধ বলিল—আমি কি তোকে সত্যি বল্‌তে বারণ কর্‌ছি? আমি বল্‌ছি-কি, তোর গল্পে সত্যি থাকে থাক্ কিন্তু সেই সত্যকে কল্পনার জারক রসে জীর্ণ কোরে নিতে হবে। নইলে গল্প সরস হবে কেন? শুধু সত্যে ত কোন রস নেই; রস মানুষের কল্পনায়।

পরেশ বলিল—তাহ'লে গল্পটা কি সত্যিও হবে না, মিথ্যেও হবে না?

সুবোধ বলিল—এতক্ষণে তুই ঠিক বুঝেচিস্, পরেশ। যা গল্প, তা সত্যিও নয়, মিথ্যেও নয়; তা, সত্য-মিথ্যার অতীত এক স্বতন্ত্র ব্যাপার। তার নিয়ম-কানুন আলাদা, আর সে-জগতের একমাত্র দেবী,—সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী স্বয়ং।

শৈলেন অসহিষ্ণুভাবে কহিল—সুবোধ, তোর আর্ট-এর ব্যাখ্যা এখন রাখ্। রমেন, বল্ তোর গল্প বল্; কথা দিচ্ছি, আমি তোকে জিজ্ঞাসাও কোরব না, তোর গল্প সত্যি কি মিথ্যে।

রমেন আরম্ভ করিল—একটী ছেলে। ধর তার নাম, এক্স্। কল্‌কাতায় থাকে, কলেজে পড়ে। 'দেশ' একটা আছে, দোল-দুর্গোৎসবও হয়। কিন্তু তারা বড় যায় না। দেশের আত্মীয়দের হাতেই সব ভার। কিন্তু সে-বার পরীক্ষার বছর। দেবদ্বিজে ভক্তি দ্বিগুণিত হ'য়ে উঠল। তাই পূজোয় সে দেশে গেল, একাই।

দেশের বাড়ী আত্মীয়-স্বজনে ভরপূর। খুড়তুতো, জাঠতুতো, পিস্‌তুতো ইত্যাদি বৌদিই আট-দশ জন। কেউ বা তার মায়ের সমবয়সী; আবার কেউ কেউ সম্পর্কে বড় হ'লেও, বয়সে প্রায় কাছাকাছি ব'লে সামনে বেরোন না। অবশ্য এমন চার-পাঁচ জন ছিলেন যাদের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে রঙ্গ-রহস্য করা যায়।

এক্স্ প্রায় দেশে যায় না। এবার দিনকয়েকের জন্য গিয়েছে। কাজেই তাকে নিয়ে ছেলে ও মেয়েমহলেও বেশ একটু সোরগোল প'ড়ে গেল।

এক্স্-এর স্বভাবের একটা বিশেষত্ব এই যে, সে দলের মধ্যে মুখচোরা। অথচ যার সঙ্গে তার জ'মে যায় তার সঙ্গে কথার শেষ থাকেনা।

সে বেশ বুঝ্‌তে পারল, তার স্বভাবের এই রহস্যটী অন্ততঃ একজন ধরে ফেলেছে। সে তার এক পিস্‌তুতো বৌদিদি। ইনিও পূজা উপলক্ষে অতিথি। তবে ইনি একবার কল্‌কাতায় এদের বাড়ী বেড়িয়ে গেছেন। তাই আগে থেকেই পরিচয় ছিল।

বাড়ীভরা লোকজন, চারিদিকে হট্টগোল, কাজকর্ম্ম; অথচ তার মধ্যেই যে কেমন কোরে এই দুটি প্রাণী নিজেদের বিচ্ছিন্ন কোরে নিয়ে গল্পে মেতে যেতো, তা যদি তোমরা বুঝে নিতে না পার, ত কেউই বুঝিয়ে দিতে পারবে না।

বাড়ীর অন্যান্য বৌদিরা মাঝে মাঝে বলেন—কী, তোমার 'হাসি-বৌদি'কে পেয়ে যে আমাদের একেবারেই ভুলে গেলে!

সে একটু হেসে, একটু অপরাধী বোধ কোরে, বলে,—কি করি; আপনারা যা দুষ্প্রাপ্য। কাজ আর আপনাদের ফুরোতে চায় না।

একটু হিংসার সুরে একজন বল্লেন—ওর সঙ্গে কার কথা? কাচ্চা বাচ্চার বালাই ত নেই। ছোট্টবেলায় একটী হ'য়ে এখন বড় হ'য়ে গেছে। তা-ও আবার সে তোমার পিসীমারই কোল-ঘেঁসা। মাকে সে পোছেও না, মা-ও তার খবর রাখে না। কাজেই উনি বেশ পটের বিবিটী সেজে হেসেখেলে বেড়াতে পারেন। ঠাকুরপো, তুমি জহুরী ভাল; কি লাগসৈ নামই দিয়েছ—'হাসি-বৌদি', যেন ঠিক হাঁড়ির মুখে সরাখানি।

আর একটু সুর চড়িয়ে আর একজন ধরলেন—যার কপাল ভাল, তার কি সবই ভাল? কর্ত্তাটীও কেমন জুটেছে—যেন কল্‌কাতার রাস্তার জলের কল; টেপো—জল দিচ্ছি; না টেপো—চুপটী কোরে দাঁড়িয়ে আছি।

হাসি-বৌদি বল্‌লেন—লোভ হচ্ছে না কি, নতুনদি। চান্ ত লিখে প'ড়ে দান কোরে দিতে রাজী আছি।

নতুন-বৌদি রঙ্গ কোরে বল্লেন—লোভ যে হয় না, তা-নয়; তবে কি-না কাউকে বদল দিতে পারবো না; সে আমার সইবে না ভাই, তা সে আমার তিনি যতই মন্দই হোন্।

হাসি-বৌদি বল্‌লেন—জানিগো জানি, নতুন-ভাসুর তোমায় গুণ কোরেছেন। তা ভাই, আমিও বদল চাইনে। আর বদল নিতে গেলে বড়র দিকে ওঠার চাইতে ছোটর দিকে নামাই ভাল। কি বল, ঠাকুরপো?

সাধারণতঃ এ ধরণের রসিকতায় এক্স্ যোগদান কোর্‌তে পারে না, অনভ্যস্ত ব'লে। কিন্তু একেবারে যে খারাপ লাগে, তা বল্লে সত্যের অপলাপ করা হবে।

সে এবারে বল্লে—আপনি বুঝি সাক্ষী মানার আর কোন লোক পেলেন না?

হাসি-বৌদি বল্‌লেন—কোথায় আর পাবো? আমার দেবর বল্‌তেও তুমি, ননদ বল্‌তেও তুমি। ভেবে দেখ, তোমার দাদার তিন কুলে ছোট ভাই-বোন কেউ নেই, এক তুমি ছাড়া। তাই ত তোমাকে ক'দিন পেয়ে আশ মিটিয়ে নিতে চাচ্ছি। এঁদের ত অনেক আছে, তবু এদের সয় না কেন, বল ত?

নতুন-বৌদি বল্‌লেন—দেখ্‌লে ঠাকুরপো দেখ্‌লে, তোমার সামনেই আমাদের গাল দিচ্ছে; বল্‌ছে—আমরা হিংসুটে।

এক্স্ একটু হেসে বল্লে—হোলই বা। উনি যে আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রিতা।

পরেশ আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—তোর দিনগুলো তাহ'লে বেশ কেটেছিল বল্?

সুবোধ হাসিতে হাসিতে বলিল—ও-কে কোথায় পেলি রে? এ যে এক্স্-এর গল্প হচ্ছিল।

শৈলেন অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের ভান করিয়া কহিল—তা'তে আমার কিচ্ছু এসে যাচ্ছে না। আমার কাছে রমু-ও যা, এক্স্-ও তাই।

রমেন অপ্রতিভ না হইয়া মৃদুহাস্যের সহিত বলিল—এখন থেকে তাহ'লে উত্তম পুরুষেই বলা যাক্। পরেশ সত্যি কথাই বল্ছিল, ক'দিন যে কেমন কোরে কেটে গেল কিছুই বুঝতে পারি নি। তারপর ফিরবার সময় হোল। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রি। আমাদেরই বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠানে দেশের সখের দলের থিয়েটার হচ্ছে। লোকে লোকারণ্য। খানিকটা জায়গা চিক দিয়ে আড়াল করা মেয়েদের জন্য। সেখানে লোকসংখ্যা বড় কম নয়। রাত যখন প্রায় বারোটা বাজে, আমি উঠে পড়্লাম। তার পরের দিন সকালেই ফির্তে হবে, তাই রাত্রে একটু ঘুমের দরকার ছিল।

চিক-ঘেরা জায়গার কাছে এসে ডেকে বল্লাম, জ্যাঠাইমা, আমি এখন শুতে যাচ্ছি।

জ্যাঠাইমা বল্লেন—চল্, তোর মশারিটা ফেলে দিয়ে আসি। ধরো ত বৌমা এই খুকীটাকে। অত নেড়ো না, ঘুম ভেঙে যাবে, তাহ'লে আর কারো দেখ্তে শুন্তে হবে না।

চট্ কোরে হাসি-বৌদি উঠে পড়ে বল্লেন—আপনার উঠ্তে হবে না, বড়মামীমা। আমি ঠিক্ঠাক্ কোরে দিয়ে আসছি।

দুজনে একটা খোলা জায়গা পার হ'য়ে আসছি। শরতের গাঢ়নীল আকাশ যেন জ্যোৎস্নার আড়ালে লুকিয়েছে। প্রায় সব তারাই অদৃশ্য, কেবল এদিকে ওদিকে কয়েকটা বড় বড় তারার অস্তিত্বের ক্ষীণ আভাস চোখে পড়ে। মাথার উপরেই চাঁদ; তাই ছায়াগুলিও যতদূর সম্ভব ছোট হ'য়ে গেছে। তাদের ঘন কাল রং যেন তাদের লজ্জার রূপ—আলোর কাছে পরাজয়ের লজ্জা। হাল্কা দু-একখানা সাদা মেঘ আকাশের বিস্তীর্ণতায় পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বল্লাম—হাসি-বৌদি, অত জোরে চলেছেন কেন? চেয়ে দেখুন না একবার আলোর বান ডেকে, সমস্ত আকাশটা যেন থই থই কোরছে।

—যদি একটা মেঘের ভেলায় চড়ে ভেসে বেড়ান যেত—কিন্তু কল্পনা ত কখনও সত্যি হয় না।

—কেন হয় না। হয় বৈ কি।

বৌদি কি রকম একটু উত্তেজিত স্বরে বল্লেন—হয়? ঠিক বল্ছ!

আমি বল্লাম—হয়, তবে তখ্খুনি হয় না। সময় লাগে, অপেক্ষা কোরতে হয়।

বৌদি কেমন যেন নিবে গিয়ে বল্লেন—ওটা আমার দ্বারা হবে না। হয়, ত এখনই চাই, নইলে দরকার নেই।

আমি একটু হেসে বল্লাম—তাহ'লে আপনার ভাগ্যে পাওয়া নেই।

আমার মুখের দিকে রহস্যভরে তাকিয়ে বৌদি বল্লেন—ইস্, দেখা যাবে।

ভিতর-বাড়ীর চারিদিক নিস্তব্ধ নিঃঝুম। কেউ কোনোদিকে নেই, সব বাইরের উঠানে থিয়েটারে ব্যস্ত।

মশারি ফেলে দিয়ে গুঁজ্তে গুঁজ্তে বৌদি বল্লেন—তুমি ত বল্ছিলে তুমি নাকি খুব রাত জেগে পড়ো?

—হ্যাঁ, কিন্তু হঠাৎ একথা যে?

—আর খানিকক্ষণ না হয় জাগ্লে—সবে ত বারোটা; কাল সকালেই ত যাচ্ছ।

—বেশ ত, আসুন না ভিতরে।

বৌদি ভিতরে ঢুকে বল্লেন—আবার কতকালে তোমার সঙ্গে দেখা হবে?

—কেন, আপনি কি আর এর মধ্যে কল্কাতায় যাবেন না?

—তুমি নিয়ে গেলেই পার?

—আচ্ছা, আমি গিয়ে মাকে বল্ব।

—কি বল্বে?

—যে আপনি আমাদের কাছে আস্তে চান।

—কেন, তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাও এটা বল্তে বুঝি লজ্জা কোরবে?

কথাটা শুনে সত্যিই একটু লজ্জা এল। তা চেপে বল্লাম—বাঃ, লজ্জা কিসের? সত্যি, আপনাকে এবার আমার এত ভাল লেগেছে।

—কেন বল ত?

—আপনার সঙ্গে আমার বেশ মনের মিল আছে।

—আমার মন কি তুমি সবটা দেখ্তে পেয়েছ যে ওকথা বল্ছ?

তারপর আমায় একটু নাড়া দিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বল্লেন, ওগো আমাদের মন বোঝা অত সোজা কাজ নয়। ও শুধু দুখান বই প'ড়ে হয় না। অনেক সাধনা করা চাই।

একটু থেমে আবার বল্লেন—আবার এমন বোকাও অনেক আছে যে, বুঝিয়ে দিলেও বুঝ্‌তে পারে না।

—আমায় যেন সে দলে ফেল্‌বেন না, দয়া কোরে।

অন্যমনস্ক উত্তর এলো—কি জানি, তা এখনও ঠিক বলতে পারছি না।

একটা ঘণ্টা-বাজার শব্দ এলো। বল্লাম—প্লে আবার আরম্ভ হ'য়ে গেল কিন্তু।

—হোক্ গে, ও বই আমার দেখা আছে। তাছাড়া বইটা আমার ভালো লাগে না।

—কি রকম? 'চন্দ্রগুপ্ত' আপনার ভাল লাগে না?

—না, শেষটা আমার ভালো লাগেনি। ও রকম জোর কোরে একজনের দুটো বিয়ে দেওয়া আমি মোটেই পছন্দ করি না; মেয়েদের ভালোবাসাটা যেন ফেল্‌না—যে একপুরুষ দুজনেরটাই ভোগ কোরবেন।

—আপনি কি বল্‌তে চান, দুজন নারী একই পুরুষকে ভালবাসতে পারে না?

—বাসে বাসুক, কিন্তু তাদের বিয়ে দিয়ে সতীন করা কেন! তা না হ'লে হয়ত মেয়েদুটীও পরস্পরকে শ্রদ্ধা কোর্‌তে পারত?

কথাটা আমার নতুন লেগেছিল। আমি এদিক থেকে ব্যাপারটা কখনও ভাবিনি। তাই একটু চুপ্ কোরে রইলাম।

বৌদি বেশ একটু ঝাঁজ দিয়ে বল্লেন—আমার হাতে কলম থাকলে আমি একটা মেয়ের দুটো পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেখ্‌তাম, পুরুষদের কেমন লাগে?

—তাতে আপনার স্বজাতীয়রাই আপনাকে সব থেকে বেশী ছি-ছি কোর্‌তেন। আর গল্প ভাল হ'লে, পুরুষদের মধ্যে অন্ততঃ আমি আপত্তি কোর্‌তাম না। আমি নরনারীর সমান অধিকারে বিশ্বাস করি।

—তুমি,—তুমি তাহ'লে আপত্তি করো না? এমন এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে তিনি এই কথাগুলি বল্লেন যে, আমার গা-টা যেন শিউরে উঠল। তার পরেই দেখি আমি তাঁর উন্মত্ত আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। এ ক'দিন অনেক গল্প, অনেক রহস্য করেছি বটে, কিন্তু এ কথা ত কখনও মনে আসে নি। আমার চেয়ে সম্পর্কে ত বড়ই, বয়সেও দু-তিন বছরের বড় হবেন। গুরুজন ব'লে সম্মান ক'রে চলেছি। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে আমার কেমন ভয় কান্না আস্‌তে লাগ্‌ল। মনে হোল, আমিই যেন কি একটা মস্ত অপরাধ, তাঁকে যেন অসম্মান, ক'রে ফেলেছি।

ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাশ ফির্‌তে ফির্‌তে বল্লাম—আমার বড় ঘুম আস্‌ছে। আমি ঘুমুই।

কিছুক্ষণ কোন কথা নাই। শুধু দ্রুত নিঃশ্বাসের উষ্ণ স্পর্শ।

—নেহাৎ কাঁচা; শুধু মুখ-সর্ব্বস্ব। এই ব'লে তিনি উঠে গেলেন।

রমেন থামিল। আর সকলেও চুপ্‌চাপ্। সুবোধের মুখ দেখিলে মনে হয়, গল্পটার মধ্যে সে জমিয়া গিয়াছে। কিন্তু শৈলেন মোটেই শুনিতেছে কি-না, তাহাও স্পষ্ট বুঝিবার জো নাই। পরেশই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল।

—সে রাত্রে তুই ঘুমুতে পেরেছিলি?

রমেন বলিল—না পারার কথা ত মনে পড়ছে না।

সুবোধ বলিল—এই রকম ঈডিয়ট্ ছিলি?

রমেন বলিল—ঈডিয়ট্ কি আবার? আমার অবস্থায় পড়লে তুই-ই বা কি করতিস্?

দেখা গেল গল্পটা শুনিবার আগ্রহ শৈলেনেরই সব থেকে বেশী। সে চেঁচাইয়া বলিল—তোরা কি ভাবছিস্ গল্পটা শেষ হ'য়ে গেছে? রমু, থাম্‌লি কেন?

রমেন আবার সুরু করিল—পরের দিন উঠ্‌তে দেরী হ'য়ে গেল; ঘুম ভেঙে চোখ মেলেই দেখি—হাসি-বৌদি। স্নান সারা হ'য়ে গেছে; চওড়া পাড়ের সাদা সাড়ীখানা যেন তাঁর সর্ব্বদেহের স্নিগ্ধ-সুষমার প্রতিরূপ। বেশ সহজ সুরে আমায় বল্লেন—উঠেছ? আমি ভাব্‌ছিলাম, আমার সমস্ত আয়োজন বুঝি ব্যর্থ হয়।

অত্যন্ত দ্বিধাভাবে জিজ্ঞাসা কোর্‌লাম—আয়োজন? আমার জন্যে?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, নইলে আজ কল্‌কাতায় যাচ্ছি কি আমি? বাড়ীর সকলে ত এইমাত্র বিছানা ছেড়ে উঠ্‌ছেন—কাল রাত জাগার পর। আমি উঠে যোগাড় কোরে না রাখ্‌লে আজ তোমার যাওয়াই হোত না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম—আপনি কী ভাল লোক, বৌদি, আপনাকে পুরস্কার দিতে ইচ্ছে করছে।

বৌদি কিছু না ব'লে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। তাঁকে দেখে আমার মনে হোল যেন নেবানো টর্চ্চ-লাইট্। কাল রাত্রে এঁর মধ্যে যে বিদ্যুৎ-বহ্নির বিকাশ হয়েছিল, আজ এঁকে দেখে কে তা বুঝ্‌তে পারে?

পরেশ বলিল—সে টর্চ্চ-লাইট্ কি আর জ্বলে নি?

শৈলেন বলিল—দ্যাখ্‌ পরেশ, তোর কি একটু সবুর সয় না?

সুবোধ বলিল—আমার কিন্তু গল্পের শেষ জানতে মোটেই আগ্রহ হয় না; যেখানেই থাম না কেন, আমি নিজের মনের মত শেষ কোরে নিতে পারি।

রমেন বলিল—তাহ'লে আমি এখন থামি; তুই তোর ইচ্ছামত শেষ কর।

সুবোধ বলিল—স্বচ্ছন্দে। দাঁড়া, একটু ভেবে নিই।

শৈলেন বলিল—দোহাই সুবোধ, বারওয়ারী গল্পের পালা আর একদিন হবে। আজ রমেনই শেষ করুক?

পরেশ বলিল—সেই ভাল, নইলে রমুর গল্পকে সুবোধ মাটী ক'রে দিত।

রমেন বলিল—দিনকয়েক পরে এক চিঠি পেলাম। তার আসল বক্তব্য এইরূপ—আমার কাছে তোমার ফাউন্টেন পেন্‌ ফেলে গেছ, মনে পড়ছে কি? ক'দিনের মধ্যে খোঁজও করলে না! আমায় ত সেটা উপহার দিয়ে যাও নি, তাই আজ ডাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। প্রাপ্তি সংবাদ দিতে ভুলো না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কি শুভক্ষণে কলমটা ফেলে এসেছিলাম। আমাদের চিঠি-লেখালিখি আরম্ভ হোল।

আমার তখন সেই বয়স যখন মন প্রথম মেয়েদের সম্বন্ধে সজাগ হ'য়ে ওঠে। কাব্যনাটকের নায়িকারা মুগ্ধ কোরলেও, তৃপ্ত করে না, বন্ধুপ্রীতিও অসম্পূর্ণ লাগে। মন তখন একটী সজীব নারীর হৃদয়ের নিবিড় স্পর্শের জন্য আকুল থাকে। স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, যথেষ্ট বোধ হয় না, সখীত্বের অভাব যেন কিছুতেই মেটে না। এ অভাব পূরণ হওয়া আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় একান্ত সুকঠিন। কিন্তু হাসি-বৌদি আমায় সে সুযোগ দিয়েছিলেন। চিঠির মধ্যে দিয়ে তাঁর সঙ্গে সখ্যের বন্ধন সৃষ্টি হোল। কী ভালোই লাগ্‌ত, চিঠি লিখ্‌তে আর চিঠি পেতে। যা খুসী লিখে যেতাম—কবিতা, গল্প, উচ্ছ্বাস, খেয়াল; বন্ধু-বান্ধব, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ,—সব বিষয়। কত সময় বুঝ্‌তে পারতুম তাঁর বিদ্যের বাইরে যাচ্ছি; কিন্তু তবু না লিখে স্বস্তি ছিলনা। পেতাম রহস্যের উত্তরে রহস্য, ভাবের বদলে ভাব, আমার বই-পড়া বিশ্বের পরিবর্ত্তে চোখে-দেখা সংসারের অভিজ্ঞতা। হাতের লেখাটী পরিচ্ছন্ন হ'লেও বানান ভুল, ব্যাকরণের ত্রুটি অজস্র। তা সত্ত্বেও প্রত্যেকখানি চিঠি একটী সজীব মেয়েলি মনের 'কালি-কলম' ছবির মত। সোজা খোলাখুলি চিঠি—মাঝে

মাঝে অনেকেই পড়তেন ও উপভোগ কোর্‌তেন। সপ্তাহে একখানা, দুখানা, তিনখানা—যেন দূরে থেকে ফুল-ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা। এমন কোরে বছর খানেক কাট্‌ল।

সুবোধ বলিল—তারপর পূজোর সময় তুই আবার দেশে গেলি?

রমেন বলিল—না, পূজোয় যাওয়া হোল না, কিন্তু গেলাম গরমের ছুটিতে। দেশে খুব আম হয়েছিল, তাই জ্যেঠাইমা নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি গ্রাম ফাঁকা; কেননা, বেশীর ভাগ লোকই বিদেশে কাজকর্ম্ম বা লেখাপড়া উপলক্ষে। দুর্গাপূজায় প্রায় সবাই দেশে আসেন, ও তখন বেশ সরগরম হ'য়ে ওঠে। বড় হ'য়ে অবধি আমি পূজোয় ছাড়া অন্য কখনও দেশে যাইনি। কমল-বিলাসীর দেশ যে কাল্পনিক নয়, পরিপূর্ণ কুঁড়েমি যে বাস্তবজীবনে সম্ভব, তার চাক্ষুষ প্রমাণ এবার পেলাম। কোন সুস্থ পুরুষ যে কেবল তামাক খেয়ে, ঘুমিয়ে ও গাড়ু হাতে কোরে মাঠে গিয়ে সময় কাটিয়ে দিতে পারে, তা আমার কল্পনার অতীত ছিল। আমি ত হাঁপিয়ে উঠলাম। দুপুর বেলা কাটানো এক সমস্যা হ'য়ে উঠ্‌ল। বই সঙ্গে ছিল, কিন্তু এমনই স্থানমাহাত্ম্য যে, খুলতেও ইচ্ছা কোর্‌ত না। ভাল লাগ্‌ত শুধু একটী কাজ—চিঠি লেখা। তাই চারিদিকে বড় বড় চিঠি লিখ্‌তে আরম্ভ কোর্‌লাম; বৌদিকে ত বটেই।

পরেশ বলিল—হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে।

রমেন বলিল—একদিন হঠাৎ জ্যেঠাইমাকে জিজ্ঞাসা কোর্‌লাম যে—ন-পিসিমার বাড়ী কত দূর।

জ্যেঠাইমা জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন, সেখানে যাবি নাকি? বৌ যেতে লিখেছে বুঝি?

—হ্যাঁ তেমনি লোক! আমিই যেতে চাচ্ছি। তুমি আমার যাবার ব্যবস্থা কোরে দাও।

—এই রোদ্দুরে, অনেকটা হাঁট্‌তে হবে—তুই ত আবার গরুর গাড়ী চড়তে পারিস্‌ নে। ক'দিনের জন্যেই বা এসেছিস্‌! এবার থাক্‌, অন্যবারে যাস্‌।

—না, জ্যাঠাইমা, তা হবে না। আবার কবে যে দেশে আসব, তার ঠিক নেই। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি যে, দু-একদিনের বেশী থাক্‌ব না।

—যেদিন যাবি, তার পরের দিনই ফিরিস্‌ ত যেতে দিই।

অগত্যা তাতেই রাজী হ'য়ে সহজ সুরের ভানে জিজ্ঞাসা কোর্‌লাম—আচ্ছা, জ্যাঠাইমা, তাতে বুঝি রোদ্দুর কম লাগ্‌বে?

জ্যাঠাইমা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—থাম্‌, পাজির বেটা পাজি।

একদিন সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। জ্যাঠাইমা সঙ্গে একজন লোক দিলেন, পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে ও পরের দিনই ফিরিয়ে আন্‌তে।

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে, জন-বিরল পথে, বাংলাদেশের গ্রামগুলির ভিতর দিয়ে এই যাওয়াটা আমার কাছে এক অপরূপ অভিজ্ঞতা। এতদিন পরে আজ তার অনেক স্মৃতিই ম্লান হ'য়ে এসেছে। যেটুকু স্পষ্ট তা আমাদের অক্ষমতার, অযোগ্যতার ছবি। বিধাতা ত দু'হাত দিয়েই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা দু'হাত দিয়ে তা রাখ্‌তে পার্‌লাম কৈ? যা-কিছু বিধাতার, তা অপূর্ব্ব—গাছ, ফল, মাঠ, আকাশ, আলো-ছায়া; যা-কিছু মানুষের, তা অতি কদর্য্য—ঘর-বাড়ী, পথ-ঘাট, বাগান-পুকুর। আমরা ভুলে যাই যে অশক্ত সুধু দানে বঞ্চিত নয়, গ্রহণেও অসমর্থ।

শেষ কথাগুলি রমেন বেশ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিল।

পরেশ বলিল—এ কি কাণ্ড, প্রেমের গল্প বল্‌তে বল্‌তে এ-যে রাজনীতি এনে ফেল্‌লি।

সুবোধ বলিল—রমুর গল্প মাদ্রাজীদের খাবারের মত। শুনেছি তারা নাকি সন্দেশেও লঙ্কার গুঁড়ো মেশায়।

শৈলেন হাসিতে হাসিতে বলিল—সুবোধ, তোর মুখ কি উপমার শ্লট্-মেসিন যে টান্‌লেই একটা বেরিয়ে আসে?

সুবোধ উত্তরে বলিল—তোর এটির মত অদ্ভুত উপমা আমি মাথা খুঁড়লেও পেতাম না। রমু, পলিটিক্‌স্‌ বাদ দিয়ে তোর গল্প আবার চালা।

রমেন বলিল—বেলা তখন পড়-পড়, অথচ আকাশে যথেষ্ট আলো। গাছের ছায়া ক্রমেই দীর্ঘতর হচ্ছে। দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধ অবসরের পর, গ্রামে আবার প্রাণ-চাঞ্চল্যের সাড়া জেগে উঠেছে, এমন সময় গিয়ে পৌঁছলুম। পথ সংক্ষেপ করার জন্য খিড়কীর দরজা দিয়ে ঢুকেই দেখি—বৌদি একটা ঘরের চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে দরজার গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছেন অত্যন্ত আন্‌মনার মত। বিস্রস্ত বেশ, মুখে চোখে সদ্য ঘুম-ভাঙার অলস-মাধুরী। আমাকে দেখেই হঠাৎ চম্‌কে উঠে চট্‌ কোরে ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন; কিন্তু তার মধ্যেই লক্ষ্য করা গেল, তাঁর সমস্ত দেহের কম্পিত আবেগ ও দীপ্ত আভা।

পরেশ বলিল—টর্চ্চ-লাইট্‌টা আবার জ্বল্‌লো বুঝি।

সুবোধ বলিল—বাঃ বেড়ে বলেছিস্‌ পরেশ!

রমেন কোন উত্তর না দিয়া বলিয়া চলিল—আমি কিন্তু হতভম্ব হ'য়ে গেলাম—আমাকে দেখে তিনি পালালেন কেন? খবর না দিয়ে এসেছি, তাই কি রাগ কোর্‌লেন? তাঁর মধ্যে যে ভাবাবেগ দেখ্‌লাম—তা প্রীতির, না বিরক্তির?

বিশ্লেষণ করার বেশী সময় পেলাম না। খোকা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—কাকাবাবু এয়েছে রে। বাড়ীর মধ্যে সাড়া প'ড়ে গেল।

তারপর ভদ্রতার আত্মীয়তার পালা। পিসিমা ও দাদার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ও জলযোগের পর তাঁদের বাড়ীর অন্যান্য লোক ও গ্রামবৃদ্ধদের মধ্যে গিয়ে বস্‌তে হোল। এখানে আমি পল্লীজীবনের আর-এক দৃশ্য দেখ্‌লাম। কথা আর ফুরাতে চায় না। অসঙ্গত প্রশ্নের আর অবধি নেই। সব থেকে চোখে পড়ল—তাঁদের সঙ্কীর্ণ জীবনের সামান্য অভিজ্ঞতাগুলিকে শোনাবার অধীর আগ্রহ। আর তাঁদের অভ্রভেদী আত্মম্ভরিতা। এ-হেন বিষয় নেই যে সম্বন্ধে তাঁদের মতামত দৃঢ়বদ্ধ ও চরম নয়। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌লেও পালাবার পথ নেই। শেষে একটা মিথ্যে ছল কোরে খোকাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েই জিজ্ঞাসা কোর্‌লাম—তোর মা কোথায় রে?

—বোধ হয়, রান্নাঘরে।

—চল্‌, সেখানে যাই।

হাঁড়ি-কুঁড়ি, কোটা-তরকারি, ঘি-ময়দা ইত্যাদির মধ্যে ব'সে—বৌদি। মুখ লাল—বোধ হয় আগুনের তাপে। আমাকে দেখেই ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন—তুমি এখানে কেন? বাইরে যাও।

—কেন, দেশে ত রান্নাঘরে ব'সে কত গল্প করেছি।

—কিন্তু এখানে আমার জায়েরা তোমার সাম্‌নে আস্‌বেন কেন? তুমি কি কচি খোকা?

সুকঠিন সত্য, রসলেশহীন। বেত্রাহত কুকুরের মত বেরিয়ে এলাম। মন অস্বস্তিতে ভ'রে উঠ্‌ল—কেন এলাম, কেন এলাম, এ প্রশ্ন চিত্তের অন্ধকার আকাশে বারবার বিদ্যুতের মত জ্বালা বর্ষণ করতে লাগ্‌ল।

গ্রামের একদল ছেলের সঙ্গে ফুটবল ক্লাব ও থিয়েটারের আখড়া ঘুরে যখন ফিরলাম, তখন খাবার সময় হয়েছে। খেতে ব'সে আমার সমস্ত সন্দেহ কেটে গেল। বুঝতে পার্‌লুম আমার আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক। বৌদিকে দেখে মনে হোল যেন তিনি হৃদয়ের আবেগে টলমল কোর্‌ছেন। শাসনের সমস্ত আবরণ ভেদ ক'রেও আনন্দের দীপ্তশিখা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পৃথিবীর অন্তরের অনির্ব্বাণ প্রলয়াগ্নি যেমন নিরন্তর নিজেকে শ্যামলে

সবুজে প্রকাশ করে, তেমনি কোরেই তাঁর অন্তরের সুতীব্র বাসনা ব্যবহারের মাধুর্য্যে রূপান্তরিত হচ্ছিল।

বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলে গেলেন—ঘুমিয়ো না, আসছি। অপেক্ষায় রইলাম। একটা বড় দালানকে তুভাগ করা তুটি ঘর, মাঝে দরজা। বড় ঘরটায় দাদা, ছোট ঘরে আমি। মাথার বালিশটা একটু নাড়তে গিয়ে দেখি, তার তলায় একতাড়া চিঠি। মশারির বাইরে হারিকেন জ্বলছিল। দেখ্‌লাম আমারই চিঠিগুলো, অতি যত্নে তারিখ অনুযায়ী পরপর সাজান। সময় কাটানোর জন্য পড়তে আরম্ভ কোর্‌লাম।

মশারি তুলে বিছানায় ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে বৌদি বল্লেন—চোর!

আমি বল্লাম—আমার চিঠি আমি পড়ছি, তাতে চোরও হ'তে হবে?

বৌদি বল্‌লেন—চিঠি যে লেখে তার না, যাকে লেখা হয় তার?

আমি বল্লাম—সমস্যা বটে; বেতাল পঞ্চ-বিংশতিতে স্থান পাবার যোগ্য।

বৌদি বল্‌লেন—উড়িয়ে দিতে চাচ্ছ; উত্তর ত দিতে পার্‌লে না!

আমি বল্লাম—কি কোর্‌ব বলুন; কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ, কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নি।

বৌদি বল্‌লেন—তবে আমার কাছে শেখো। চিঠি কারো একলার নয়, তুজনেরই, ছেলে যেমন বাপ-মায়ের।

আমি বল্লাম—তবে আমার চুরিটা কোথা হোল?

বৌদি বল্‌লেন—অর্থাৎ তুমি পিতৃত্বের দাবী কোর্‌ছ। কিন্তু ছেলে যদি মায়ের কাছে থাকে, তবে বাপেরও উচিত, আগে মায়ের অনুমতি নেওয়া।

আমি হাতের চিঠিখানা তাঁকে ফিরিয়ে দিতে দিতে বল্লাম—আপনার ছেলেরা আপনার কাছেই থাক্‌, আমি এদের ত্যাজ্যপুত্র কোর্‌লাম।

বৌদি বল্লেন—আহা, ষাট্‌ ষাট্‌, বাছাদের আমার অনাথ করো না।

তাঁর অভিনয়ের ভঙ্গীতে আমি হো হো কোরে হেসে উঠ্‌লাম।

তারপর তুজনে মিলে চিঠি পড়া আরম্ভ হোল। অনেকদিন পরে নিজের চিঠি পড়ার মধ্যে বেশ একটা মাদকতা আছে, বিশেষতঃ যাকে লেখা হয়েছিল, সেও যদি কাছে থাকে। অতীত দিনগুলি আবার সজীব হ'য়ে উঠ্‌ল। কতকথা, যা আগে বল্‌তে গিয়ে বলা হয় নি, আজ তা তুজনেই বল্‌তে লাগ্‌লুম। পুরানো রসিকতায় আবার হাস্যে; পুরাণো তর্ক আবার ঘোরালো হ'য়ে ওঠে আর কি! একটা মাথার বালিশে বুক রেখে আমরা তুজনে শুয়ে। দেহ তুটী সমান্তরাল ভাবে লম্বিত। মুখ অত্যন্ত কাছাকাছি। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস জড়িয়ে যাচ্ছে।

আমরা মশ্‌গুল হ'য়ে পড়ছি, এমন সময় মাঝের দরজা খুলে দাদা ঘরে এসে বল্‌লেন—তোমাদের কথা কি এখনও ফুরোয় নি? রাত যে তুটো বেজে গেল।

বৌদি তৎক্ষণাৎ আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—কীগো বল, কাকে চাও? ঘুমকে, না আমাকে?

লজ্জায় আমি কোন উত্তর দেবার আগে দাদাকে বল্লেন—

—ওকে একটু রাতজাগা অভ্যাস করিয়ে দিচ্ছি, যাতে আর একজন কষ্ট না পায়। তোমার ঘুমের জ্বালায় আমার কথা কয়ে তৃপ্তি হয় নি। একটু থেমেই আবার বল্‌তে লাগলেন—তাই বলে ভেবো না যেন তোমার কাছে আমার যা কিছু পাওনা, সব তোমার ভাইয়ের কাছে দাবী কর্‌ছি।

দাদা ত ভয়ে ঘর ছেড়ে দৌড়—পাছে আরো কিছু শুন্‌তে হয়, ছোট ভায়ের সাম্‌নে। আমি বল্লাম—আপনি কী ভয়ানক তুষ্টু!

বৌদি বল্লেন—বেশ ত, তোমার বেলায় একটী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এনে দেওয়া যাবে।

আমি বল্লাম—তাতে আমার কি, আপনারই ঝঞ্ঝাট বেশী।

বৌদি বল্লেন—কেন?

আমি বল্লাম—আমি তাকে আপনার কাছে রেখে দেব, তুষ্টুমি শিখ্‌তে।

বৌদি বল্লেন—তাহ'লে এখন তুমি সেই চিন্তাই করো। আমি যাই, নইলে তোমার দাদা আবার বিরহে রোগা হ'য়ে যাবেন।

চোখের ওপর কোমল তুটী করের স্নিগ্ধ স্পর্শে পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙ্‌ল। আর কানের কাছে সে কী মিষ্ট স্বর—"ওঠো, ওঠো, আর কত ঘুমোবে?" এরই মধ্যে স্নান সারা হয়ে গেছে, কেশে বেশে সযত্ন পারিপাট্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এক ঝুড়ি তেঁতুল ও বঁটি নিয়ে এসে চেপে বস্‌লেন। শ্বশুরবাড়ীতে কথা কইতে গেলেও কাজের অছিলা চাই, তাই এ আয়োজন। পিসীমা দেখে হেসে বল্লেন—হাঁ বৌমা, সকাল বেলায় তুমি আর কাজ খুঁজে পেলে না? দেওরকে কি আজ তেঁতুলবীচি খাইয়েই বিদায় দেবে না কি?

বৌদি আমার মুখের দিকে চাইতেই আমি পিসীমাকে উত্তর দিলাম, আজ তুমি রাঁধগে পিসীমা, আজ তোমার রান্না খাব। বৌদিকে দেখিয়ে বল্লাম, ওঁর যা রান্নার বিদ্যে, তা কাল রাতেই পরিচয় পাওয়া গেছে।

পিসিমা বৌদিকে বল্লেন—ননদের গঞ্জনা ত সইতে হোল না, এখন দেওরের চিম্‌টি সহ্য করো।

পরীক্ষার ‘হলে’-ও সময় এত তাড়াতাড়ি কাটে না। হঠাৎ দেখি বিকেল হ’য়ে গেছে। জ্যাঠাইমার লোক তাড়া দিচ্ছে। আর না বেরুলেই নয়।

যাবার আগে কিছু জলযোগ। বৌদিকে বল্লাম—জল। খাবার জল, না হাত ধোবার জল বুঝ্‌তে না পেরে তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, কি জল চাই।

হঠাৎ উত্তর দিয়ে ফেল্লাম—চোখের জল নয়। তা-ই কিন্তু পেলাম। তাঁর চোখ চক্‌চক্ কোরে উঠ্‌ল; আঁখিতারা বিস্ফারিত, চোখের কোণে চঞ্চল দুটী মুক্তাবিন্দু। দুঃখ অসহ হ’তে পারে, কিন্তু তার প্রকাশ কি মধুর।

মুগ্ধ হ’য়ে বল্লাম—বৌদি, আপনাকে মোটে বোঝা যায় না।

তিনি বল্লেন—কেন?

আমি বল্লাম—কাল এসেই আপনার যে মূর্ত্তি দেখেছিলাম, আজ তার এই পরিণতি হবে, কে জান্‌ত?

উদাস কণ্ঠে উত্তর এল—আমি দুর্ব্বোধ না তুমি নির্ব্বোধ! বোঝ না, অপ্রকাশিত সুখ, বেদনারই মত দুঃসহ? তাকে সইয়ে নিতে সময় লাগে।

সমস্ত পথ ভাব্‌তে ভাব্‌তে এলাম—সজল দুটী চোখ ও চোখের কোণে চঞ্চল দুটী মুক্তাবিন্দু।

রমেন থামিল। শ্রোতৃবর্গের এতক্ষণ পরে আবার যেন নিঃশ্বাস ফেলার কথা মনে পড়িল। একটা কৃত্রিম দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুবোধ বলিল—এত আয়োজন, সব ফাঁকা। দুটো জলভরা মেঘ মুখোমুখি এল, ভাবলুম, না জানি কত বজ্র ও কত বিদ্যুৎ-ই হবে। তা নয়, কেবল দুফোঁটা বৃষ্টিতেই শেষ।

শৈলেন বিজ্ঞভাবে বলিল—আবহাওয়া-শাস্ত্রে লেখে, অমনতর হয়।

কাব্য-লোক হইতে নামিয়া আসিয়া পরেশ জিজ্ঞাসা করিল—তাঁর সঙ্গে আর তোর দেখা হয় নি?

—হ্যাঁ হয়েছিল, বছর দুই পরে।

—ইতিমধ্যে চিঠি চল্‌ছিল ত?

—নিশ্চয়, তবে চিঠির ধারা এবার নতুন খাতে বইতে লাগ্‌ল। ঐ সময়টা জার্ম্মান-যুদ্ধ বেধে গেল! একটা চিঠিতে বৌদি লিখ্‌লেন,—শুনছি খুব যুদ্ধ বেধেছে। ছেলেবেলায় সামান্য ইতিহাস ভূগোল যা প’ড়েছিলাম তা ত মনে রাখার জন্য পড়ি নি, তাই কিছু বিশেষ বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তুমি আমায় যুদ্ধের কথা লিখো। যুদ্ধ আমার বড় ভাল লাগে। আমি ওদেশের লোক হ’লে নিশ্চয়ই যুদ্ধে যেতাম। যারা মরার অপেক্ষায় না থেকে জীবনের মাঝপথেই মরণকে ধর্‌তে চায়, কি জানি কেন আমি তাদের বড় ভালবাসি।

শৈলেন বলিল—বলিস্ কি, একথা লিখেছিলেন? খুব অদ্ভুত ত!

পরেশ বলিল—এমন মেয়ে আরো গোটাকতক হ’লে দেশ উদ্ধার হ’য়ে যেত।

সুবোধ বলিল—আবার পলিটিক্‌স্? রমেন, ব’লে যা।

রমেন বলিল—যুদ্ধের কথা থেকে নানা বিষয়ের আলোচনা উঠ্‌ত,—ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায় বন্ধন-মুক্তি শেষ পর্য্যন্ত ভগবান নিয়ে টানাটানি। বেপরোয়াভাবেই মতামত প্রকাশ করা হোত, পরস্পরকে আক্রমণও কম হোত না। রাত জেগে জেগে এ-সব চিঠি লেখার মধ্যে কী প্রবল মোহই ছিল!

আবার দেখা হোল পিসীমার বাড়ীতেই। দেশে গিয়েছিলাম, বৌদি যেতে লিখ্‌লেন। এবারে আর সঙ্গে কোন লোক নিলাম না, কিন্তু জ্যাঠাইমা যাবার সময় ব’লে দিলেন, কুটুমবাড়ী বেশী থাকা ভাল দেখাবে না, তার পরের দিনই যেন চলে আসি।

সে বাড়ীতে পিসীমা, বৌদি ও খোকা ছাড়া আর সকলেই বিদেশে। যেতে না যেতেই গল্প জমে গেল। বাড়ীর মধ্যের গাছে চড়ে ফল্‌সা পাড়া, একসঙ্গে পুকুরে নাওয়া, রান্নাঘরেই আড্ডা জমানো—দুটী উন্মুখ মনের নিবিড় সংযোগ।

এবারে দাদার খাটের বিছানায় শুলাম আমি, ও পাশের ঘরে আমার জায়গায় বৌদি, খোকা দাদার ঘরের মেঝেয়। পিসীমা অন্য ঘরে।

আমাকে শুইয়ে দিয়ে বল্লেন—আজ ত ঢের গল্প হোল; এখন শোও।

আমি বল্লাম—সেকি, এর মধ্যে।

বৌদি মশারির বাইরে বস্‌লেন।

আমি বল্লাম—বড় অসুবিধা! ভেতরে আসুন। তিনি বল্লেন—না। হাত ধ’রে টানাটানি কোর্‌তে লাগ্‌লুম। কিছুতেই এলেন না। শেষে অভিমান ক’রে বল্লাম—তবে আপনি যান।

বৌদি উঠ্‌লেন।

আমি বল্লাম—আগের বারে ত এসেছিলেন?

তিনি বল্লেন—সেবারে তোমার দাদা ছিলেন। ব’লে আলো নিবিয়ে দিয়ে নিজের বিছানায় চলে গেলেন। সেই অন্ধকারে আমার সমস্ত শরীর উত্তপ্ত, রক্ত চঞ্চল হ’য়ে উঠ্‌ল। যে দুর্নিবার আকর্ষণ আদিম কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত বিশ্বের সমস্ত নরনারীকে একই বাঁধনে বেঁধেছে, যাকে দমন করার জন্য মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠ্‌ছে আর বারবার পরাজিত হ’য়ে ধূলিসাৎ

হ'য়ে যাচ্ছে, তার রুদ্ররূপ সেদিন প্রত্যক্ষ কোর্‌লাম। মনে হোল, এতদিন স্বধু জীবন নিয়ে খেলা ক'রে এসেছি—এই-ই আমার অস্তিত্বের পরমতম মুহূর্ত্ত। আমার বিক্ষিপ্ত এলোমেলো জীবনের সমস্ত অন্তর্নিহিত শক্তি একটী ঋজু সবল অখণ্ডিত মূর্ত্তিতে চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল। এতদিনে যেন বেঁচে থাকার অর্থ বোঝা গেল।

ধীরে ধীরে চুপে চুপে বেরিয়ে পড়ে অন্ধকারে হাৎড়াতে হাৎড়াতে বৌদির বিছানায় এলাম। ঘুম-জড়ানস্বরে বৌদি বল্লেন,—এসো।

উত্তর না দিয়ে এমনভাবে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম যে, আমার অন্তরের প্রচণ্ড আবেগ ও উন্মত্ত বাসনা একেবারে অনাবৃত স্পষ্টতায় প্রকাশ হ'য়ে পড়ল। তিনি বল্লেন—ওকি! আমি বল্লুম—আমি ছাড়ব না।

তিনি বল্লেন—আস্‌চি। কণ্ঠস্বর বজ্রের মত অমোঘ, বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণ। মন্ত্রমুগ্ধের মত ছেড়ে দিলাম।

তিনজনে সমস্বরে প্রশ্ন করিল—তারপর?

রমেন বলিল—তারপর? তারপর তিনি ধীরে ধীরে উঠে এসে বেশ সংযত ক'রে নিয়ে, খোকার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

তিনজনে একত্র বলিয়া উঠিল—সেকি?

রমেন বলিতে লাগিল—আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তখনি ভূমিকম্প হ'য়ে পৃথিবী ধ্বংস হ'য়ে গেলে কিছুমাত্র দুঃখিত হতাম না। যা যে হবে না, আবার যে সকালে মুখ দেখাতে হবে, এই দুর্ব্বিষহ লজ্জাই আহত ভুজঙ্গের মত বারবার দংশন কোর্‌তে লাগ্‌ল। গভীর রাতে চোরের মত নিজের জায়গায় ফিরে এলাম।

বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, অনেক বেলা হয়েছে তবু চোখ মেলা যাচ্ছে না। খোকা, পিসীমা কয়েকবার এসে না ডেকে ফিরে গেলেন—ঘুমোচ্ছি মনে ক'রে।

—আর শুয়ে থাক্‌তে হবে না, ওঠো। এই বলে বৌদি আমাকে তুলে দিলেন। তারপর খোকার সঙ্গে গ্রামের মধ্যে একটু ঘুর্‌তে গেলাম।

দুপুর বেলা খাওয়া শেষ হলেই পিসীমাকে বল্লাম, এখনি বেরিয়ে পড়ি, নইলে রাত হ'য়ে যাবে, পথ খুঁজে নিতে কষ্ট হবে।

পিসীমা বল্লেন—দাঁড়া, আমাদের খাওয়াটা হোক্।

কি আর করি, অপেক্ষা কোর্‌তে হোল।

ঘর অন্ধকার কোরে খাটে পড়ে আছি, বৌদি এসে পাশে বস্‌লেন। আমি চোখ বুজে চুপটী কোরে রইলাম। আমাকে একটা নাড়া দিয়ে তিনি বল্লেন—অমন মুখ গোম্‌সা ক'রে রয়েছ কেন? কী এমন ঘটেছে?

দুহাতে মুখ ঢেকে আমি উপুড় হ'য়ে পড়লাম। আমার মাথাটা তাঁর কোলের ওপর তুলে নিয়ে সস্নেহে আমার চুলগুলি চিরতে চিরতে বল্লেন—ঠাকুরপো, বিশ্বাস কর আমার কথা; আমি তোমায় দোষী মনে কর্‌ছি না। যে প্রবল টানে কাল তুমি আমার কাছে গিয়েছিলে, তার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তাই তোমায় ভুল বোঝা বা তুচ্ছ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমি তেমনই চুপ্‌ কোরে প'ড়ে রইলাম। তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—তুমি জান, এমন একদিন গেছে যখন তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করা আমার কাছে সকলের চেয়ে কাম্য ছিল। কিন্তু স্বধু দিতে চাইলেই ত এ ব্যাপার সম্পূর্ণ হয় না; যে নেবে, তারও তৈরী থাকা চাই। তাই আজ যদি তোমার ডাকে আমার মনে সাড়া না জাগে, তাহ'লে কি আমার ওপর রাগ করা তোমার উচিত?

এই ব'লে তিনি আমার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কপালে গভীর স্নেহচুম্বন দিলেন।

পরেশ বলিয়া উঠিল—বোগাস্‌!

স্ববোধ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—অর্থাৎ?

পরেশ বলিল—অর্থাৎ শেষটা সত্যি নয়। নিজের সাধুত্ব বজায় রাখার জন্য রমু সত্যকে বিকৃত কোর্‌ছে।

শৈলেন বলিল—যে নিজেকে প্রত্যাখ্যাত কোরে দেখাতে পারে, সে যে মিথ্যে বলেছে, তা আমার মনে হয় না। পুরুষের পক্ষে এর চেয়ে বড় লজ্জা আর কি আছে?

স্ববোধ বলিল—তাছাড়া, রমু ত আর সত্যি বলার জন্য হলফ্‌ পড়েনি। সে গল্প বলেছে। আমার আপত্তি, গল্প হিসাবে শেষটা ঠিক খাপ খায় নি। অত এগিয়ে এসে তাঁর পিছিয়ে যাবার কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

শৈলেন বলিল—মানুষের সব কাজেরই কি কারণ খুঁজে পাওয়া যায়—জীবনে?

স্ববোধ বলিল—জীবনে না যাক্‌, গল্পে পাওয়া চাই। জীবনে যা অসংবদ্ধ তাকে সুসংবদ্ধ করা আর্টের প্রধান কাজ।

রমেন মৃদুস্বরে বলিল—আমি কি বলেছি যে আমার কথা শেষ হয়েছে?

তিনজনেই অপ্রতিভ হইয়া গেল।

শৈলেন বলিল,— সত্যি তো, বল তার পর কি হোলো?

রমেন আরম্ভ করিল—তারপরেই দেখি তিনি হাস্‌ছেন। বললেন—কি ভাব্‌ছ? দুধের বদলে ঘোল দিয়ে এ অপমান করা কেন?

আমি বিপন্নের মত আর্ত্তস্বরে বল্লাম—আমায় রেহাই দিন, বৌদি। আমার অন্যায় হয়েছে। কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দেবেন না।

কণ্ঠস্বর বদলে নিয়ে তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—অন্যায়? অন্যায় কোথায়? এ বিষয়ে কি যে ন্যায় আর কি অন্যায়, তার মাপকাঠি আমি আজও খুঁজে পাইনি। শুধু এটুকু বুঝেছি, যেখানে দেহের মিলন হয় অথচ অন্তরের মিল নেই, সেখানেই অন্যায়, তা হোক্ না কেন সে মিলন স্বামীর সঙ্গেই। কিন্তু কেন যে একসময়ে একজনের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, অন্য সময়ে করে না, এ এক অতি দুর্ভেদ্য রহস্য। আগের বারে তুমি যদি আমায় চাইতে, আমি নিজেকে উজাড় কোরে ঢেলে দিতাম। কিন্তু তুমিও ডাক্‌লে না, আমিও ডাকার মত জোর পেলাম না। অথচ কাল কিছুতেই তোমার প্রস্তাবে রাজী হ'তে পারি নি। তোমার দাদা এখানে নেই, এটা কোন কারণই নয়, ও কেবল বড় কথার আড়ালে নিজেকে লুকানোর ছল মাত্র। আসল কথা, তুমি এবার আমায় তেমন কোরে টান্‌তে পারো নি, যেমন প্রথমবারে পেরেছিলে, যেবারে আমি তোমায় টলাতে পারিনি আমার সমস্ত আবেগ দিয়েও।

রমেন থামিল। সুবোধ বলিল—চমৎকার শেষ হয়েছে গল্প, এরপরে যদি কিছু থাকে, তা আমি শুন্‌তে চাইনে।

শৈলেন বলিল,—তাহ'লে ত আমার সমালোচনা আরম্ভ কোরতে হয়।

রমেন বলিল—তাই হোক্।

শৈলেন রমেনের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল—তুই ভাবছিস্ খুব একটা জটিল চরিত্রের অবতারণা করেছিস্। আমার কাছে তা মোটেই মনে হয় না। আমি দেখ্‌ছি, তিনি প্রবল শক্তির আধার। নীতিবাগীশেরা তাঁর প্রথম রাত্রির উচ্ছ্বাসটাকেই দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু তাঁর সুকঠোর সংযম ও তীক্ষ্ণ আত্মবিশ্লেষণ তাদের চোখে পড়বে না। অমন কোরে নিজেকে খুঁজে দেখ্‌তে পাবার চেয়ে শক্ত কাজ মানুষের আর নেই, এ শক্তি যাঁর আছে, আমি তাঁকে প্রণাম করি।

রমেন রহস্যময় ভাবে হাসিতে লাগিল। পরেশ বলিল—তাঁর সঙ্গে আলাপ করা যায় না? তিনি আজকাল কোথায়?

রমেন আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

পরেশ জিজ্ঞাসা করিল—তার মানে, মারা গেছেন?

শান্তভাবেই রমেন বলিল—হাঁা, আত্মহত্যা কোরে।

সমস্বরে প্রশ্নবর্ষণ হইল—কেন? কেন?

রমেন বলিল—তাঁর এক গুপ্ত প্রণয়লীলা প্রকাশ পাওয়ায়।

শৈলেন টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুবোধ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—Clean bowled.

সেদিনকার মত তর্ক অমীমাংসিত রহিয়া গেল।

শ্রীধীরাজকুমার হালদার

———

কবিতাগুচ্ছ

মাঘের আশ্বাস

জানিলাম এ হৃদয় একেবারে মরু না,
ঋতুপতি আজো দেখি করে তা'রে করুণা।
মাঘে তা'র সুরু হোলো অনুকূল কর দান,
কোন্ মায়া-মন্তরে অন্তরে বরদান,
ফাল্গুনে কুসুমিতা কী মাধুরী তরুণা,
পুলকে পলাশবীথি স্মৃতিরাগে অরুণা।

নীরবে করবী যবে আশা দিল হতাশে
ভুলেও তোলেনি মোর বয়সের কথা সে।
ঐ দেখো অশোকের শ্যাম ঘন আঙিনায়
কৃপণতা কিছু নাই ফাগুনের রাঙিনায় ;
সৌরভ-গরবিণী তারা-মণি লতা সে
আমার ললাট 'পরে কেন অবনতা সে।

চম্পক তরু মোরে প্রিয় সখা জানে যে,
গন্ধের ইঙ্গিতে কাছে তাই টানে যে।
মধুকর-বন্দিত নন্দিত সহকার
মুকুলিত নত শাখে মুখে চাহে কহ কার ;
ছায়াতলে মোর সাথে কথা কানে কানে যে ;
দোয়েল মিলায় তান সে আমারি গানে যে।

পিক-রবে সাড়া যবে দেয় পিক-বনিতা,
কবির ভাষায় সে যে চায় তারি ভনিতা।
বোবা দক্ষিণ হাওয়া ফেরে হেথা সেথা হায়,
আমি না রহিলে বলো কথা দেবে কে তাহায়!
পুষ্পচয়িনী বধূ কঙ্কণ-ক্বণিতা,
অকথিতা বাণী তা'র কার সুরে ধ্বনিতা॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৩৮]

ক্যাম্পে

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প্ আমি ফেলিয়াছি ;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি,—
কাহারে সে ডাকে!

কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার ;
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন,
এইখানে বিছানায় শুয়ে শুয়ে
ঘুম আর আসে নাকো
বসন্তের রাতে।

চারিপাশে বনের বিস্ময়,
চৈত্রের বাতাস,
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন!
ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে ;
কোথাও অনেক বনে—যেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই
পুরুষ-হরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার ;
তাহারা পেতেছে টের,
আসিতেছে তার দিকে।
আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে ;
তাহাদের হৃদয়ের বোন
বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে
জ্যোৎস্নায়,—
পিপাসার সান্ত্বনায়—আঘ্রাণে—আস্বাদে!
কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নাই আর যেন!
মৃগদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট ভয় নাই,
সন্দেহের আব্ছায়া নাই কিছু ;
কেবল পিপাসা আছে,
রোমহর্ষ আছে।

কবিতাগুচ্ছ

মাঘের আশ্বাস

জানিলাম এ হৃদয় একেবারে মরু না,
ঋতুপতি আজো দেখি করে তা'রে করুণা।
মাঘে তা'র সুরু হোলো অনুকূল কর দান,
কোন্ মায়া-মন্তরে অন্তরে বরদান,
ফাল্গুনে কুসুমিতা কী মাধুরী তরুণা,
পুলকে পলাশবীথি স্মৃতিরাগে অরুণা।

নীরবে করবী যবে আশা দিল হতাশে
ভুলেও তোলেনি মোর বয়সের কথা সে।
ঐ দেখো অশোকের শ্যাম ঘন আঙিনায়
কৃপণতা কিছু নাই ফাগুনের রাঙিনায় ;
সৌরভ-গরবিণী তারা-মণি লতা সে
আমার ললাট 'পরে কেন অবনতা সে।

চম্পক তরু মোরে প্রিয় সখা জানে যে,
গন্ধের ইঙ্গিতে কাছে তাই টানে যে।
মধুকর-বন্দিত নন্দিত সহকার
মুকুলিত নত শাখে মুখে চাহে কহ কার ;
ছায়াতলে মোর সাথে কথা কানে কানে যে ;
দোয়েল মিলায় তান সে আমারি গানে যে।

পিক-রবে সাড়া যবে দেয় পিক-বনিতা,
কবির ভাষায় সে যে চায় তারি ভনিতা।
বোবা দক্ষিণ হাওয়া ফেরে হেথা সেথা হায়,
আমি না রহিলে বলো কথা দেবে কে তাহায়!
পুষ্পচয়িনী বধূ কঙ্কণ-ক্বণিতা,
অকথিতা বাণী তা'র কার সুরে ধ্বনিতা॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৫৮]

ক্যাম্পে

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প্ আমি ফেলিয়াছি ;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি,—
কাহারে সে ডাকে!

কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার ;
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন,
এইখানে বিছানায় শুয়ে শুয়ে
ঘুম আর আসে নাকো
বসন্তের রাতে।

চারিপাশে বনের বিস্ময়,
চৈত্রের বাতাস,
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন!
ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে ;
কোথাও অনেক বনে—যেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই
পুরুষ-হরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার ;
তাহারা পেতেছে টের,
আসিতেছে তার দিকে।
আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে ;
তাহাদের হৃদয়ের বোন
বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে
জ্যোৎস্নায়,—
পিপাসার সান্ত্বনায়—আঘ্রাণে—আস্বাদে!
কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নাই আর যেন!
মৃগদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট ভয় নাই,
সন্দেহের আব্ছায়া নাই কিছু ;
কেবল পিপাসা আছে,
রোমহর্ষ আছে।

মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময় !
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হ'য়ে উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তের রাতে ;
এইখানে আমার নকটার্ণ্—।

একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে,
সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে
দাঁতের-নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে অই
সুন্দরী গাছের নীচে—জ্যোৎস্নায় !—
মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে
হরিণেরা আসিতেছে।
—তাদের পেতেছি আমি টের ;
অনেক পায়ের শব্দ শোনা যায়,
ঘাইমৃগী ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়।

ঘুমাতে পারি না আর ;
শুয়ে শুয়ে থেকে
বন্দুকের শব্দ শুনি ;
তারপর বন্দুকের শব্দ শুনি।
চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণী আবার ডাকে ;
এইখানে প'ড়ে থেকে একা একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জমে ওঠে
বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে
হরিণীর ডাক শুনে শুনে।

কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া ;
সকালে—আলোয় তারে দেখা যাবে—
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা প'ড়ে আছে।
মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তারে এই সব।

আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাব,
...মাংস-খাওয়া হ'ল তবু শেষ ?
...কেন শেষ হবে ?
কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে ?
তাদের মতন নই আমিও কি ?

কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকে নি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
অই ঘাইহরিণীর মত ?

আমার হৃদয়—এক পুরুষহরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমারে কি চায় নাই ধরা দিতে ?
আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মত
যখন ধূলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মত তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে ?

তুমিও কাহার কাছে শিখেছিলে !
মৃত পশুদের মত আমাদের মাংস ল'য়ে আমরাও প'ড়ে থাকি ;
বিয়োগের—বিয়োগের—মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মত—।
প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন ল'য়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই ;
পাই না কি ?

দোনলার শব্দ শুনি।
ঘাইমৃগী ডেকে যায়,
আমার হৃদয়ে ঘুম আসে নাকো
একা একা শুয়ে থেকে ;
বন্দুকের শব্দ তবু চুপে চুপে ভুলে যেতে হয়।

ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে ;
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা মরে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এল যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন ;—
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরো হৃদয়
কথা ভেবে—কথা ভেবে—ভেবে।

মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময় !
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হ'য়ে উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তের রাতে ;
এইখানে আমার নক্‌টার্ণ্‌—।

একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে,
সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে
দাঁতের-নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে অই
সুন্দরী গাছের নীচে—জ্যোৎস্নায় !—
মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে
হরিণেরা আসিতেছে।
—তাদের পেতেছি আমি টের ;
অনেক পায়ের শব্দ শোনা যায়,
ঘাইমৃগী ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়।

ঘুমাতে পারি না আর ;
শুয়ে শুয়ে থেকে
বন্দুকের শব্দ শুনি ;
তারপর বন্দুকের শব্দ শুনি।
চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণী আবার ডাকে ;
এইখানে প'ড়ে থেকে একা একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জমে ওঠে
বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে
হরিণীর ডাক শুনে শুনে।

কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া ;
সকালে—আলোয় তারে দেখা যাবে—
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা প'ড়ে আছে।
মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তারে এই সব।

আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাব,
...মাংস-খাওয়া হ'ল তবু শেষ ?
...কেন শেষ হবে ?
কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে ?
তাদের মতন নই আমিও কি ?

[৭৭

১৩৩৮]

কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকে নি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
অই ঘাইহরিণীর মত ?

আমার হৃদয়—এক পুরুষহরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমারে কি চায় নাই ধরা দিতে ?
আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মত
যখন ধূলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মত তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে ?

তুমিও কাহার কাছে শিখেছিলে !
মৃত পশুদের মত আমাদের মাংস ল'য়ে আমরাও প'ড়ে থাকি ;
বিয়োগের—বিয়োগের—মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মত—।
প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন ল'য়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই ;
পাই না কি ?

দোনলার শব্দ শুনি।
ঘাইমৃগী ডেকে যায়,
আমার হৃদয়ে ঘুম আসে নাকো
একা একা শুয়ে থেকে ;
বন্দুকের শব্দ তবু চুপে চুপে ভুলে যেতে হয়।

ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে ;
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা মরে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এল যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন ;—
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরো হৃদয়
কথা ভেবে—কথা ভেবে—ভেবে।

মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময় !
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হ'য়ে উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তের রাতে ;
এইখানে আমার নকটার্ণ্—।

একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে,
সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে
দাঁতের-নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে অই
সুন্দরী গাছের নীচে—জ্যোৎস্নায় !—
মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে
হরিণেরা আসিতেছে।
—তাদের পেতেছি আমি টের ;
অনেক পায়ের শব্দ শোনা যায়,
ঘাইমৃগী ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়।

ঘুমাতে পারি না আর ;
শুয়ে শুয়ে থেকে
বন্দুকের শব্দ শুনি ;
তারপর বন্দুকের শব্দ শুনি।
চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণী আবার ডাকে ;
এইখানে প'ড়ে থেকে একা একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জমে ওঠে
বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে
হরিণীর ডাক শুনে শুনে।

কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া ;
সকালে—আলোয় তারে দেখা যাবে—
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা প'ড়ে আছে।
মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তারে এই সব।

আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাব,
...মাংস-খাওয়া হ'ল তবু শেষ ?
...কেন শেষ হবে ?
কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে ?
তাদের মতন নই আমিও কি ?

কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকে নি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
অই ঘাইহরিণীর মত ?

আমার হৃদয়—এক পুরুষহরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমারে কি চায় নাই ধরা দিতে ?
আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মত
যখন ধূলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মত তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে ?

তুমিও কাহার কাছে শিখেছিলে !
মৃত পশুদের মত আমাদের মাংস ল'য়ে আমরাও প'ড়ে থাকি ;
বিয়োগের—বিয়োগের—মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মত—।
প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন ল'য়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই ;
পাই না কি ?

দোনলার শব্দ শুনি।
ঘাইমৃগী ডেকে যায়,
আমার হৃদয়ে ঘুম আসে নাকো
একা একা শুয়ে থেকে ;
বন্দুকের শব্দ তবু চুপে চুপে ভুলে যেতে হয়।

ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে ;
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা মরে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এল যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন ;—
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরো হৃদয়
কথা ভেবে—কথা ভেবে—ভেবে।

মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময় !
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হ'য়ে উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তের রাতে ;
এইখানে আমার নকৃটার্ণ্—।

একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে,
সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে
দাঁতের-নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে অই
সুন্দরী গাছের নীচে—জ্যোৎস্নায় !—
মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে
হরিণেরা আসিতেছে।
—তাদের পেতেছি আমি টের ;
অনেক পায়ের শব্দ শোনা যায়,
ঘাইমৃগী ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়।

ঘুমাতে পারি না আর ;
শুয়ে শুয়ে থেকে
বন্দুকের শব্দ শুনি ;
তারপর বন্দুকের শব্দ শুনি।
চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণী আবার ডাকে ;
এইখানে প'ড়ে থেকে একা একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জমে ওঠে
বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে
হরিণীর ডাক শুনে শুনে।

কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া ;
সকালে—আলোয় তারে দেখা যাবে—
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা প'ড়ে আছে।
মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তারে এই সব।

আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাব,
...মাংস-খাওয়া হ'ল তবু শেষ ?
...কেন শেষ হবে ?
কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে ?
তাদের মতন নই আমিও কি ?

কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকে নি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
অই ঘাইহরিণীর মত ?

আমার হৃদয়—এক পুরুষহরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমারে কি চায় নাই ধরা দিতে ?
আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মত
যখন ধুলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মত তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে ?

তুমিও কাহার কাছে শিখেছিলে !
মৃত পশুদের মত আমাদের মাংস ল'য়ে আমরাও প'ড়ে থাকি ;
বিয়োগের—বিয়োগের—মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মত—।
প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন ল'য়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই ;
পাই না কি ?

দোনলার শব্দ শুনি।
ঘাইমৃগী ডেকে যায়,
আমার হৃদয়ে ঘুম আসে নাকো
একা একা শুয়ে থেকে ;
বন্দুকের শব্দ তবু চুপে চুপে ভুলে যেতে হয়।

ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে ;
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা মরে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এল যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন ;—
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরো হৃদয়
কথা ভেবে—কথা ভেবে—ভেবে।

এই ব্যথা,—এই প্রেম সব দিকে র'য়ে গেছে,—
কোথাও ফড়িঙে-কীটে,—মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবনে।
বসন্তের জ্যোৎস্নায় অই মৃত মৃগদের মত
আমরা সবাই।

শ্রীজীবনানন্দ দাস

মৃন্ময়ী

মৃন্ময়ী আমার!
ধূলিম্লান ধরার দুলালী।
ক্ষণিক লহরীলীলা শাশ্বত কালের পারাবারে!
তোমারি ক্ষুধিত প্রতীক্ষায়
মন মোর ব'সে আছে সারা দিন সারা রাত্রি ধরি
ইন্দ্রিয়-দুয়ারে
আমার দেহের কুঞ্জগেহে;
এসো অভিসারে,—
মোদের অনবকাশ সম্ভোগের বসন্ত-উৎসবে
জাগ্রত লুটাবে ঘুমে, তন্দ্রাহত উঠিবে জাগিয়া!

তোমার আমার মাঝে যে-বিরহ রাজে
তা'রি অন্তরালে
অনন্ত আনন্দলোক!
পাষাণ যবনি
টুটিয়া ফেলিতে হবে।
অয়ি মোর মুক্তিবীজ, দীপ্তিমতী কামিনীর রূপে
একবার এসো তুমি, প্রিয়া।
বাসনার পদ্মাসনে
তোমার আমার যোগ সিদ্ধ হোক্ পরিপূর্ণ হোক্।
—তারপর বিসর্জ্জন!
কা'র?
তোমার আমার—
চির-অর্দ্ধ জাগরিত নারীপুরুষের!

আমার বক্ষের মাঝে যে তুমি হারায়ে আছ যুগযুগান্তর,
তা'রে আমি পাবো;
তোমারো অন্তরলোকে যে আমারে তুমি চেন নাই,
তুমিও পাইবে তা'রে!
তুমি পূর্ণ, আমি পূর্ণ—
প্রত্যেকের সার্থকতা প্রত্যেকের মাঝে
অখণ্ড মিলনে!···

এসো মোর ক্ষণিকা মৃন্ময়ী!
এসো মোর অনাগতা চিরন্তন যুগের চিন্ময়ী!

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

উর্ব্বশী

আমি নহি পুরুরবা, হে উর্ব্বশী
ক্ষণিকের মরঅলকায়
ইন্দ্রিয়ের হর্ষে জানো গড়িয়াছি আমার ভুবন?
এসো তুমি সে ভুবনে কদম্বের রোমাঞ্চ ছড়ায়ে
রহো ক্ষণকাল সেথা
তোমার দেহের হায় অন্তহীন আমন্ত্রণবীথি
ঘুরিতে সময় নাই—শুধু তুমি রহো ক্ষণকাল
ক্ষণিকের আনন্দআলোয়
অন্ধকার আকাশসভায়
নগ্নতা-প্রদীপ্ত তনু জ্বালাইয়া দাও আজ নৃত্যময় দীপ্ত দেয়ালিতে।
আর রাত্রি. র'বে কি উর্ব্বশী
আকাশের নক্ষত্রসভায়, রজনীর শব্দহীনতায়
রাহুগ্রস্ত হয়ে মোর বাহুবন্ধে পৃথিবীর নারী
পরশ-কম্পিত দেহ সলজ্জ উৎসুক?
আমি নহি পুরুরবা, হে উর্ব্বশী
আমরণ আসঙ্গলোলুপ
আমি জানি আকাশ পৃথিবী
আমি জানি ইন্দ্রধনু প্রেম আমাদের।

শ্রীবিষ্ণু দে

সন্ধ্যায়

কিসের তানে পাগল পারা এমনি হ'য়ে আপন হারা
সন্ধ্যেকালে আকাশ চেয়ে থাকে,
কোন্ বেদনার মধু পিয়ে সান্ধ্য সুনীল আকাশ দিয়ে
সাঁঝের পাখী এমনি ক'রে ডাকে !
ওই ওপারে নদীর তীরে চখা চখী ঘুরে ফিরে
আপন প্রাণের প্রণয়-ব্যথা জাগায়,
নদীর স্রোতে জলের তানে কার বা কুহক-ভরা গানে
আকুল-করা কি সুর যেন লাগায় ;
তাল শুপুরীর ফাঁকে ফাঁকে অস্ত-রবি রশ্মি রাখে,
দূরে দূরে আঁধার বাসা বাঁধে,
এম্‌নি সাঁঝের মুখরতায় কি সুর লাগে কি কব তায়,
প্রাণ যে আমার গাইতে গিয়ে কাঁদে !

* * * *

সে বুঝি কোন সাগর-পারে, আকুল-কাঁদা নদীর ধারে
শ্বশুর-বাড়ী পাঠিয়ে-দেওয়া মেয়ে,
সারা দিনের ঘোম্‌টা-ঢাকা চোখ ছুটোতে বিষাদ মাখা,
কতই কাঁদন বুকটী আছে ছেয়ে ;
সেই সাগরের পারের বালা গলায় দোলে ছুখের মালা
আকাশ-পথে শ্বশুর-বাড়ী যায়,
তার বুঝি বা আঁচল হ'তে একখানি সুর নদীর স্রোতে
পড়ল খ'সে—বাজ্‌ল সকল গাঁ'য় ।
তা'র বুঝি বা চুলের বাসে কতই নিবিড় ব্যথা ভাসে,
কতই আঁধার-করা জাগে গান,
তাই বুঝি আজ সন্ধ্যেকালে ওই আকাশের ভালে ভালে
সেই ব্যথাতে ভর্‌ল জগৎখান ।
সে কোন চির ছুখের পালা, আঁখির পাতে বিষাদ ঢালা,
চিকণ চাঁচর আঁধার-মসী মাখা,
তার ব্যথাতে আকাশ কাঁদে, আঁধার ধীরে বাসা বাঁধে,
সাঁঝের ঘোরে যেন বাছুড়-পাখা ।

* * * *

এম্‌নি করুণ কোমল সাঁঝে দেয় ভুলায়ে সকল কাজে,
দেয় ভুলায়ে প্রাণের সমারোহ,
একটী কথা মনে মনে শুধুই জাগে ক্ষণে ক্ষণে—
ছিন্ন বুঝি জীবনের সব মোহ ।
জীবন-উষার সাতটী রঙে বাঁধবে না আর আলিঙ্গনে
প্রাণের-তলের রঙিন দেবতারে ;
অশ্রুজলের একটা নদী বইবে কি রে নিরবধি
মিথ্যা করি সুখের বারতারে ।
এম্‌নি ব্যথায় ভরা সাঁঝে শেষ পূরবীর বাঁশি বাজে,
জ্বালায় যেন জীবনের শেষ চিতা,
কোথায় প্রাণের উচ্চ আশা, প্রিয়ার কানে মিষ্টি ভাষা,
কোথায় স্বজন বন্ধু প্রাণের মিতা ;
কোথায় ঝুলন, কোথায় দোলা, প্রখর দিনের আপন-ভোলা
গভীর কিম্বা হাল্‌কা সে-সব বাণী,
হঠাৎ দেখি আঁধার ঘেরে জেগে উঠি শুন্‌তে যে রে-
আকাশ-ভরা তারার কানাকানি ।

* * * *

সুধাই একটী তারার কানে স্বপন মাঝে সে কি জানে
ধরাতলের একটী ছোট মেয়ে,
কোন্ সে সাগর পারের বালা গলায় দোলে ছুখের মালা,
কতই কাঁদন বুকটী আছে ছেয়ে ।
সে কি জানে মর্ত্ত্যমনে যে-রস আছে সঙ্গোপনে,
যে-ফুল ফোটে ধরার হিয়া ভেদি,
যে-গান জাগে চোখের কোণে, ঠোঁটের হাসি যে-সুর বোনে
সকল ভীতি সংশয়েরে ছেদি' ;—
সে কি জানে—জানে ?—জানে ? যেথায় সহজ প্রাণের গানে
সরম ছাপি' উঠেছে এক গেহ,
ছুইটী আঁখি একটী হিয়া উচ্ছ্বসিয়া উন্মুখিয়া
আছে ধরি শ্রদ্ধা প্রেম ও স্নেহ !

* * * *

লক্ষ তারার কানে কানে সুধাই তাদের কেউ কি জানে
মহীর 'পরে একটী ছোট প্রিয়া,

হেলেন কিম্বা বেয়াত্রিচে যাহার কাছে সবাই মিছে
মিছে লয়লা জুলিয়েতের হিয়া ;
ক্লিওপেট্রার সকল মোহ, শেবার রাণীর সমারোহ
খিন্ন যাহার একটী হাঁসির টানে,—
মোনা লিসার ঠোঁটের হাঁসি, আফ্রেদিতের দেহের বাঁশি
মিলাল যার একটী দিঠির গানে।
বিশাল মরুভূমির বুকে স্বচ্ছ শীতল উৎস-মুখে
একটী যেন ফোটা-ফুলের কলি,
ওই আকাশের কোন তীরে ইহার তুল্য আছে কি রে
এম্‌নি মায়া কোথাও ওঠে ছলি !
লক্ষ তারার কানে কানে সুধাই তাদের কেউ কি জানে
এম্‌নি মহীর একটী ছোট প্রিয়া,—
হেলেন লয়লা বেয়াত্রিচে জুলিয়েত ও মোনালিসে
সৃষ্টি যাহার সবায় মিশাইয়া !

* * * °

ওই আকাশের দিকে দিকে চেয়ে চেয়ে অনিমিখে
অবশেষে সুধাই কোটী তারায় ঃ—
সেই নীলিমার স্বচ্ছ স্রোতে রঙিন্ মুখে কোথাও হতে
তৃণের একটী ফুলও কি হাত বাড়ায় ?

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

লীলা-প্রেম

আমারে তুমি ভালো যে বাসো একথা শুনি যবে,
হাসিনা মনে মনে,
পাছে সে হাসি পড়ে গো ধরা মনের কলরবে,
আমার আঁখি-কোণে।
তোমারে আমি বেসেছি ভালো একথা তবু মুখে
কহি গো অবকাশে ;

আমারি কানে ফিরিয়া যেন মধুর কৌতুকে
আমারে পরিহাসে।
তথাপি এই প্রেমাভিনয়ে আছে কি মধু জানি
"ভালো কি বাসো ? বাসি গো ভালো" চলিছে কানাকানি ॥

এমনি কথা এমনি সুরে আগে যে গেছে ক'য়ে,
তারে কি পড়ে মনে ?
দু'দিনে খেলা ফুরাবে যবে স্মৃতির ভার ব'য়ে
র'বে কি অকারণে ?
যাহারে পরে বাসিবে ভালো, বল সে কেন চুপে
সহিবে এত হেলা ?
এমনি চলে জীবন ভরি' ভালোবাসার রূপে
ভালোবাসার খেলা।
তবু সে খেলা মনের মাঝে কী যেন মধু ঢালে,
মিথ্যা, তবু পলকে প্রাণে প্রেমের দীপ জ্বালে ॥

বরণ তুমি করেছ মোরে এবার মোর বেলা
ভুলেছ তুমি যারে,
আমার মাঝে তাহারে তুমি করোনি অবহেলা
জানাই বারে বারে।
যে নবরূপে আমার প্রাণে বিছাও তব মায়া
নবীনতর সাজে ;
যে গেল আজ অতীতে মিশি এ তারি শুধু ছায়া
ভাবিতে মরি লাজে।
তাহারে আজ তোমার মাঝে টানি না অবমানে
প্রেমের খেলা অতীতে-চাওয়া-বিরহ নাহি জানে ॥

রুদ্ধ খেলাঘরের কোণে আড়ালে সদা রহি'
রচিনা কারাগারে,
ফুল্ল মুখে, হৃদয় তলে পাষাণ ভার বহি'
দহিনা আপনারে।
খেলায় যদি শ্রান্তি লাগে সহজে ভাঙ্গি খেলা,
করি না মিছে ভান ;
আহত-অভিমানের ছলে আরোপি' অবহেলা
খুঁজিনা পরিত্রাণ।

নূতন যদি সহজে আসি' চিত্ত করে জয়,
আদরে তারে বরিয়া লই করি না মিছে ভয়॥

জীবন মোর সরণে বাঁধা মরণে ঘেরা সীমা,
তাহারো পরে যদি
চিরদিনের বাঁধনে মোর ক্ষণিক মধুরিমা
বাঁধো গো নিরবধি ;
বরণময়ী ধরণী হ'তে তোমারে যদি আমি
আবরি চিরদিন,
স্মৃতির হিম সমাধি রচি' চির দিবস-যামী
আঁধারে র'বে লীন।
দোঁহার দোঁহে মরণ হানি' করি না অবমান,
মুক্তি-প্রাণ প্রেমের খেলা মোদের অবদান॥

মরণে মোরা করেছি জয় স্মরণে নাহি রাখি
ভাবনা নাহি মনে ;
জীবনে, মৃত পাষাণ ভারে, নিজেরে দিয়ে ফাঁকি,
বহিনা অকারণে।
খেলার বেলা ফুরালে মিছে অবোধ অভিমানে
মরিনা কভু শোকে
বিরহ ব্যথা করুণ সুরে রচি না বসি' গানে
অশ্রুভরা চোখে।
প্রাণের বেগে সমুখে চলি নূতন পরিচয়ে
জীবন মাঝে লভেছি মোরা মরণহীন জয়ে॥

দিলদার হুসেন

তবু তোমারেই ভালোবাসি মোর সর্ব্বনাশা

নিঃশেষে আজ ভাঙ্গিয়াছ মোর সকল আশা
তবু যে তোমারে কেন ভালবাসি, সর্ব্বনাশা!
এ কী রহস্য! এ কী বিচিত্র তোমার লীলা!
তব প্রেম তবু প্রাণে জাগে মোর অন্তঃশিলা
জানাতে তোমারে তাই বারে বারে হারাই ভাষা
সর্ব্বনাশা!

বসন্ত কবে এসেছিল মনে পুষ্পসাজে ;
তোমারি লাগিয়া অর্ঘ্য রচিনু সভয়-লাজে।
রঙীন বাসর-সঙ্গীতে মোর উদাস হিয়া ;
হৃদয়-সায়র উঠেছিল সুখে উচ্ছলিয়া ;
গন্ধধূপের সোহাগ জাগিল চিত্ত মাঝে,
স্নিগ্ধলাজে।

ভয়ে ভয়ে যবে চাহিনু তোমার ঘোম্‌টা খুলে
মোহন আবেশে উঠিল মুগ্ধ হৃদয় দুলে
যত কথা আমি রচেছিনু বসি নিরালা জাগি'
সব এলোমেলো হয়ে গেল হায়, কিসের লাগি'।
থমকি দাঁড়ানু তোমার রূপের সরসী-কূলে
চিত্ত দুলে!

আমার আনন উপরে তোমার নয়ন রাখি'
হত-অভিমানে চাহিলে হানিয়া রুদ্র আঁখি।
ভাষাহারা মোর বেপথু-চিত্ত সন্ধানিয়া
কী বুঝিলে ওগো! এখনো শ্রবণে উঠে রণিয়া
তোমার নিঠুর মধু কণ্ঠের ভর্ৎসনা কি,
দীপ্ত আঁখি ?

স্বপ্নে যেন সে নির্ম্মম বাণী বাজিল কানে
"জানো কি পুরুষ, এনেছ অর্ঘ্য কী সন্ধানে ?
মোর 'রূপ' চাহি 'আমারে' সহজে করিলে হেলা!
রূপ চাহ ? হায়, হের এ ধরণী রূপেরই মেলা।
আমারে উপেখি' আসিয়াছ এই মাটির টানে
কী সন্ধানে ?"

কহিলাম "নারী, তোমারি রূপের রূপকে গড়া
নিখিল জগৎ ; তাই মধুময় বসুন্ধরা।
তোমার রূপের মাধুরী জাগিছে সন্ধ্যারাগে,
প্রভাত-অরুণ-স্বপনে তোমারি মাধুরী লাগে,
তব যৌবনে ভরিয়াছে সুখে মৃত্যুজরা
বসুন্ধরা।

পুরুষ হইয়া হেরেছ কি তুমি আপন ছবি,
যে মোহন রূপে তোমারে হেরিছে মুগ্ধ কবি?
নিজেরে কখনো পুরুষ হইয়া বেঁধেছ বুকে,
দুই বাহু পাশে? কেমনে জানিবে কী মধু সুখে
হ'য়েছে উতল তব রূপ-লীলা-ছন্দ লভি'
মুগ্ধ কবি?

তোমারেই আমি বাসিয়াছি ভালো, সত্যকথা;
অপরূপ সেই তোমার রূপের সার্থকতা
তোমার দেহের দেউলে তোমারি অর্ঘ্য আনি,
দেবতা তুমিই, তব রূপখানি স্বর্গ মানি,
এ নহে গো মোর লুব্ধ প্রাণের আর্ত্তকথা
স্বার্থকথা।"

ক্ষণেক নীরবে শুনিলে আমার করুণ বাণী,
বুঝিবা বারেক কপোলে ছোঁয়ালে অরুণ পাণি,
আবেশে আশায় সকল চেতনা মুদিল আঁখি,
ক্ষণেকের আশা; হেরিলাম চেয়ে সকলি ফাঁকি।
মরীচিকা প্রায় মিলালে, জীবনে তৃষ্ণা হানি
হায় পাষাণি।

নির্ম্মূল তুমি করেছ আমার সকল আশা;
তবু তোমারেই ভালো বাসিয়াছি, সর্ব্বনাশা!
আমার দগ্ধ-চিত্তের এই এক মুঠো ছাই
তোমারেই আজ দিলাম কুড়ায়ে; আর কিছু নাই।
তোমারি আগুনে পুড়িয়া নিভেছে সব পিপাসা
সর্ব্বনাশা!

দিলদার হুসেন

অনুবাদ

বৃষ্টি পাইনের বনে

(গাব্রিয়েলে ডান্নুন্‌ৎসিওর মূল ইটালীয়ান কবিতা হইতে)

থাম। আজ বনানীর
প্রান্তদেশে, শুনিতে না পাই
কোনো কানাকানি কোনো
মানবের স্বরে। শুনি শুধু
দূরে কোন্ কথা
বৃষ্টি-ফোঁটা, পল্লবেতে
বলাবলি করে।
শোন, বৃষ্টি ঝরে
খণ্ড মেঘ হ'তে।
শোন, বন্ধ্যা টামোরিকো পরে
বৃষ্টি পড়ে ঝরি।
কণ্টকিত পাইনের পরে
বৃষ্টি পড়ে ঝরঝর ধারে।
মিরটোরে নাড়া দিয়ে
বৃষ্টি ঝরে পড়ে।
মঞ্জরিত জিনেষ্ট্রোর পরে
বৃষ্টি এসে নামে।
জিনেপ্রোর ফলে-ভরা শাখায় থমকে
বৃষ্টি বারে বারে।
বৃষ্টি ঝরে ঝর ঝর
মুখে আমাদের
বৃষ্টি পড়ে অনাবৃত
আমাদের হাতে।
বৃষ্টি পড়ে ফুরফুরে
বসনের পরে।
বৃষ্টি ঝরে খুলে-ধরা
মনের চিন্তায়।
বৃষ্টি ঝরে কণ্ঠের ধ্বনিতে।
যে কণ্ঠের সুরে
কাল তুমি ভুলেছিলে, আজ আমি
ভুলেছি ছলনে,
অয়ি এরমিওনে।
শুনিতে কি পাও? বৃষ্টি ঝরে
সঙ্গীহীন
তৃণপরে।
বৃষ্টি ধ্বনি কমে বাড়ে
বদলায় বায়ু-পথে
নির্ভরিয়া পল্লবের
ঘনতার পরে।
শোন, ঐ বৃষ্টির কান্নার
উত্তর দিতেছে
সঙ্গীত ঝিল্লীর।
যে ঝিল্লী
দখিনের বর্ষার বিলাপে
নাহি পায় ভয়।
ধূসর গগন হেরি যার নাহি ভয়।
পাইনের তরু
এক সুরে গান গায়। অন্য সুরে
গাহিছে মিরটো। জিনেপ্রোও
গেয়ে চলে আপনার সুরে।
নানা যন্ত্র যেন
বেজে ওঠে শত শত অঙ্গুলি পরশে।
মোরা দোঁহে ডুবে গেছি
বনানীর
প্রাণপূর্ণ অন্তরের তলে।
তব মুখ বৃষ্টি পিয়ে
হয়েছে মাতাল, সিক্ত সুকোমল
পল্লবের মত।
তব কেশ
ঝলসিছে আলোকিত
জিনেষ্ট্রোর মত।
হে ভুবন-বালা
যে নামেতে সবে তোমা' জানে,
সে যে—এরমিওনে।

পুরুষ হইয়া হেরেছ কি তুমি আপন ছবি,
যে মোহন রূপে তোমারে হেরিছে মুগ্ধ কবি?
নিজেরে কখনো পুরুষ হইয়া বেঁধেছ বুকে,
দুই বাহু পাশে? কেমনে জানিবে কী মধু সুখে
হ'য়েছে উতল তব রূপ-লীলা-ছন্দ লভি'
মুগ্ধ কবি?

তোমারেই আমি বাসিয়াছি ভালো, সত্যকথা;
অপরূপ সেই তোমার রূপের সার্থকতা
তোমার দেহের দেউলে তোমারি অর্ঘ্য আনি,
দেবতা তুমিই, তব রূপখানি স্বর্গ মানি,
এ নহে গো মোর লুব্ধ প্রাণের আর্ত্তকথা
স্বার্থকথা।"

ক্ষণেক নীরবে শুনিলে আমার করুণ বাণী,
বুঝিবা বারেক কপোলে ছোঁয়ালে অরুণ পাণি,
আবেশে আশায় সকল চেতনা মুদিল আঁখি,
ক্ষণেকের আশা; হেরিলাম চেয়ে সকলি ফাঁকি।
মরীচিকা প্রায় মিলালে, জীবনে তৃষ্ণা হানি
হায় পাষাণি।

নির্ম্মূল তুমি করেছ আমার সকল আশা;
তবু তোমারেই ভালো বাসিয়াছি, সর্ব্বনাশা!
আমার দগ্ধ-চিত্তের এই এক মুঠো ছাই
তোমারেই আজ দিলাম কুড়ায়ে; আর কিছু নাই।
তোমারি আগুনে পুড়িয়া নিভেছে সব পিপাসা
সর্ব্বনাশা!

দিলদার হুসেন

অনুবাদ

বৃষ্টি পাইনের বনে

(গাব্রিয়েলে ডান্নুন্‌ডসিওর মূল ইটালীয়ান কবিতা হইতে)

থাম। আজ বনানীর
প্রান্তদেশে, শুনিতে না পাই
কোনো কানাকানি কোনো
মানবের স্বরে। শুনি শুধু
দূরে কোন্ কথা
বৃষ্টি-ফোঁটা, পল্লবেতে
বলাবলি করে।
শোন, বৃষ্টি ঝরে
খণ্ড মেঘ হ'তে।
শোন, বন্ধ্যা টামোরিকো পরে
বৃষ্টি পড়ে ঝরি।
কণ্টকিত পাইনের পরে
বৃষ্টি পড়ে ঝরঝর ধারে।
মিরটোরে নাড়া দিয়ে
বৃষ্টি ঝরে পড়ে।
মঞ্জরিত জিনেষ্ট্রোর পরে
বৃষ্টি এসে নামে।
জিনেপ্রোর ফলে-ভরা শাখায় থমকে
বৃষ্টি বারে বারে।
বৃষ্টি ঝরে ঝর ঝর
মুখে আমাদের
বৃষ্টি পড়ে অনাবৃত
আমাদের হাতে।
বৃষ্টি পড়ে ফুরফুরে
বসনের পরে।
বৃষ্টি ঝরে খুলে-ধরা
মনের চিন্তায়।
বৃষ্টি ঝরে কণ্ঠের ধ্বনিতে।
যে কণ্ঠের স্বরে
কাল তুমি ভুলেছিলে, আজ আমি
ভুলেছি ছলনে,
অয়ি এরমিওনে।
শুনিতে কি পাও? বৃষ্টি ঝরে
সঙ্গীহীন
তৃণপরে।
বৃষ্টি ধ্বনি কমে বাড়ে
বদলায় বায়ু-পথে
নির্ভরিয়া পল্লবের
ঘনতার পরে।
শোন, ঐ বৃষ্টির কান্নার
উত্তর দিতেছে
সঙ্গীত ঝিল্লীর।
যে ঝিল্লী
দখিনের বর্ষার বিলাপে
নাহি পায় ভয়।
ধূসর গগন হেরি যার নাহি ভয়।
পাইনের তরু
এক সুরে গান গায়। অন্য সুরে
গাহিছে মিরটো। জিনেপ্রোও
গেয়ে চলে আপনার সুরে।
নানা যন্ত্র যেন
বেজে ওঠে শত শত অঙ্গুলি পরশে।
মোরা দোঁহে ডুবে গেছি
বনানীর
প্রাণপূর্ণ অন্তরের তলে।
তব মুখ বৃষ্টি পিয়ে
হয়েছে মাতাল, সিক্ত সুকোমল
পল্লবের মত।
তব কেশ
ঝলসিছে আলোকিত
জিনেষ্ট্রোর মত।
হে ভুবন-বালা
যে নামেতে সবে তোমা' জানে,
সে যে—এরমিওনে।

শোন, শোন,
বাতাস-ঝিল্লির গান
মূক হ'য়ে আসে
বর্ষণের বেড়ে চলা
ক্রন্দনের তলে।
তারি সাথে মেশে এসে
নিম্নে ঐ উপত্যকা হ'তে
দূরের ছায়ার সুর
ভগন কণ্ঠেতে।
ক্রমে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর,
শেষে থেমে যায়।
শুধু এক সুর
কেঁপে ওঠে পুনঃ, নিবে যায়,
জ্বলে ওঠে, কেঁপে মরে, শেষে যায়
নিবে।
সিন্ধুধ্বনি শোনা নাহি যায়।
শুধু শুনি পল্লবের পরে
বৃষ্টি পড়ে ঝরে।
বৃষ্টি সে রূপালি।
বৃষ্টি সে নির্ম্মল।
বৃষ্টি-ধ্বনি কমে বাড়ে
নির্ভরিয়া পল্লবের
ঘনতার পরে।
শোন,
মূক এবে
বায়ুর বলয়।
কিন্তু ঐ সুদূরের
জলার নন্দিনী
দাহুরী সে
গায় ঘন ছায়াতল হ'তে।
সে কোথায়? সে কোথায়?
নয়নপল্লবে তব নামে বরিষণে,
অয়ি এরমিওনে।

বৃষ্টি পড়ে তব কালো আঁখি...
যেন তুমি কাঁদিতেছ
সুখভরে, শুভ্র অশ্রু নয়।
যেন প্রায় কালো অশ্রু-রূপে
বাহিরিয়া আসিয়াছ তব দেহ...
বিশ্বভরা প্রাণ আছে আমাদের
নবীন দেহেতে।
বক্ষমাঝে প্রাণ আছে
অখণ্ড ফলের মত।
আঁখি-পাতা মাঝে আঁখি দুটী
যেন তৃণ মাঝে ঝরণার ধারা।
ওষ্ঠ মাঝে দন্ত পংক্তিগুলি
যেন তিক্ত বাদামের মত।
হাতে হাতে ধ'রে মোরা চলি।
কভু চলি দূরে সরে, কভু কাছে...
মালিওলো
সবুজ শক্তির স্পর্দ্ধা ভরে
জড়াইয়া ধরে
জানু।
কি কহে সে? কি কহে সে?
বৃষ্টি পড়ে ঝরঝরে
মুখে আমাদের।
বৃষ্টি পড়ে অনাবৃত
আমাদের হাতে।
বৃষ্টি পড়ে ফুর্‌ফুরে
বসনের পরে।
বৃষ্টি পড়ে খুলে-ধরা
মনের চিন্তাতে।
বৃষ্টি ঝরে কণ্ঠের ধ্বনিতে।
যে কণ্ঠের সুরে
কাল তুমি ভুলেছিলে,
আজ আমি ভুলেছি ...
অয়ি এরমিওনে॥

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুস্তক-পরিচয়

ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা—শ্রীঅনিলবরণ রায় (শ্রীঅরবিন্দ প্রণীত A Defence of Indian Culture-এর কয়েক অধ্যায়ের অনুবাদ)।

এই বইখানি শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী প্রবন্ধের বাঙ্গলা তরজমা। ভাষান্তর করেছেন তাঁর শিষ্য স্বনামখ্যাত অনিলবরণবাবু। প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় সহজ নয়, তাই ভাষা কতকটা কঠিন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তরজমা করার মুখ্য উদ্দেশ্য ভুললে ত চলবে না। যাঁরা ইংরেজী জানেন না, যাঁরা আসল বইখানা পড়তে পারেন না, প্রধানতঃ তাঁদের জন্য এই বই। সেদিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে, ভাষা আরও প্রাঞ্জল হওয়া উচিত ছিল, ভাবও যতদূর সম্ভব সোজা ক'রে দেওয়া উচিত ছিল। আমার মনে হয় না যে, তা'তে কিছু গাম্ভীর্য্যের হানি হ'ত।

এ রকম বই বের হওয়ার দরকার সম্বন্ধে মতভেদ হ'তে পারে না। অনেক লোকের আজও বিশ্বাস যে, এত কালের পুরানো এই দেশটায় শম, দম, ভেদ, দণ্ড ইত্যাদি রাজনীতি যথেষ্ট ছিল কিন্তু রাষ্ট্রনীতি কখনও ছিল না, প্রবল-প্রতাপ একচ্ছত্রী রাজা বাদশাহ ছিল কিন্তু গণতন্ত্র ছিল না। তাঁরা কবুল করেন যে, ভারতের সাবেক রাজত্বগুলোয় অত্যাচার অনাচার বড় একটা হ'ত না, মোটের উপর সুরাজ্য জিনিসটাই বেশী পরিচিত ছিল, কিন্তু তাঁরা কিছুতেই মান্‌তে চা'ন না যে, এই সুরাজ্যের পেছনে জনমত কি জনশক্তি ছিল। একথাটা ধ'রে নেওয়া যায় যে, একটা কিছুর ভয় না থাক্‌লে রাজারা খামখেয়ালী হ'য়ে থাকেন, কেননা এটা মানুষের স্বভাব। পরকালের ভয় সকলেরই থাকে বা থাকা উচিত, সেটা বেশী দূর যায় না। ইহকালের কোন রকম ভয় থাক্‌লেই রাজার মেজাজ ঠিক থাকে। আমাদের সেকালের রাজাদের এ রকম কোন ভয় ছিল কি? শত শত পুরানো গল্পে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, রাজারা মুনি-ঋষির শাপকে বড় ভয় করতেন। দুর্ব্বাসার ত কথাই নেই, যে কোনও ঋষি সামনে এলেই তাঁরা অস্থির হ'য়ে উঠতেন। আজকালকার রাজারা লাট সাহেবকে যা ভয় করেন তার চেয়ে অনেক বেশী সে ভয়। ঋষিরা মোটের উপর শান্ত-স্বভাব ছিলেন, আর যা আদেশ করতেন বা উপদেশ দিতেন তা ধর্ম্মের দিক্ থেকে। তাঁদের একটা কাজই ছিল যে, ভারতের রাজ্যগুলো ধর্ম্ম-রাজ্য নামের উপযুক্ত হয় এটা দেখা। আর এই দেখ্‌তেই মাঝে মাঝে হঠাৎ রাজসভায় উপস্থিত হ'য়ে রাজাকে সাবধান ক'রে দিয়ে যেতেন। আশ্চর্য্য যে, এই অতি পুরানো কাজের ধারা একালেও দেখা গেছে। শিবাজীর ছেলে শম্ভাজী যখন রাজা হ'য়ে অত্যাচারী যথেচ্ছাচারীর মত সব কাজ করতে আরম্ভ করলেন তখন গুরু রামদাস তাঁর মঠ থেকে এক চিঠি লিখে তাঁকে সাবধান ক'রে দিলেন। সে চিঠি আজও আছে, পড়তে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য সে চিঠি, প'ড়ে শম্ভাজীর মত দাম্ভিক খামখেয়ালী রাজা ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। পুরাকালে সব রাজ্যের সেরা ছিল কোশল রাজ্য, কেউ কি ভাবতে পারেন যে, এই কোশলের রাজারা বশিষ্ঠদেবের মতের বিরুদ্ধে কোনও কাজ কখনও করেছেন? শূদ্র তপস্যা করতে বসল, রামচন্দ্র তার মাথা কেটে ফেল্‌লেন। সে শূদ্র কিছু বিদ্রোহী নানাসাহেব ছিল না, যে তার প্রাণদণ্ড রাজার দেওয়াই চাই। রামও কিছু এমন

স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না যে, নিরো বাদশার রোম পোড়ানোর মত, কেবল মজা দেখবার জন্য শূদ্রের মাথা কাট্‌লেন। তবে হ'ল কি? রাম ঋষির আদেশ পালন করলেন, প্রেরণা এল ধর্ম্মের দিক্ থেকে; গীতার ভাষায় রাম হলেন নিমিত্ত মাত্র। হিন্দু রাজার আদর্শ এই রকমই ছিল, আর একালেও শিবাজী যে গুরুর গেরুয়া চাদরকে রাজনিশান ক'রে নিয়েছিলেন সেও এই পুরানো আদর্শ মনে রেখে। তার পর ধরা যাক রামের সীতা বর্জ্জন, সে কাজের মূলে কি ভাব ছিল? রাম ত আর সাহেবদের অষ্টম হেনরী ছিলেন না যে, এক স্ত্রীকে দূর ক'রে দিয়ে আর-একটা বিয়ে করবেন। সীতাকে বনে দিয়ে রামের কি অবস্থা হয়েছিল তা ত কত কবি বর্ণনা ক'রে গেছেন। রাম তবে একাজ করলেন কেন? রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ, কবির এই টীকা রাজা-শব্দের। দুর্ম্মুখ এসে রাজাকে জানালেন প্রজাদের ইচ্ছা কি। প্রজাবৎসল রাজা অমনি অন্য সব কথা ভুলে প্রজার সেই ইচ্ছার মত কাজ করলেন। প্রজাদের চোখ রাঙাতে হ'ল না, দরখাস্ত করতেও হ'ল না। কিন্তু রাজা প্রজার মন রাখবার জন্য নিজের মনে এত বড় ঘা মারলেন কেন? তিনি স্থির জানতেন যে, এই তাঁর ধর্ম্ম, যদি এই ধর্ম্মের অনুযায়ী কাজ তখন না করেন ত প্রজার ইচ্ছা পরে বশিষ্ঠদেবের মুখ দিয়ে তাঁর কানে পৌঁছলে তখন তা পালন করতেই হবে, উপরন্তু কিছু তিরস্কার তাঁর ভাগ্যে জুটবে। ধর্ম্মশাস্ত্র তাহ'লে কার কি কর্ত্তব্য ঠিক ক'রে দিয়েছে দেখা উচিত। প্রজা রাজাকে পিতার মত, দেবতার মত দেখ্‌বে। রাজা প্রজাকে পুত্রের মত দেখ্‌বেন। পরস্পরের এই সম্বন্ধ বজায় থাকে সেটা দেখ্‌বার ভার ঋষিদের উপর। এই অবস্থার মাঝে যে রাজারা রাজ্য চালাতেন, তাঁদের শক্তিকে অসীম কি অবাধ গতি কিছুতেই বলা যায় না। এই ছিল পুরানো হিন্দুরাজ্য।

পুরানো কিম্বা এখনকার ইউরোপীয় ধরণের গণতন্ত্রও যে এদেশে জানা ছিল না, তাও নয়। শ্রীঅরবিন্দ এগুলোর কথাও পাঠকদের বলেছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলে ছোট ছোট এরকম গণতন্ত্র অনেক ছিল। তার মধ্যে সব চেয়ে নামজাদা লিচ্ছবীদের রাজ্য। অন্য দু'তিনটে নামও পাওয়া যায়, যেমন ক্ষুদ্রক, মালবক, যৌধেয়। বড় সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো লোপ পায়। আমার নিজের মনে হয় যে, এই ধরণের রাষ্ট্র ভারতের নিজস্ব নয়, সম্ভবতঃ ভারতের উত্তর হ'তে এসে ঢুকেছিল। এদেশে কোনও চিহ্ন রেখে যেতে পারে নাই। দক্ষিণ ভারতে চোল দেশে রাষ্ট্রের যে ধারা ছিল তা অন্য রকমের। শিলালিপি থেকে এই চোলমণ্ডলের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা'তে বোঝা যায় যে, রাজশক্তির সঙ্গে গণশক্তির কি অপরূপ সমন্বয় এই চোল রাষ্ট্রে হয়েছিল। দক্ষিণে এই গণতন্ত্র অনেকদিন পর্য্যন্ত ছিল, প্রায় মহম্মদ ঘোরীর আসা পর্য্যন্ত।

আর্য্য-রাষ্ট্রনীতির প্রধান কীর্ত্তিই হচ্ছে এই সমন্বয়। প্রজারা রাজাকে বাপের মত ভক্তি কর্‌ত বটে, কিন্তু রাজা তাঁর প্রজাদের নাবালক ছেলের মত দেখ্‌তেন না। কি নগরে, কি পল্লীতে, লোকে পাঁচজনে মিলে নিজেদের দরকারী সমস্ত কাজ নিজেরাই কর্‌ত। তা ছাড়া আরও কত রকমের সঙ্ঘ ছিল, যেমন এক-একটা জাতের, এক-এক শ্রেণীর ব্যবসাদারদের ইত্যাদি, তারাও আপন আপন ব্যবস্থা আপনি কর্‌ত। রাজা বা রাষ্ট্রপতির ভার ছিল এই সমস্ত ছোট ছোট সঙ্ঘগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা। এ কাজটাও কঠিন ছিল না। রাজা তাই প্রধানতঃ অন্য রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ, সন্ধি

ইত্যাদি ব্যাপার নিয়েই থাকতেন। অর্থাৎ একালের ভাষায় রাজা Foreign Ministry ও War Ministry নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, Home Department-এর কাজ প্রজারাই চালাত। সবাই নিজের নিজের কাজ ক'রে যেত, নিজের অভাব পূরণ করার ভার নিজেরাই নিয়েছিল। একটা বিরাট ধর্ম্মভাব সবাইকে এক ক'রে রেখেছিল। এই জন্য সেকালে জাতে জাতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ হ'য়ে রাজ্য ছারেখারে যেত না। সেদিন এক বাউলের গান শুন্‌লাম, তার ভাবটা এই যে, ফলের মধ্যে মধুর রসের সঞ্চার হ'লে, বাইরে বিচিত্র রং আপনি ফুটে ওঠে, কিন্তু কাঁচা ফলের উপর তুলি দিয়ে রঙ্গ ক'রে, অতি বড় নিপুণ চিত্রকরও ফল পাকাতে পারেন না। রাষ্ট্রনীতিতেও এ কথাটা বড় সত্যি। হিন্দুরা তা বুঝেছিলেন, তাই একেবারে ভেতরে স্বতন্ত্রতার স্বচ্ছন্দতার রস সঞ্চার করেছিলেন। আর আমরা বুঝি না ব'লেই বাইরে তুলি দিয়ে রঙ্গ ফলাচ্ছি। হিন্দু সভ্যতার অতি বড় দুর্দ্দিনেও Metcalfe (মেট্‌কাফ্‌) প্রভৃতি সাহেবরা এদেশের গ্রাম-পঞ্চায়েৎ দেখে অবাক্ হয়েছিলেন। তাঁরা গ্রামগুলোকে republic বা গণতন্ত্র নাম দিয়ে গেছেন আর বর্ণনা ক'রে গেছেন যে, কি সুন্দরভাবে তারা নিজেদের সব রকম কাজ চালাত।

উত্তর ভারতের ছোট ছোট রাজ্যগুলি সেকন্দর বাদশার দিগ্বিজয়ের পর আস্তে আস্তে লোপ পেল, আর তার জায়গায় একটার পর একটা বড় সাম্রাজ্য দেখা দিতে লাগ্‌ল। এই সব সাম্রাজ্যের কথা ইতিহাসের বইতে দু'চার পৃষ্ঠাতেই শেষ করা হয়, কিন্তু ব্যাপারটা চলেছিল আট নয় শতাব্দী ধ'রে। হিন্দু সভ্যতাকে বিদেশীর আক্রমণ থেকে বাঁচানোর দরকার যখন হ'ল, তখন এই সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তীরা দেখা দিলেন। ছোট ছোট রাজারা যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেও সেকন্দরের গতিরোধ করতে পারেন নি। মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত এই ব্যাপার দেখলেন আর বুঝলেন কোনখানটায় ভারতের গলদ। চাণক্যকে সহায় ক'রে তিনি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করলেন আর গ্রীকদের ভারতে ঢোকবার পথ বন্ধ ক'রে দিলেন। তার পরে এল, শক, হুন ইত্যাদি কত আধা জঙ্গলী জাত। আগেকার দিন হ'লে তারা হিন্দুসভ্যতা চুরমার ক'রে দিত। কিন্তু এই মহাবল সম্রাটদের জন্য তারা কিছুই করতে পারলে না। যা কিছু গোলমাল করল উত্তর পশ্চিমে, বেশী দূর দাঁত বস্‌ল না। ভেতরে যারা ঢুক্‌ল তারা কিছুদিন যেতে না যেতে ঘরের ছেলে হ'য়ে গেল। ভারতমাতা তাদের কোলে তুলে নিলেন।

এই সাম্রাজ্যের যুগের প্রথমের দিক্‌টায় ধর্ম্মরাজ্যের ভাব বজায় ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ সেটা কমে গিয়ে একটা স্বার্থপর, নির্ম্মম ধরণের নীতি রাজধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়াল। নানা শ্রেণীর প্রজাদের যে সব সঙ্ঘ ছিল কতক বা উঠে গেল, কতক বা বিগড়ে গিয়ে কিম্ভূতকিমাকার হ'য়ে গেল। এক মাত্র বেঁচে রইল গ্রাম-পঞ্চায়েৎগুলো। আলাদা আলাদা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তারা গ্রামের লোকের কল্যাণ করতে লাগ্‌ল বটে, কিন্তু একটা মস্ত বড় রাষ্ট্রের ভিত্তি ব'লে আর তারা রইল না।

রাষ্ট্রনীতি বিচার করতে গিয়ে ইতিহাসকে ত আর ভোলা যায় না। ক্রমশঃ হিন্দু সাম্রাজ্যগুলোর শেষ দিন এল। পাঠানরা এসে ভারত জয় কর্‌ল। হিন্দু সভ্যতার প্রশংসা যে করবে তাকেই কৈফিয়ৎ দিতে হবে হিন্দুর সর্ব্বনাশ কেন হ'ল। গ্রন্থকার সে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি বলেছেন, ভারত আজও মরে নি, আজও তার কাজ শেষ হয় নি। ঘোর অন্ধকার বটে, কিন্তু ভোরের আলো উঁকি

মারছে। এ কি "Poet of Patriotism"-এর কথা না "Prophet of Nationalism"-এর কথা ? শ্রীঅরবিন্দ একদিন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ছিলেন, আজ তিনি সিদ্ধ পুরুষ, তাঁর কথার আলোচনা কর্‌তে পারি, কিন্তু সমালোচনা করা আমার কাজ নয়।

প্রথমেই অনুবাদ সম্বন্ধে আমার মন্তব্য জানিয়েছি, আর-একটা কথা শুধু বলার আছে। বইখানায় ছাপার ভুল অনেক রয়ে গেছে, আর কোনও কোনও ভুল বিশ্রী রকমের।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

বিবাহের চেয়ে বড়ো—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন
অসমাপিকা—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
অকর্ম্মণ্য—শ্রীবুদ্ধদেব বসু (ডি, এম্, লাইব্রেরী)

"বিবাহের চেয়ে বড়ো" উপন্যাসে অচিন্ত্যকুমার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-সমালোচক-বৃন্দের সম্মিলিত কীর্ত্তির চেয়েও বড়ো কোন কীর্ত্তি রেখে যাবার জন্যই বোধ হয় অভিযান করেছেন। এর ওপর সমাজ ও যৌনতত্ত্বের টীকাকারদের পরাস্ত কর্‌তেও তিনি বদ্ধপরিকর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতগুলি প্রসঙ্গের ঠেসাঠেসিতে তাঁর সে অভিযান নিতান্তই অন্ধকূপ-হত্যায় পরিণত হয়েছে। উপন্যাসে মতামতের অবতারণা ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় হয়তো অসঙ্গত নয়, তবে সে মতামত ও বিদ্যাবুদ্ধির প্রকাশ গ্রন্থকর্ত্তার নিজের জবানীতে না-হয়ে, উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর চরিত্রসম্মত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু চরিত্রগুলিও অনর্গল বকে যাবে, আবার গ্রন্থকার নিজেও উঁচু গলায় স্ব মত জাহির করবেন, এটা বরদাস্ত হবার নয় ; কেননা, এতে রসবৈষম্য উপস্থিত হয়। অবশ্য রসের অধিকার ও রসবৈষম্য সম্বন্ধে গ্রন্থকারের যা ধারণা,—অন্ততঃ তাঁর লেখায় যা প্রকাশ পেয়েছে—তা মেনে নিলে এ সমালোচনা-প্রসঙ্গ এইখানেই ইতি কর্‌তে হয়। কেননা, তাঁর মতে পরিণতি, সঙ্গতি, সুষমা ইত্যাদি খুঁজ্‌তে যাওয়া নিতান্তই ছেলেমানুষী সুতরাং পরিহার্য্য। তাঁর বিশ্বাস, এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ও শরচ্চন্দ্র উপন্যাস লেখায় ফেল মেরেছেন। তাঁরা চেয়েছেন ঐ সব জিনিষ ; তাঁরা করেছেন নায়ককে বীর, মহনীয়, সচ্চরিত্র, না হয় "দুর্দ্দাম [illegible]", "জঘন্য হীন" বা এমনি একটা কিছু সুস্পষ্ট মানুষ। তাঁরা চেয়েছেন "গল্পে ঘটনা", তাঁরা চেয়েছেন "কবিতায় বোধ্যতা"। এর ওপরও রবীন্দ্রনাথ আবার ধমক খেয়েছেন, আত্মকাহিনী লিখ্‌তে গিয়ে তাঁর জীবনের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমস্ত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ না করার দোষে। "বায়রণ" থেকে "বঙ্কিম", "চরিত্রহীনের উপেন", শিশির ভাদুড়ীর "সীতা অভিনয়" "লুভারের মূর্ত্তি" ও "বিভূতি বাঁড়ুয্যের পথের পাঁচালী" ইত্যাদি যে-জিনিষগুলি সাধারণের কাছে ভিন্নভাবাপন্ন, সে-সমস্তই তাঁর কাছে এক—অর্থাৎ একই দোষে দুষ্ট,—সে-সমস্তই একটা বিশেষ কিছু করবার, একটা বিশেষ কিছু হ'য়ে দাঁড়াবার অভিলাষী। প্রকারান্তরে লেখকের মত এই যে, প্রকৃষ্ট চরিত্র সৃজন হবে অস্পষ্ট, অবোধ্য, অসংলগ্ন, অসম্ভাব্য। "আমি যা আমি তাই"—এই হবে

চরিত্রের প্রকৃত পরিচয়। অসঙ্কোচে এই সব মত গ্রন্থকার স্পষ্ট কথায় উপন্যাসের মধ্যেই ব্যক্ত করেছেন। বোধ হয় এ-তত্ত্বের সেরা উদাহরণ তাঁর নায়িকা অশ্রুর পরিকল্পনা। কিন্তু কোনমতেই আমি এ চরিত্রকে মর্য্যাদা দিতে পার্‌ব না। কেননা, চরিত্রটি বোধগম্য হয় নি। অবশ্য বোধগম্য হওয়াটাই আদর্শ নয়, এই হ'ল গ্রন্থকারের মত—এইখানেই আমাদের মধ্যে আসমান জমীর তফাৎ। আমি সেই দলের যারা মনে করে চরিত্রের একটা কিছু হওয়া চাই,—লম্পট হোক্, কামুক হোক্, ভীরু হোক্, বীর হোক্, বিদ্রোহী হোক্, প্রণয়ী হোক্, অথবা তার মনোগত বা চরিত্রগত দ্বন্দ্ব থাকুক্—একটা কিছু স্বরূপ চাই। কিন্তু কিছুই না হওয়াকে বা গ্রন্থকারের পাতায়-পাতায় লিপিবদ্ধ উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিতে পার্‌ব না।

গল্পটির এইখানে পরিচয় দিতে হ'ল, যদিও বিস্তর অসংলগ্ন বাক্যজালে ও পাত্রপাত্রিদের অসংলগ্ন ক্রিয়াজালে গল্পটি এমন বিজড়িত যে, তার পরিচয় দেওয়া এক অতীব দুরূহ ব্যাপার। নায়িকা অশ্রু জলপাইগুড়িতে টিচারি করে—গ্রন্থকার নায়িকার আর কোন পরিচয় না দিয়ে পাঠকের ওপর ভার দিয়েছেন এই থেকে অনুমান ক'রে নেবার যে, নায়িকা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা। নায়ক প্রভাত আপন বিবাহের জন্য তার দিদিকে সি-পি থেকে আন্‌তে গিয়ে অশ্রুর সাক্ষাৎ পায়, তাতেই হয় আলাপ ও প্রেম। সে প্রেমে বাধা প'ড়ে অশ্রুর পিতা অশ্রুর বিয়ে দেবার আয়োজন করায়, তাই বিবাহে সে মত দিলেও পাছে "বিয়েটা সুভোগ্য না হয়" এই আশঙ্কায় অশ্রু করে গৃহত্যাগ ও জলপাইগুড়িতে টিচারি গ্রহণ, সুতরাং নায়কের সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং নায়কেরও "বিয়ে অতএব হ'ল না"। এর পর যবনিকা ;—তিন বছর পরে তার উন্মোচন। এই তিন বছরের মধ্যে সামান্য একটু ঘটনা ঘটেছিল। অশ্রু নির্ম্মলকে জীবন নয়—তার যৌবন নিবেদন কর্‌তে চেয়েছিল, কিন্তু নির্ম্মল "বিবাহের চেয়ে বড়ো" এই অধিকারের মর্ম্ম বুঝ্‌তে না পেরে সম্ভোগের ডালি প্রত্যাখান করে। তখন অশ্রু প্রভাতকে পুনঃস্মরণ ক'রে চিঠি লিখে ডেকে পাঠায় তার সঙ্গে "বেরিয়ে যাবে" ব'লে। প্রভাত মাত্র ষাট টাকা মাইনের কেরাণী কিন্তু লেখাপড়ায় সুপণ্ডিত। রুশো ভল্‌টেয়ার, বাইরণ থেকে জেমস্ জইস, এড্‌গার ওয়ালেস্ থেকে মারি ষ্টোপস্, মায় এন্‌সাইক্লোপিডিয়া তার দখলে। তাই সে অশ্রুর চিঠি পেয়ে মাকে দেখাল ও মার অনুমতি নিয়ে অশ্রুর কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। মা সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন যে, সে যেন ছুটি নিয়ে যায়, নয়ত চাকরী খোয়া যাবে, তাই প্রভাত তিন দিনের ছুটি নিয়েছিল। তিন বছর পরে প্রেমিক প্রেমিকার দেখা, কিন্তু প্রেমালাপ তেমন কিছু হ'ল না, হ'ল তর্কালাপ। প্রভাত অবশ্য মনে মনে আশা করেছিল যে, প্রেম-জোয়ারে ভেসে সে অশ্রুর দেহকূলে এসে উত্তীর্ণ হবে কিন্তু নির্ম্মলের ভাগ্যে যা হ'তে পার্‌ত প্রভাতের ভাগ্যে তা জুট্‌লো না। শুধু ট্রেণে আস্‌বার সময় কামরায় প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক যাত্রীকে দেখিয়ে ও জানিয়ে হ'ল একটু "নিষ্ঠুর ওষ্ঠাধর সম্মিলন", একটু কাঁধে মাথা রাখা আর আলো নিবিয়ে দুজনের একটু নিবিড় বাহুবন্ধন। কল্‌কাতায় এসে অশ্রু গ্রাণ্ড্ হোটেলেই উঠ্‌ত ও হয়ত তার "কোন সাহেবের সঙ্গে বন্ধুতা করবার সুযোগো মিলে যেতো" কিন্তু তাতে বেজায় খরচ (!) তাই সে ক্যাল্‌কাটা হোটেলেই উঠ্‌ল। সেখানে অবশ্য প্রভাত শুধু দিনের বেলায় আস্‌তে পারে। কেননা, রাত্রে আসা হোটেলের ম্যানেজার "নিশ্চয় allow করবে না"। এলেন অশ্রুর কাকা,

অশ্রুর অপরাধ কবুল করাতে, কিন্তু তাতে পরাস্ত হ'য়ে প্রভাতকে ডেকে অশ্রুকে বিবাহ করতে বলায় নায়ক নায়িকা এই বর্ব্বর প্রস্তাবের জন্য তাঁকে দিলেন এমন বিক্রমের ধাক্কা যে, তিনি গেলেন "হাওড়া ব্রীজ থেকে গঙ্গায়" প'ড়ে। পাছে পাঠকের মনে আঘাত লাগে তাই গ্রন্থকার জানিয়ে দিয়েছেন যে, কাকাবাবু গঙ্গায় প'ড়ে গেলেও ডোবেন নি, কূল পেয়েছিলেন। তারপর অশ্রু গেল বেড়াতে, পাটনায় ব্রেক্ জার্নি ক'রে এলাহাবাদে, এবং কথা রইল যে, প্রভাত ছুটি নিয়ে দু'দিন পরে সেখানে এসে তার সঙ্গে যোগ দিয়ে যাবে লাহোরে। প্রভাত একবার আপত্তি করেছিল যে, এ যেন শুধু হ'য়ে কামস্কাট্কায় যাত্রা, কিন্তু অশ্রু প্রভাতের আপত্তিতে কর্ণপাত করে নি। এলাহাবাদে থাক্ত অশ্রুর পুরাতন প্রেমিক নির্ম্মল,—ইতিমধ্যে সে আবার অশ্রুরই কলেজের সহপাঠী ইন্দিরাকে বিবাহ করেছিল। অশ্রুর সেখানে যাবার উদ্দেশ্য ছিল তার সেই "অন্যতম শিকার" নির্ম্মলের জন্যে একটু "ওৎপেতে থাকার" ও তার পুরাতন প্রেম একটু তাতিয়ে নেবার। সে কথা ইন্দিরাকে সে খুলেই বলেছিল কিন্তু আসলে সব গোলমাল হ'য়ে গেল। কেন যে গোলমাল হ'য়ে গেল তা গ্রন্থকার নিজে ভাল ক'রে ব্যক্ত না ক'রে পাঠকের ওপরই ভার দিয়েছেন বুঝে নেবার জন্য। ব্যাপারটা মোটামুটি এই,—অশ্রু গিয়ে ইন্দিরার ডায়রি প'ড়ে জান্‌তে পারে যে, ইন্দিরার পূর্ব্বপ্রণয়ী রমাপতি এখনও ইন্দিরার হৃদয়-মন জুড়ে আছে কিন্তু পাছে স্বামী তা সন্দেহ করেন এই কারণে সে স্বামী সেবার ভান করে। আর-একটি জিনিষ অশ্রু দেখ্‌লে যে, ইন্দিরা "বন্দিনী তার দেহের কারাগারে" অর্থাৎ সে গর্ভবতী। অশ্রুর সঙ্গে ইন্দিরার এই নিয়ে অনেক তর্ক হ'ল। সে বল্লে, কেন ইন্দিরা রমাপতির সঙ্গে না হোক্ নিজেই বেরিয়ে যায় নি, কি অধিকার আছে তার স্বামীর তাকে তার দেহ-কারাগারে বন্দী করবার ইত্যাদি। রাত্রে কিন্তু নির্ম্মল বাড়ী এলে তার প্রতি অশ্রুর মনোভাব বিচার ক'রে স্বামী-প্রতারক ইন্দিরা হঠাৎ অত্যন্ত স্বামী-অনুরক্তা হ'য়ে পড়ল। কিন্তু সেজন্য নয়, আর-একটি কারণে অশ্রুর লাহোরযাত্রা ও জীবনযাত্রা বদলে গেল,—সে কারণ হচ্ছে নির্ম্মল অশ্রুকে প্রশ্ন করেছিল যে, সে কি প্রভাতকে ভালবাসে। অশ্রুর আর লাহোরের টিকিট কেনা হ'ল না। তা ছাড়া প্রভাত লিখেছিল যে, ভালবাসার জন্য চাকরী ছাড়তে হবে এমন ভালবাসা সে কাটিয়ে উঠেছে। সুতরাং অশ্রু কল্‌কাতায় ফির্‌ল, ও উঠ্‌ল গিয়ে প্রভাতেরই বাড়ী। সেখানে পৌছেই চা বানিয়ে ও নর্দ্দামা ধোবার সময় স্বয়ং মেথরাণীকে জল জুগিয়ে সে প্রভাতের মাকে একেবারে বশ ক'রে নিল। কিছু দিন যায়, রাত্রে সকল কাজ শেষ হ'লে ও সকলের শোয়া হ'লে সে প্রভাতের শয্যায় বসে তার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ শেষ ক'রে তাকে চুমু দিয়ে সে মায়ের কোলে গিয়ে শুয়ে পড়ে। এই দুটি কপোত কপোতীকে দেখে খুসী হ'য়ে মা অশ্রুর কাছে প্রস্তাব করলেন তার সঙ্গে প্রভাতের বিবাহের। এইখানেই হ'ল যত গণ্ডগোল—এই প্রাচীন বর্ব্বর প্রস্তাবে অশ্রু উল্লসিত হ'লো অথচ সশঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌ল। কেননা, স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন ও দৈহিক মিলন হ'লে তার যৌবনের সমুন্নত মহিমা যে বিনষ্ট হবে। অগত্যা তাকে বিবাহ অস্বীকার করতে হ'ল,—হতাশ হ'য়ে মা চলে গেলেন কাশী আর অশ্রু গেল ফিরে জলপাইগুড়িতে। যাবার আগে সে প্রভাতকে এই কথা বলে গেল যে, তার কাছে প্রভাতের অবারিত নিমন্ত্রণ; কিন্তু বিবাহের নয়, সম্ভোগের নয়। এ কিসের অবারিত নিমন্ত্রণ সে সমস্যার সমাধান করার ভার রইল পাঠকের ওপর।

এইখানে এই আখ্যানের শেষ,—কিন্তু একথা কি ব'লে দিতে হবে যে, এটা চিত্রও হয়নি চরিত্রও হয়নি, হয়েছে আবর্জ্জনা; সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে অনাসৃষ্টি। গ্রন্থকার অশ্রুকে নিয়ে কি করতে চেয়েছেন তা বোঝা যায় না কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাকে ক'রে তুলেছেন স্ত্রী-পুরুষের, এমন কি স্বামী-স্ত্রীর, মিলন-সম্ভোগের বিরোধী, সন্তানলাভের বিরোধী। মন্ত্রশক্তির নায়িকাও বিবাহ ও সম্ভোগের বিরোধী ছিলেন, তবে কি অশ্রু ছিল তার মত সংযমী, ব্রতচারিণী বা পূজারিণী? তা নয়, কেননা এদিকে অশ্রু নায়কের চুম্বন-আলিঙ্গনে সদাই উন্মত্ত, ওদিকে পূর্ব্ব প্রণয়ী নির্ম্মলের আসক্তি উজ্জীবিত করতে সুদূর জলপাইগুড়ি থেকে এলাহাবাদে ছুটে আস্‌তে ও নির্ম্মলেরই স্ত্রীর সহযোগিতা প্রার্থনা করতে কসুর করে না। এরকম উত্তেজনা-বিলাস ডাক্তারি শাস্ত্রে স্নায়বিক ব্যাধি বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে কিন্তু গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নয় অশ্রুকে ব্যাধিগ্রস্তা প্রচার করা। প্রকাশ্যে বলা হয়েছে, অশ্রু বিদ্রোহিনী কিন্তু তার বিদ্রোহ বুলির বিদ্রোহ, তার বিদ্রোহ ঘটনা-প্রমাদের নামান্তর। রোহিণী, শৈবলিনী, বিনোদিনী, কিরণময়ী—এঁরাও শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়েছিলেন কিন্তু তার অর্থ হচ্ছে যে, তাঁদের মধ্যে ছিলো সামাজিক শাসনের চেয়েও অধিক বলশালী কোনো শক্তির প্রণোদনা—কাম-উন্মাদনা, ব্যর্থতা বা নারীহৃদয়ের প্রহেলিকাময় কোনো নিগূঢ় কর্ম্মক্ষমতা। "লা গার্সনে"র নায়িকা "মোনিক" অসংযমের রসাতলে নেমে গিয়েছিলেন কিন্তু সে একরূপ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য, স্পর্দ্ধা জানাবার জন্য। এ সব বিদ্রোহে আছে বাঞ্ছিতের জন্যে দুঃখ বা লাঞ্ছনা বরণ। কিন্তু অশ্রুর কাম্য কি, প্ররোচনা কি? সে কাম্য সে প্ররোচনার পিছনে শক্তি কিসের? অশ্রুর বিদ্রোহজনিত দুঃখ কই, লাঞ্ছনা কই, সমাজ কই, শাসন কই? বিদ্রোহিনী অশ্রু সমস্তই বজায় রেখেছেন—আত্মপ্রসাদ, চরিত্র, নিষ্ঠা, চাকরী, প্রতিষ্ঠা! সমস্ত উপন্যাসটিতে, তার সমস্ত চরিত্রে, তার সকল স্থানে এই রকম অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন ভ্রান্তিবিলাস। বাক্যের সঙ্গে ভাবের সঙ্গতি নেই, ভাবের সঙ্গে কার্য্যের সঙ্গতি নেই, কার্য্যের সঙ্গে ফলাফলের সঙ্গতি নেই। জলপাইগুড়ি, কলিকাতা, এলাহাবাদ, পাটনা, ঘর-বাড়ী, পথ-ঘাট, বৃক্ষ-লতা—অচিন্ত্যকুমারের সৃষ্টিতে এসকলের প্রকৃতি বিলুপ্ত, মানুষ জীবনহীন, উদ্দেশ্যহীন—মেস্‌ম্যারাইজ্‌ড্‌। আছে যা না হ'লে অচিন্ত্যকুমারের লেখা সাঙ্গ হয় না,—নিরর্থক হত্যা, নিরর্থক মৃত্যু। এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে পদদলিত করবার আস্ফালন!

সাহিত্যে যাঁদের কথা প্রণিধানযোগ্য তাঁরা এই শ্রেণীর লেখকদের বহুবার বলেছেন যে, রুচি-সঙ্গত হোক্ অশ্লীল হোক্ গল্পে, উপন্যাসে ও চরিত্রে রসসৃষ্টি হওয়া চাই; কিন্তু সমস্তই বৃথা, সে-কথা আজও এই লেখকদের জ্ঞানগোচরে পৌছাল না। আরও স্থূল ভাষায় এঁদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, অঙ্কবার মত উপন্যাস রচনায় শুধু উত্তরটা রাইট্ হলেই হয় না, তার প্রণালীও রাইট্ হওয়া চাই। চরিত্র বা ঘটনা শক্তিমান লেখকের রচনা কৌশলেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রচনার সাহায্যে তিনি যা দাঁড় করাতে পারেন নি, শুধু বুলির সাহায্যে পাঠকের কাছ থেকে নম্বর আদায় করতে পারবেন না। দার্জ্জিলিং মেলে রেস্তরাঁ কার থাকে না, থাকলেও কেউ রাত্রি ১ টার সময় গিয়ে তাতে মাংসের ডিশ খেতে পায় না, ডাউন মেলের পথে পোড়াদহের পর সন্ধ্যার পরে না, আলো নেবানো কামরায় হাতের লেখা পড়া যায় না, সতেরো বছরের মেয়ে মাতৃপদস্থ স্ত্রীলোকের কাছে প্রথম দর্শনেই যমুনায় নৌকাবিহারে সখীসঙ্গের

লীলাকীর্ত্তন করে না,—প্রণয়িনীর প্রেমপত্র, বিশেষতঃ প্রেমাভিসারের আহ্বানপত্র কোন পুত্রই মাকে দেখায় না—ভাবরাজ্যেও না, ভূভারতেও না। সধবার একাদশীতে মা পুত্রের জন্য বেশ্যা আনিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু সধবার একাদশী প্রহসন, তা ছাড়া আবার স্থূল ক'রে বল্‌তে হচ্ছে, সধবার একাদশীতে পাত্রপাত্রীর ব্যাভিচারের জন্ম গ্রন্থকার পথ তৈরী করেছিলেন। "বিবাহের চেয়ে বড়ো"র গ্রন্থকার তা করতে পারেন নি। এ-উপন্যাসের চেয়ে রামশ্যাম সিরিজের অগণিত উপন্যাস ঢের বেশী বাস্তব, ঢের বেশী উপভোগ্য।

দেখা যাচ্ছে, অশ্রু-চরিত্র বাংলা উপন্যাসে শাশ্বত হ'তে চল্ল। 'অসমাপিকা' অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনা কিন্তু এ উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চেও নায়িকারূপে অশ্রুকেই উপস্থিত দেখতে পাই, অবশ্য ভিন্ন বেশে। অশ্রু বিবাহ করতে চায়নি। অসমাপিকার নায়িকা সুরুচি বিবাহিতা হ'য়েও বিবাহ করতে চায়—এই রকমের একটা-দুটো প্রভেদ আছে মাত্র। যখন দেখি সুরুচিও, অশ্রুর মত, যার জন্য গৃহত্যাগ করে তারই সাথে মিলনে বিমুখ হয়েছে তখন আর সন্দেহ থাকে না যে, যে-খামখেয়ালের বশে অশ্রুর উদ্ভব সেই খামখেয়ালেই সুরুচির জন্ম। একথা এইখানে বলা দরকার যে, গ্রন্থকার বাঙালী জীবনের যে-সমস্যাসৃজনের প্রয়াস করেছেন তা খুবই সমীচীন, কিন্তু সমস্যাটিকে তিনি ঠিকমত উপস্থিত করতে পারেন নি, বা তার সমাধান করতে পারেন নি। সুরুচির গৃহত্যাগ ও স্বামীত্যাগ নাকি পরপুরুষ-প্রণয়মূলক নয়, উদ্দেশ্যমূলক। কেননা, স্বামী ছিলেন অন্য-স্ত্রী-আসক্ত ও সুরুচির গর্ভস্থ সন্তান স্বামীর জবরদস্তির ফল, প্রেমের নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলা উপন্যাসে গল্পে Sex problem ও Romance হাত পা-ছড়াবার জন্যে বেশি জায়গা পায় না, এ-ক্ষেত্রে সে-সনাতন প্রশ্নের উত্থাপন ক'রে অন্নদাশঙ্কর হয়তো বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কিন্তু প্রশ্নের শুধু উল্লেখ করলেই হয় না, তার সঙ্গে পাঠকের সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দেওয়াও লেখকের কর্ত্তব্য। কিন্তু অসমাপিকায় সুরুচির স্বামীঘটিত দুর্গতির কথার উল্লেখ আছে বটে, তার সাক্ষাৎ নেই ; সুরুচির নব প্রেমিক সুচারুর সঙ্গে প্রেম-আলাপনের মধ্যে বিজ্ঞতার শিরশ্চালনটুকু আছে কিন্তু ঐকান্তিকতা নেই। উপন্যাসের রাজ্যে এমন দেখা যায় যে, সারা বইটির মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকার দেখা হ'ল মাত্র একবার, হয়ত তা মুহূর্ত্তেকের জন্য, হয়ত বা উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তারই অবসর হয় নি, অথচ লেখকের যাদুস্পর্শে সেই নির্ব্বাক ক্ষণিক সাক্ষাৎই প্রেমের অমৃতরসে সরস হ'য়ে উঠেছে। অসমাপিকায় কিন্তু সুরুচির সঙ্গে সুচারুর একহাজার একশো বার সাক্ষাৎ হ'লেও এবং সুরুচির সঙ্কোচহীনতার অশেষ বাড়াবাড়ি থাক্‌লেও লেখকের যাদুস্পর্শের অভাবে প্রেম সজীবিত হ'য়ে ওঠেনি। ফলে অনেক প্রকার প্রেমসঙ্কল্প ক'রে সুরুচি প্রেমিকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটাও পণ করলেন যে, প্রেমিকের সাথে কোনো রকমের অবৈধ মিলন তাঁ'র ঘটবে না।" এদিকে সুচারুও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, সন্তানবিরহিত প্রেম তার কাছে কথনো আমল পাবে না। ফলে সুরুচিও অশ্রুর মত চরিত্র ও নিষ্ঠা বজায় রেখে গৃহত্যাগের কীর্ত্তি মাথায় ক'রে পাঠককে হতভম্ব ক'রে দিলেন। এক-একবার সন্দেহ হয়, গ্রন্থকার প্রেমের গল্পই ঠিক লিখ্‌তে চেয়েছেন ত? আবার সন্দেহ হয় যে, বাংলার আধুনিক শিক্ষিত যুবক-যুবতী কি এমনি একটা সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত জিনিষ যে, শুধু ভান ক'রেই তারা প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে? হয়ত কেউ

বলবেন যে, নায়িকাচরিত্র ও তার সঙ্গতি-অসঙ্গতি নিয়ে আমি শুধু বাড়াবাড়ি করছি। কিন্তু প্রত্যেক চরিত্রই এই, সমস্ত বইটিই লেখকের অমনোযোগিতায় বা অক্ষমতায় ভরা। পার্শ্বচরিত্রগুলি এক-একটি ভাঁড়। উমা,—একটি ছোট মেয়ে,—বয়স পাঁচ কি পনেরো বোঝ্‌বার উপায় নেই, সুচারুর লক্ষ্মণসম সঙ্গী প্রবীর একটি মর্কট, তার প্রেমাভিসারিকা বাঘিনীসম মালিনী অসহ্য, সুচারু ও সুরুচির ফিরিঙ্গী ছদ্মবেশ হাস্যাস্পদ, ঘটনাবিন্যাস মেকো, কথোপকথন অযথা রূঢ় ও কুরুচিপূর্ণ।

আমি আগে লিখেছিলাম নারীচরিত্র সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের গল্পরচনা ও কবিতা একদেশদর্শিতারই আভাস দিয়েছে। অকর্ম্মণ্যে বুদ্ধদেব নারীচরিত্রের অন্য এক অংশ দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কেননা বাহ্যতঃ নায়ককে বাংলা সাহিত্যের রুডিন্ পদবাচ্য ক'রে ফুটিয়ে তোলাই অকর্ম্মণ্যের উদ্দেশ্য হ'লেও কার্য্যতঃ সেটা তেমন সফল হয় নি, প্রাধান্যলাভ করেছে নায়িকাদ্বয়ের মনোবৃত্তি। যে নারী-মনোবৃত্তি আপন নিগূঢ়তায় প্রহেলিকা দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সৃষ্টি করে, বুদ্ধদেব তাঁর পুরাতন নারীপ্রসঙ্গ ত্যাগ ক'রে এবার সেই মনোবৃত্তিকে উপাদান-রূপে ব্যবহার করেছেন। নায়িকাদ্বয় দুই সহোদরা ভগ্নী, জ্যেষ্ঠা অনসূয়া ধীর শান্ত, কনিষ্ঠা রিণি প্রগল্‌ভ, সপ্রতিভ, উদ্দাম ও অতি আধুনিক। যে সুখ যে সম্পদ নগৎ নগৎ পাওয়া যায় তাই তার কাম্য। উভয়েই গৃহাগত অতিথি শশাঙ্কের প্রতি অনুরক্ত; কিন্তু শশাঙ্ক প্রয়াসপরাঙ্মুখ 'রুডিন্'—অনসূয়া বা রিণি কারোর প্রতিই তার পক্ষপাত দেখা গেল না। এই সংস্থাপনের ওপর ভিত্তি ক'রে উপন্যাসে দুই ভগ্নীর চিন্তাধারা খুব প্রকটিত হয়েছে অনসূয়ার স্বগতোক্তিতে আর রিণির ডায়রী লেখায়। তার সঙ্গে আর-একটি চিন্তাধারা এসে যোগ দিয়েছে পাত্র-পাত্রিদের রিণিকে নিয়ে মুখে মুখে গল্প রচনায়। এই স্বতন্ত্র চিন্তাধারার চিত্রণে গল্পটির কথোপকথনে ও রিণির আপাতঃ-দুর্ব্বোধ্য কার্য্যকলাপে লেখক যে technique-এর পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয় এবং সেটি বুদ্ধদেবের নিজস্ব সম্পদ। তাঁর ভাষাও সমকক্ষহীন।

কিন্তু আসল জিনিষের সাক্ষাৎ নেই, সমস্ত দীপ্তি ভাষায় ও রচনায়; চরিত্রে নয় বা গল্পের আন্তরিক ঐক্যে নয়। মনে এমন সন্দেহেরও উদয় হয় যে, লেখকের অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব আছে, তাই এবারও তাঁর অঙ্কিত নারীমূর্ত্তি প্রাণবন্ত হ'তে পারে নি। অতি স্মার্ট ক'রে সম্পদশালী গৃহস্থের চিত্র আঁকতে গিয়ে লেখক ভুল করেন। পিতার পুত্র-আগমন-আশায় আয়োজন উদ্যোগ, বাবুর্চির নোংরামি, ডিনার-টেবিলের ব্যবস্থা, সতেরো বছরের রিণির পিয়ানো-সিদ্ধি ও Mozart এবং অখ্যাতনামা "স্যাঁ স্যাঁজ"-এ পারদর্শিতা—এগুলি নিতান্ত অবান্তর, এগুলি সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করার ফলেই লেখক শুধু প্রহসন ও বিকার তৈরী করেছেন। মোট কথা, খুব স্মার্ট হয়েছে বইখানি কিন্তু সার্থক হয় নি। বুদ্ধদেবের গল্প রচনায় যে দক্ষতার ইসারা পাওয়া গিয়েছিল তাঁর উপন্যাস রচনায় এখনও সে-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল না। অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসের সঙ্গে বুদ্ধদেবের উপন্যাসের সিদ্ধিতে বড় প্রভেদ নেই, তবে প্রভেদ এই যে, একজন বার বার তাঁর লেখায় নিকৃষ্টতারই পরিচয় দিয়েছেন, আর-একজনের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট আস্থাবান।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

Music At Night, The World of Light, The Cicadas

By Aldous Huxley (Chatto & Windus).

অল্ডুস্ হাক্স্লি সম্বন্ধে যে কথা বহুবার বলা হয়েছে, সে হচ্ছে প্রশংসাঃ—most promising বা ঐ জাতীয় কোনো কথা। কিন্তু বাইশখানি বই প্রকাশ করার পরে প্রমিসিং হওয়া কিছু অসার্থক মনে হয়। পনেরো বছর আগে সবাই আশা করেছিল যে, বাইশ বছরের এই ক্ষমতাশালী বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ লেখক বয়সে প্রথম-শ্রেণীর সাহিত্যিকে পরিণত হবেন। Music At Night, The Cicadas, The World of Light, Brief Candles, Vulgarity in Literature প'ড়েও শুধু সেই সাধু আশাই পোষণ করতে হয়। এরকম রসাল গল্প, এরকম সুখপাঠ্য সুলিখিত প্রবন্ধ, এরকম স্বচ্ছন্দ নাটক, এরকম মিষ্টশ্রব কবিতা খুব কম লোকেই লিখ্তে পারে। এরকম ভাষার উপর দখল, কথার কায়দা, স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা সত্যই দুর্লভ। এরকম বহুমুখী বিদ্যাও কম পাওয়া যায়। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা—চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, আস্বাবপত্র,—বিজ্ঞান, ফরাসী ও ইটালিয়ান্, এবং য়ুরোপের ভদ্রলোকের মেয়েদের সম্বন্ধে এত বিশেষজ্ঞতা সত্যই আশ্চর্য্য। কিন্তু এ সার্কাস্ বেশ লাগলেও ও দেখানো শক্তিসাপেক্ষ হ'লেও হাক্স্লির সম্বন্ধে আমাদের আশা এতে অপূর্ণ।

Music At Night বেরোবে জেনে মনে হয়েছিল Do What You Will-এরই বিকশিত ও পরিণত ফলই বুঝি এতে পাওয়া যাবে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তায় যুদ্ধান্তের শিক্ষিত মানুষের সমস্যায় আজকাল সবাই ভারগ্রস্ত। শ্রদ্ধাহীনতা ও নিরাশ্রয়তা এই নতুন পৃথিবীর ব্যাধি। এই ব্যাধির জ্বালা, বুদ্ধিদীপ্ত ঔদ্ধত্য, প্রীতিকর ব্যঙ্গ হাক্স্লির গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধকে অলঙ্কৃত করেছে। ভাবা গিয়েছিল Do What You Will-এ এই সমস্যা যে রূপ নিয়েছিল, তার সমাধান আসন্ন। টি, এস, এলিয়টের মতো হাক্স্লিও রাত্রির বাহুল্যহীনতায় প্রশ্নের উত্তর সঙ্গীত বুঝি শুনলেন। দেখা গেল, Music At Night হাক্স্লির Do What You Will-এর পরের বই না হ'য়ে On the Margin বা The Jesting Pilate-এর উত্তরাধিকারী। ব্রিলিয়ান্ট্, ক্লেভার। আর যা শোনা গেল, সে What The Thunder Said নয়, সে সমুদ্রতীরে কবিত্বময় সন্ধ্যায় Beethoven-এর রেকর্ড্ বাজানো সঙ্গীত। অবশ্য সে সঙ্গীত 'can tell us with any precision what Beethoven's conception of the blessedness at the heart of things actually was।' দুঃখের বিষয় এ কন্সেপ্শন্ হাক্স্লির কানেই আছে, রচনায় তার অস্তিত্ব নেই।

বইটীতে ছোটবড়ো অনেক প্রবন্ধ আছে। কয়েকটী আছে সাহিত্য-বিষয় নিয়ে। অতি সারবান্ সত্য কথা। পড়লে অনেকেরই জ্ঞানলাভ হবে। ট্রাজেডিতে যে জীবনের আংশিক সত্য থাকে, হোমর্ যে ট্রাজেডিয়ান্ নয়; প্রুস্ত, ফির, কাফ্কা, লরেন্স্ যে জীবনের সমগ্র রূপকে ধর্তে চেয়েছেন, প্রথম প্রবন্ধে হাক্স্লি এ কথা খুব চমৎকার বুঝিয়ে দিয়েছেন। Tragedy and the Whole Truth ছাড়া, The Rest is Silence, Art and the Obvious, Ethics in Andulasia, Obstacle Race, The New Romanticism, and

Wanton Optics Roll the Melting Eye ইত্যাদি প্রবন্ধও সাহিত্য-সম্বন্ধে। শিল্প সম্বন্ধেও হাক্স্লি লিখেছেন। এল্ গ্রেকোর উপর লেখাটী পড়লে সত্যই এ অদ্ভুত অসাধারণ শিল্পী সম্বন্ধে অজ্ঞেরও একটা ধারণা (যদিচ অসম্পূর্ণ ধারণা) হয় এবং হাক্স্লি যাকে ধর্ম্মের বিকার মনে ক'রে নানা জায়গায় নানা ভাবে ঠাট্টা করেছেন, সে সম্বন্ধে হাক্স্লির মত আরেকবার বেশ ভালো ভাবে জানা যায় কিন্তু এল্ গ্রেকো যে ধর্ম্মমোহে অসুস্থ সে কথা বল্লেই কি সব বলা হয়? তা সে যতই সুন্দর ক'রে খাসা ইংরেজিতে বলা হোক্ না। আর খৃষ্টান সাধুদের দুর্ব্বলতা নিয়ে ব্যঙ্গই কি বিংশতাব্দীর মুক্তিমার্গ? আর এল্ গ্রেকোর প্রধান বিশেষত্ব কি শুধুই 'religious experience in its raw physiological state'? হাক্স্লির মতো raw mental state, যাতে কখনো গড্, কখনো আফ্রোডিটি, কখনো ব্যাকাসের উদয় হয় (এ কন্ফেশন্ হাক্স্লিই গম্ভীরভাবে করেছেন) সে অবস্থা কি কাল্পনিক নয়? এবং তাঁর নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা—যে তিনি মুক্তপুরুষ সুতরাং তিনি অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের মতো ইংলণ্ডে ও কিছুকাল ধ'রে দক্ষিণ য়ুরোপে সমুদ্রতীরবর্ত্তী ফ্যাশানেব্ল্ সহরে বাস ক'রে মোটর হাঁকিয়ে বই প'ড়ে ভালো খেয়ে, ধারালো রসালো লেখা লিখে লিখে বিখ্যাত হবেন অথচ ফিলিষ্টাইন্ বল্বেন না (এ সবই হাক্স্লিই জানেন), সে ধারণাই যে ঠিক তা কে বল্বে? On Grace নামক প্রবন্ধে তিনি যে এক জায়গায় বলেছেন 'For normal men and women a consciousness of having behaved in a, humanly speaking, meritorious fashion is, in many cases, a necessary prerequisite to this salvation [অর্থাৎ 'a certain sentiment of personal integrity and fulfilment, a profoundly satisfying consciousness of being 'in order'. *(In sua volontade e nostra pace)'] But by no means in all cases. One can feel fulfilled and in order for no better reason than that the morning happens to be fine' ইত্যাদি এবং 'It is possible for us to be harmonized gratuitously—in orthodox language, to be saved by God's grace।' এবং এই করুণা যে কার উপরে পড়েছে—বুঝ্ছেন ত—বিনয় ব'লে একটা তথাকথিত গুণ। আর যদি তর্ক করেন, সন্দেহই করেন তার জবাবও আছে—'Those, on the contrary, who have talents are given success; but . . . . . they are not given salvation, or given it only grudgingly. It is almost as difficult for the spiritually rich to enter the Kingdom of Heaven as it is for the materially rich।' এ রকম specialist-এর লেখা পড়া সৌভাগ্য নিশ্চয়ই, বিশেষ যখন প্লেটনিস্ম্, খৃষ্ট, সেন্ট্ ফ্রান্সিস্, টেরেসা, এল্ গ্রেকো, দি হিন্ডুস্ প্রভৃতির দুর্ব্বলতা এ ককশ্যর বিশেষজ্ঞের নেই।

কথা উঠ্তে পারে, তাহ'লে অল্ডুস্ হাক্স্লি সাহেবের সযত্নবিস্রস্ত-চুল মাথা নেড়ে এত অতৃপ্তি, এত নিরাশ্রয় চাঞ্চল্য, এত অশান্ত ব্যঙ্গহাস্য কেন? কথা উঠ্তে পারে বটে। কিন্তু এর উত্তর দেবার ধৃষ্টতা কার আছে? হয়ত মুক্তিলাভের পরের লীলা এই। কিম্বা হয়ত যুদ্ধের পরে সৌখীন ভদ্রসমাজের অশান্তি-ফ্যাশনের

* Dante-র Paradiso-র Piccarda-র এ কথা Temple Classics-এ আছে—'la sua volontate e' nostra pace', Eliot-এর Dante-তে আছে 'la sua volontade e' nostra pace,' Arnold-এ আছে In sua volontade e' nostra pace.' অর্থ His will is our peace. ইটালিয়ান-অভিজ্ঞরাই কোন্টা ঠিক জানেন।

খাতিরেই এই স্মার্ট্ দীপ্তি। হয়ত হাক্স্লির পিতামহ টি, এচ, হাক্স্লির ধারাই এই। কিম্বা বোধ হয় তাঁর মাতৃকুলের আত্মীয় পরলোকগত ম্যাথ্যু আর্নল্ডকে চটাবার জন্তই বালকবয়সে এ অভ্যাস পরিশীলিত হয়। কিম্বা আত্মীয়া মিসেস্ হাম্‌ফ্রি ওয়ার্ড্‌কে।

তা সে যাই হোক্, হাক্স্লি লেখেন ভালো। এত ভালো লেখবার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে। পিতামহের মধ্যে যে বুদ্ধির প্রখরতা ও স্পষ্টতা ছিল, সে গুণ হাক্স্লি পেয়েছেন, পান্ নি (পান্ নি কি?) পিতামহের গ্রাম্যতাদোষ—urbanity-র অভাব। যে ব্লুম্স্‌বেরি জগতের বিস্ময়, সেই হিমালয়েও হাক্স্লি একটি উচ্চ চূড়া। আর, সবাইকেই যে টি, এস্, এলিয়ট্, লরেন্স্, রাসেল্ হ'তে হবে তারও কোনো মানে নেই। তদুপরি Music At Night-এ হাক্স্লি—বিখ্যাত বড়োলোক—নিজের কথা মাঝে মাঝে মজার ক'রে বলেছেন। পঁচিশটী সুখপাঠ্য প্রবন্ধের কয়েকটী ভারি হাল্‌কা ও প্রীতিকর। দেশের এই দুর্দ্দিনে আর্থিক অভাবেও The Beauty Industry কেমন চল্‌ছে, মেয়েরা সাজগোজের জন্ত কত পয়সা খরচ ক'রে যাচ্ছেন, সে ভাব্‌লে সত্যই নারী-প্রকৃতির প্রতি স্নেহ বৃদ্ধি পায়। ঐ নামে প্রবন্ধ ছাড়াও আরো হাল্‌কা লেখা বইটীতে আছে। ছোটছেলে, বৃদ্ধ ও মহিলারা ছাড়া আমাদের সবারই হাক্স্লি পড়া উচিত। অন্তত সময়োপযোগী হ'তে। হাক্স্লি নাকি য়ুরোপের ব্যারোমিটর অন্তত স্মার্ট্ মোরোয়া সাহেব ত তাই বলেন।

(২)

নাটকের যা প্রধান গুণ,—স্বচ্ছন্দ গতি, The World of Light-এ সে-গুণ পাওয়া যায়। The World of Light একেবারে স্বেচ্ছায় প'ড়ে ফেলা যায়। এ-গুণের মূল্য বাংলা নাটকের সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায়, স্বচ্ছন্দ গতি ছাড়া নাটকীয় অন্ত সম্পদও হাক্স্লির আছে—দীর্ঘতার মাত্রাজ্ঞান। সরস বাক্যালাপেও তিনটী অঙ্কের পঠনীয়তা বৃদ্ধিই পেয়েছে। গল্পটী হচ্ছে কেম্‌ব্রিজের এক দুর্ব্বলচিত্ত সাধারণ প্লেটো-শিক্ষকের প্রেম। মেয়েটীর সঙ্গে হিউগোর আবাল্য জানা শোনা। মেয়েটী ভালোবাসে, বেশ জোরের সহিত, শিশুকে মা যেমন, অনেকটা তেমনি। ছেলেটী বাসে না, কিন্তু তার মা-সৎমা ও মজার বয়স্ক বাপের মতে তারও ভালোবাসা বা নিদেন বিয়ে করা উচিত। বাগ্‌দান যেই হ'ল, সেই সময়েই হিউগোর বেপরোয়া স্ফূর্ত্তিবাজ অভিজাত বন্ধু (নাটকের একটীমাত্র সহনীয় ও প্রীতিকর মানুষ) হিউগোকে হুইস্কি খাইয়ে সেই দুপুর রাতেই নিরুদ্দেশ যাত্রায় নিয়ে চল্‌ল। এয়ারোপ্লেনে তারা দক্ষিণ আমেরিকায় কোথায় ঘুরতে গিয়ে আর খবর দিলে না। বাড়ীতে স্থির হ'ল, তারা মরেছে—প্রেতবিশ্বাসী হিউগোর পিতা দস্তুরমতো মিডিয়ামের মারফৎ হিউগোর চিঠিপত্র পেতে লাগ্‌লেন। মিডিয়াম ছোকরাও ইনিডের প্রেমে প'ড়ে ঘনঘন খবর আন্‌তে লাগ্‌ল। বইও লেখা হ'য়ে গেল, হিউগোর বাপ কয়েক হাজার পাউণ্ড পেয়ে গেলেন। এ হেন প্রেত-রাজত্বে অকস্মাৎ seance-এর রসভঙ্গ ক'রে দরজা খুলে ঢুক্‌ল হিউগো ও আলো জ্বেলে দিলে। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই হ'ল দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য। তারপরে ভূমিকম্প। এবং সে বিচলনে স্থিতি আন্‌তে, বাগ্‌দত্তা ও প্রিয়ার দুঃখদূরীকরণার্থে হিউগোর পুনর্পলায়ন ও যবনিকা।

যাঁরা বিশ্বাস করেন সাহিত্যের বিচার শুধু লেখার ভালোমন্দে, মতামতে বা বিষয়বস্তুতে নয়, তাঁদের সেকেলে ও-ভুল ধারণা বজায় থাকুক্। কিন্তু এ-নাটক প্রেমের গল্প কি প্রেতের গল্প সে-একটা সমস্যা। বাস্তবিক ত আর ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব, আত্মার মৃত্যুহীনতা হাক্স্লি ঠাট্টা করলেই চুকে যায় না। এ প্রশ্ন অনেকের কাছেই গভীর ও আন্তরিক সমস্যা। এবং হিউগোকে ঠাট্টা করতে গিয়ে সাইকিক্যাল্ রিসার্চ্‌কে ঠাট্টা ক'রে—মানছি, বেশ সরসভাবেই ঠাট্টা ক'রে—অল্‌ডুস্ হাক্স্লি শুধু বাহাদুরীই করলেন। তবে তার জন্ত ত আমরা কোয়ার্টই পড়ি। হাক্স্লির বুদ্ধির খ্যাতি এ-নাটকে বাড়্‌ল না। তাছাড়া: হাক্স্লির সব গল্প উপন্যাসের মতোই এ নাটকের মানুষেরাও কি রকম অসম্পূর্ণ, কি রকম যেন অভিনেতা-ভাবাপন্ন, যেন হাক্স্লির ব্যঙ্গ—মারিওনেটের পুতুলমাত্র। তাদের আলাপ সরস, তাদের ব্যবহার স্বচ্ছন্দ, তারা যে তরুণ কবির কল্পনা নয়, তাও বোঝা যায়। ডিকেন্‌স্ আমি পছন্দ করি নে। কিন্তু এ বিষয়ে ডিকেন্‌স্ হাক্স্লির চেয়ে বহু শ্রেষ্ঠ। কিম্বা আমাদের শরৎবাবু। এই মনুষ্যত্বের অভাবে—নৈতিক নয়, শিল্পগত,—হাক্স্লির আর্ট সর্ব্বদাই দ্বিতীয় শ্রেণীতে আট্‌কে থাকে। আর একটী অভাবও আছে হাক্স্লির—তাঁর বারো বছর আগের কবিতার ভাষায় সে হচ্ছে—

> 'What could he find
> Beyond the dim and stifling now and here
> Beneath the unsettled turmoil of his mind?
> Oh there were nameless depths: he shrank from fear.'

বহুকাল আগে উৎকৃষ্ট সমালোচক হাক্স্লি ষ্ট্রেচির সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'One cannot imagine Mr. Strachey coping with Dostoevsky or with any of the other great explorers of the soul. One cannot imagine him writing a life of Beethoven।' সমালোচক হিসাবে, পাঠক হিসাবে হাক্স্লির সম্বন্ধে এ-কথা তেমন না খাট্‌লেও স্রষ্টা হিসাবে বোধ হয় খাটে। হাক্স্লি পল্লবগ্রাহী, খুব উঁচুদরের সাহিত্যিক, কিন্তু সীমাবদ্ধ।

(৩)

Discontent-এর ফ্যাশন্ হাক্স্লিকে চঞ্চল ও অতৃপ্ত করেছে, কি তিনি সত্যই অন্বেষী বৈরাগী, সে সন্দেহ আমার বরাবর হয়েছে। মনে হয়েছে, হাক্স্লি লেখেন চমৎকার ও তাঁর বই পড়্‌তে ভালো লাগে কিন্তু ভিতরে কি তিনি ঘৃতচিক্কণ পুষ্ট তৃপ্ত মানুষই নন্? এই বিদ্রোহবেশ কি অল্পবয়সে ফ্যাতিলিপ্‌সুরই মানায় না? অথচ এ কথাও সত্য যে, হাক্স্লির মধ্যে সেকালের মরালিষ্টের উল্টানো মূর্ত্তি আছে, সমাজসংস্কারের দিকে তাঁর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক। কিন্তু এও ত স্পষ্ট যে, লরেন্স্, এলিয়েট্, এমন কি মিড্‌ল্‌টন্ মারির অতৃপ্ত অমৃতলিপ্সার কাছে হাক্স্লির ডিস্‌কন্‌টেন্‌ট্ স্থূল ও চেষ্টাকৃত।

সে যাক্, The Cicadas নামক কবিতাপুস্তকে হাক্স্লির বিদ্রোহ কাব্যে ও কবিয়ানায় চাপা পড়েছে। মোটা অথচ মসৃণ কাগজ ব'লেই হোক্, কি ভাষাগত কারণেই হোক্, এ সব কবিতা দ্রুত মনে ঢোকে না, ঢোকে গড়িয়ে গড়িয়ে, বা ঢোকেই না হয়ত। ভাষার উপর এরকম দখল, ছন্দ মিলের নিপুণতা,

কল্পনার মুক্তি, উপমার প্রাচুর্য্য প্রভৃতি বিস্ময়কর। হাক্‌স্‌লির মতো শক্তি খুব কম কবিরই আছে, বাংলাদেশে বিশেষ মধুস্থদন বা সত্যেন্দ্র দত্তের চেয়ে হাক্‌স্‌লি হীন নন। এরকম শ্রুতিসুখকর মসৃণতা কবিতায় আন্‌তে কী শক্তি দরকার সে কবিযশপ্রার্থীরাই জানেন। কিন্তু একথা বলা প্রয়োজন, হাক্‌স্‌লি জন্‌ কীট্‌স্‌ নন, ইয়েট্‌স্‌ও নন। আর শ্রুতিসুখকরতা—তাতেও সুইন্‌বর্ণ্‌ হাক্‌স্‌লির চেয়ে ভালো। কাজেই প্রশ্ন ওঠে, হাক্‌স্‌লির কি বিশেষত্ব যার জন্য আমরা তাঁর কবিতা পড়ব? এখন ত আর হাক্‌স্‌লি নবীন নব্য কবি নেই, এখন তিনি Frascati's রেস্তোর'ার উপরে বা তাঁর পূর্ব্বপুরুষের spermatozoon—তাঁর জন্মকারণ নিয়ে ত আর কবিতা লেখেন না। এখন অলডুস্‌ হাক্‌স্‌লি ইংরেজী কবিতার ধারায় কবি। আর বিশেষত্ব তাঁর আছে, তাঁর ভাব, ভাষা, ছন্দমিলের ব্যবহারে নিজস্বতা আছে, সৌন্দর্য্য আছে। এবং পাঠে তাঁর কবিতা খারাপ লাগে না। অবশ্য তাঁর কবিতা দুবার পড়লেও মনে থাকে না, পিছলে প'ড়ে যায়। সেটা ত্রুটি। তাঁর মুদ্রাদোষও আছে—একটা কথা বারবার ব্যবহার। উদাহরণ দেওয়া গেল, হাক্‌স্‌লির নয়, বাংলার—

> বোলো, বোলো, সেই কথা বোলো তারে বোলো
> কেশগুচ্ছ কানে বোলো তার।

তারপরে, হাক্‌স্‌লির কবিতার বিশেষণ-দৌর্ব্বল্য। চমৎকার ও অজস্র নতুন ভালো বিশেষণ ব্যবহার করা যার তার ক্ষমতা নয়। কিন্তু সম্ভবত আমার অক্ষমতাবশতই (হয়ত অন্য সময়ে আবার The Cicadas খুব ভালো লাগ্‌বে) মনে পড়ল এজ্‌রা পাউন্‌ডের উপদেশ—'Use no superfluous word, no adjective which does not reveal something. Don't use such an expression as 'Dim lands of peace.' It dulls the image. ইত্যাদি।

নিজস্ব প্রোসোডি The Cicadas-এ সব কবিতাতেই হাক্‌স্‌লি রেখেছেন। প্রথম কবিতা এক Theatre of Varieties-এর পদ্যবর্ণনা। কয়েকটী নিপুণ সনেট্‌ও আছে। আনন্দে প'ড়ে যাওয়া যায়, প্রথমে অর্থের কথা মনে ওঠে না। তারপরে দেখা যায় অর্থ স্পষ্ট তবে মসৃণতায় ধরা কঠিন। এ কঠিনতা ব্রাঙ্গিনিডের কঠিনতা বা ডনের কঠিনতা নয়। একটী কবিতা কিন্তু মনে থাকে, উষ্ণ উজ্জ্বল গন্ধে ভারী সে কবিতাটী। দুটী সুন্দরীর অসুস্থ প্রেমের কবিতা এটী—Femmes Damnees, শার্ল্‌ বোদলেয়রের ফরাসী হইতে। ক্রীড়াক্লান্ত এলায়িত হিপোলিটাকে যেখানে ডেল্‌ফিন্‌ সম্বোধন করছে, সেই অংশ একটু উদ্ধৃত ক'রে নিয়মরক্ষা করা যাক্‌—

> 'Calm at her (হিপোলিটার) feet and joyful, Delphine lay.
> And gazed at her with ardent eyes and bright,
> Like some strong beast that, having mauled its prey,
> Draws back to mark the imprint of its bite.
>
> Strong and yet bowed, superbly on her knees,
> She snuffed her triumph, on that frailer grace
> Poring voluptuously, as though to seize
> The signs of thanks upon the other's face.

> Gazing, she sought in her pale victim's eye
> The speechless canticle that pleasure sings,
> The infinite gratitude that, like a sigh,
> Mounts slowly from the spirit's deepest springs.
>
> 'Now, now you understand (for love like ours
> Is proof enough) that 'twere a sin to throw
> The sacred holocaust of your first flowers
> To those whose breath might parch them as they blow.
>
> 'Light falls my kiss, as the ephemeral wing
> That scarcely stirs the shining of a lake.
> What ruinous pain your lover's kiss would bring!
> A plough that leaves a furrow in its wake.
>
> 'Over you, like a herd of ponderous kine,
> Man's love will pass and his carresses fall
> Like trampling hooves. Then turn your face to mine;
> Turn, oh my heart, my half of me, my all!
>
> 'Turn, turn, that I may see their starry lights,
> Your eyes of azure, turn. For one dear glance
> I will reveal love's most obscure delights,
> And you shall drowse in pleasure's endless trance'.

শেষ কথা। আজকালের লেখকদের মধ্যে হাক্‌স্‌লির মতো প্রতিভা, সর্ব্বগামী বুদ্ধি, লিপিদক্ষতা, বহুমুখিত্ব ও বিদ্যা আর কারো নেই। তাঁর সব বই-ই পঠনীয় ও পাঠ্য। বিশেষ ক'রে আমাদের। কারণ হাক্‌স্‌লির কমন্‌সেন্‌স্‌ ও তাঁর গদ্যের বৈদর্ভী রীতির উৎকর্ষ আমাদের মধ্যে দুর্ল্লভ। সামান্য নন্‌ বলেই হাক্‌স্‌লির সম্বন্ধে অনুযোগ ওঠে।

শ্রীবিষ্ণু দে

Portraits in Miniature—LYTTON STRACHEY,
(Chatto and Windus).

প্রথম যেদিন লিটন্‌ ষ্ট্রেচির "বুক্‌স্‌ এণ্ড্‌ ক্যারেক্‌টর্‌স্‌" পড়ি, সেদিন আমার মনোভাব কীট্‌স্‌-বর্ণিত কর্টেজের অনুকরণ করেছিলো। মনে হয়েছিলো মানুষ ও সাহিত্য-সম্বন্ধে এই অন্তর্দৃষ্টির জন্যেই আমাদের যুগ নির্নিমেষ প্রতীক্ষা করছিলো। উল্লসিত কল্পনাকে ভবিষ্যতের পানে ছুটিয়ে দিয়ে ভেবেছিলুম, ভাবীকাল যখন বিংশ-শতাব্দীর কাছে তার বৈনাশিকতার জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করবে, তখন কেবল এই লোকটিকে আমাদের প্রতিনিধি ক'রে, আমরা বল্‌তে পারবো যে, সৃষ্টির চেয়ে প্রলয়েই আমরা দক্ষতা দেখিয়েছি, এ-কথা মিথ্যা; জীবচ্ছেদে আমাদের প্রসিদ্ধি হয়তো অন্য যুগের ঈর্ষার কারণ না-হ'তে পারে, কিন্তু আমাদের শবচ্ছেদের প্রবৃত্তিই যে জীবন-

সম্বন্ধে অভিনব অভিজ্ঞতার সন্ধান এনেছে, তাও অতিশয় নিঃসন্দেহ। আর শুধু তাই নয়, আমাদের মধ্যে অন্তত এমন একজন আছেন, যিনি কেবল মড়ার উপরে খাঁড়া চালিয়েই ক্ষান্ত হননি, মর্ম্মন্বেষী অস্ত্রের কৌশলে অনায়াসেই দেখিয়ে দিয়েছেন যে, খুঁজ্‌তে জানলে যাদুঘরের মামির মধ্যেও প্রাণের অমর আকৃতি আবিষ্কার করা সম্ভব।

সেই সোৎসাহ ভক্তি হয়তো আর কারুর সম্বন্ধে কখনো অনুভব করবো না; কিন্তু সেদিনের পুলকিত বিস্ময়ের সমস্ত দায়িত্ব শুধু তারুণ্যের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াও দুঃসাধ্য। শেক্‌স্‌পীয়রের বিষয়ে অনেক মতামতই আজীবন প'ড়ে এবং শুনে আস্‌ছি, কিন্তু তাঁর শেষ পর্য্যায়ের নাটকসংক্রান্ত ষ্ট্রেচির প্রবন্ধটি আজও আমার কাছে অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত। সম্প্রতি বেডোস্‌-সম্বন্ধে বেশ একটু কানাকানি চলেছে; কিন্তু আমি এখনো বিশ্বাস করি যে, তার বিষয়ে তিনি শুধু নতুন কথা বলেননি, ওই অপরিচিত মহাকবির প্রসঙ্গে ষ্ট্রেচির অনুমান অপূর্ব্ব, শাশ্বত এবং সত্য। "বুক্‌স্‌ এণ্ড্‌ ক্যারেক্‌টর্‌সে"র ব্যাপক উৎকর্ষে এ-দুটি উদাহরণের কোনো বিশেষ পদবী নেই।

তার পরে "কুইন্‌ ভিক্‌টোরিয়া", "এমিনেণ্ট্‌ ভিক্‌টোরিয়ন্‌স্‌", "পোপ্‌" ইত্যাদি পুস্তক ও প্রবন্ধের প্রবর্ত্তনে আমার শ্রদ্ধা যখন প্রায় অসীমের উপকূলে এসে পৌছেছে, তখন হঠাৎ "এলিসাবেথ্‌ এণ্ড্‌ এসেক্‌স্‌" নামক বইখানির আবির্ভাব হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার উল্লাসের উচ্ছৃঙ্খলতায় কে যেন এক অলক্ষ্য গণ্ডি টেনে দিলে; বইখানার বিরুদ্ধে কোনো বাঙ্ময় অভিযোগ খুঁজে পেলুম না বটে, কিন্তু একটা অহৈতুক অস্বস্তিতে মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; সন্দেহ হলো, যে-অনুকম্পার প্রসার বিশ্বব্যাপী ব'লে ভেবেছিলুম, বস্তুত তা হয়তো প্রাদেশিক। ষ্ট্রেচির নির্দ্দেশে বাগ্‌জীবন গ্লাড্‌ষ্টনের প্রহেলিকার তলে তলে নিঃস্বত্ব শূন্যের দিগন্তবিস্তার দেখা আমার পক্ষে শক্ত হয়নি; কিন্তু এলিসাবেথ্‌, এসেক্‌স্‌, বেকন্‌, রলে, সকল চরিত্রই যে এই সীমাশূন্য শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত এতদূর স্বীকার করা আমার মতো শূন্যবাদীর ক্ষেত্রেও সহজ হলো না। তবু আমার আপত্তিকে বাণী দিতে সাহসে কুলায়নি; তখনো পর্য্যন্ত ষ্ট্রেচি-প্রশস্তিই ছিলো বৈদগ্ধ্যের শ্রেষ্ঠ পরোয়ানা।

সম্প্রতি ওই শৃগালী ঐক্যতানে একটা স্বরবৈচিত্র্য লক্ষ্য করছি। আজকালকার বুদ্ধিঝলমল অতি-আধুনিকের দল বল্‌তে সুরু করেছেন যে, সাহিত্যসৃষ্টিতে লিটন্‌ ষ্ট্রেচি নগণ্য তো বটেই, এমন কি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ বাঁচিয়ে দু ছত্র লিখ্‌তেও তিনি অপারগ। বিদেশী ভাষার ব্যাকরণশুদ্ধি-সম্বন্ধে আমার মুখ স্বভাবতই বন্ধ, কাজেই এ-ক্ষেত্রে অযৌক্তিক উপজ্ঞার আশ্রয় নিয়ে এই ক্ষণজন্মা মহারসিকদের উদ্দেশে আমি মাত্র এইটুকু বল্‌তে অধিকারী যে, এতাদৃশ ব্যাকরণদুষ্ট উপাদানে তাঁরা যতদিন পর্য্যন্ত "কুইন্‌ ভিক্‌টোরিয়া"র মতো একখানা দ্বিতীয় পুস্তক সৃষ্টি না-করছেন, ততদিন তাঁদের গুরুনিপাতনী বিদ্যা শুধু অশোভন নয়, উপহাস্য।

কিন্তু এটা গেলো পক্ষপাতের কথা। ষ্ট্রেচি-সম্বন্ধে অতি-আধুনিক সমালোচনা অতিকথনে ভরা হ'লেও, তাঁর শেষ বই "পোর্টরেট্‌স্‌ ইন্‌ মিনিয়েচর্‌" পড়ার পরে, তরুণদের তরফে কোনো বক্তব্যই নেই, এমন সিদ্ধান্ত অমূলক হবে। আসলে যেটা ষ্ট্রেচির প্রধান গুণ, সেটাই কালেভদ্রে দোষ হ'য়ে দাঁড়ায়। তাঁর সিদ্ধি, এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ফলতা, এ-দুয়ের মূলেই আছে তাঁর অত্যুগ্র মাত্রাজ্ঞান। আমার অনেক

সাহিত্য-বিলাসী বন্ধু, যাঁর রুচি ও স্বকীয়তা নিয়তই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তিনি "এলিসাবেথ্‌ এণ্ড্‌ এসেক্‌স্‌"-সম্বন্ধে আমার অভিযোগ শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে বলেছিলেন যে, বিশেষ ক'রে ওই বইখানিই তাঁকে গ্রীক্‌ নাটকের মতো মুগ্ধ করেছে। কথাগুলো গোড়ায় বেশ একটু আষাঢ়ে ঠেক্‌লেও, যতই ভাব্‌ছি ততই এ-মন্তব্যের অন্তর্নিহিত সত্যটুকু প্রতিভাত হ'য়ে উঠ্‌ছে। গ্রীক্‌ মনীষার সামঞ্জস্যই যদি ওই জাতির অদ্বিতীয় মহত্ত্বের পাদপীঠ হয়, তবে লিটন্‌ ষ্ট্রেচি নিশ্চয়ই সেই অতুলনীয় মহত্ত্বের উত্তরাধিকারী। গ্রীক্‌ ভাবুকদের মতো লিটন্‌ ষ্ট্রেচিও জানেন যে, মর্ত্ত্যসীমা বিস্মৃত হ'লে মহামানবেরও পতন অনিবার্য্য। গ্রীক্‌ নাট্যকারের সঙ্গে লিটন্‌ ষ্ট্রেচিও ঘোষণা করেন যে, মৃত্যুর নিৰ্ব্বিঘ্ন অঙ্কে নিরাপদে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের সুখের গর্ব্ব, সৌভাগ্যের আত্মপ্রসাদ, সাফল্যের অহমিকা, সে-সমস্তই নিঃসার, সে সমস্তই অলীক। কিন্তু মনুষ্যত্বের সীমাবধারণের সঙ্গে সঙ্গে যে-দুর্লভ দিব্যদৃষ্টির আশীর্ব্বাদে গ্রীক্‌ কবি ঈডিপাসের নিষ্ঠুরতম নিষ্ফলতার মুহূর্ত্তেও তার অন্তস্থ দৈবত্বটুকু মর্ম্মে মর্ম্মে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই মরমী সিদ্ধি ষ্ট্রেচির আয়ত্তাতীত। সেই জন্যেই ইংরেজী ইতিহাসের একমাত্র নাটকীয় পটভূমিকায় প্রযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এলিসাবেথ্‌, এসেক্‌স্‌ ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গগুলি যন্ত্রচালিত পাত্রপাত্রী হ'য়েই র'য়ে গেছেন, জীবন্ত নরনারী হ'তে পারেননি, অভিনয় শীর্ষবিন্দুতে গিয়ে ঠেকেছে, কিন্তু ট্রাজিডির মৌল সত্তা থেকে গেছে অন্তর্ভৌম।

কিন্তু এই সুমিতি এলিসাবেথের উন্মাত্র যুগে সর্ব্বতোভাবে সার্থক না-হলেও, ভিক্‌টোরীয় শতকের উপদেবতাদের সম্বন্ধে তার অমোঘ উপযোগিতা সর্ব্ববাদীসম্মত। উপরন্তু এই সজাগ মাত্রাজ্ঞানের কল্যাণেই ষ্ট্রেচির ভাষা অনুপম। এ-ভাষার অনন্যসাধারণ ওজঃ, অপরিমিত ঐশ্বর্য্য, অপরূপ বর্ণবৈচিত্র্য, সে-সমস্ত গুণই শুধু সংযত সুবিন্যাস আর আয়াসসিদ্ধ তুলাসাম্যের ফল। ষ্ট্রেচি জানেন যে, ভাষা যখন মহান উপাধির দাবি করে, তখন তার মধ্যে আর অতিমার্জ্জিত ঔজ্জ্বল্যের চিহ্ন থাকে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী কবিদের দৃষ্টান্ত থেকে তিনি শিখেছেন যে, প্রাণবন্ত ভাষায় উদ্ভটতার স্থান নেই। ষ্ট্রেচি দেখেছেন যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভাষাকে স্ফীত ক'রেই নিঃশেষিত হয়, কিন্তু তাকে পরিপুষ্ট করে ব্যক্তিস্বরূপ। তাই ষ্ট্রেচির শ্রেষ্ঠতম রচনাকেও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তার প্রত্যেক ভগ্নাংশই বৈশিষ্ট্যহীন, শব্দগুলি এতই অভিমানবর্জ্জিত যে, নিকৃষ্টতম সংবাদপত্রের নিরুদ্দেশেও তারা অক্লেশে আত্মগোপন ক'রে থাক্‌তে পারে। সামঞ্জস্য ও সঙ্গতির সংস্পর্শেই এই অসার ধ্বনিপিণ্ড সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দ্যোতনাব্যঞ্জনার বিশ্বস্ত বাহনরূপে দেখা দেয়।

আজকের স্বার্থঘন ব্যক্তিবাদের দিনে ষ্ট্রেচির এই ধ্রুপদী আদর্শ উপেক্ষিত হ'তে বাধ্য। যে-বিশুদ্ধতার চালনায় তরুণেরা তাঁর ভাষাকে ব্যাকরণদুষ্ট মনে ক'রে থাকেন, তারি প্ররোচনায় তাঁরা বল্‌তে সুরু করেছেন যে, আসল মহত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করার মতো উদারতা ষ্ট্রেচির নেই। শুধু পুরানো পুস্তকগুলো নয়, সদ্যতন "পোর্টরেট্‌স্‌ ইন্‌ মিনিয়েচার"-ও এই অদ্ভুত মতবাদের বিরুদ্ধে সাক্ষি দেবে। তবে এটা হয়তো সত্য যে, মহত্ত্বের সকল অভিব্যক্তি তাঁর কাছে সমান আদর পায় না। ষ্ট্রেচি বিশ্বাস করেন যে, সুবুদ্ধি, সুরুচি, সহনশীলতা ও একাগ্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, এই কটি সম্ভ্রান্ত লক্ষণই মানুষকে সভ্য ও সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছিলো। সেইজন্যে যে-যুগ বা ব্যক্তি এই গুণাবলীকে একান্ত আপন ক'রে নিয়েছিলো, ষ্ট্রেচির শ্রদ্ধাসমবেদনায় তারাই সর্ব্বপ্রথমে অধিকারী।

কিন্তু ভল্টেয়র্ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দী ষ্ট্রেচিকে বিস্ময়মুখর ক'রে তুল্লেও, তাঁর মাত্রাজ্ঞানে হস্তক্ষেপ করতে অক্ষম। হোমারের নির্দ্দেশে ষ্ট্রেচি দেখেছেন যে, স্বয়ং আকিলিস্ও একেবারে অভেদ্য ছিলেন না। এর পরে ক্ষেত্রবিশেষে ভল্টেয়রের অক্ষমতা, অপূর্ণতা স্বীকার করা তাঁর পক্ষে আর শক্ত হয় না। একে ছিদ্রান্বেষণ বল্লে অভিধানের অবমাননা করা হবে। চাঁদের কলঙ্ক মেনে নেওয়া এবং চন্দ্রকে দেখে কুকুরের মতো তারস্বরে চিৎকার করা যেমন এক নয়, মানুষকে সান্ত ভাবা এবং মহত্ত্বকে খর্ব্ব করাও তেমনি বিভিন্ন। অনেকের বিবেচনায় সম্পূর্ণতা মৃত্যুর নামান্তর। লিট্‌ন ষ্টেচিও সম্ভবত এই মতে আস্থাবান। রোঁদার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ষ্ট্রেচি মনে করেন যে, ঐতিহাসিক প্রস্তরমূর্ত্তিগুলোকে জীবন্ত ক'রে তুলতে হ'লে ভাস্কর্য্য থেকে কর্কশতা ছেঁটে ফেলা শুধু দুষ্কর নয়, একেবারেই অসাধ্য। চার্ব্বাক যৌনবোধকে জীবনের একমাত্র সত্য ব'লে নির্ণয় করেছিলেন। অতটা বাড়াবাড়ির পক্ষপাতী না-হ'য়েও ষ্ট্রেচি বিশ্বাস করেন যে, ওই প্রবৃত্তিটির মতো আরো কতিপয় তথাকথিত পাশবিকতার স্মৃতি চিত্তপট থেকে মুছে ফেল্লে, খেলাঘরের পুতুল অনায়াসেই গড়া যায়, কিন্তু মাইকেল এঞ্জেলোর প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হয় না।

কিন্তু ষ্ট্রেচির সম্বন্ধে হাল আমলের মুখ্য অনুযোগটা অসঙ্গত ব'লে সেই অনুযোগের কতকগুলো শাখাপ্রশাখার ঔচিত্য অস্বীকার করা বৃথা। এক "বুক্স এণ্ড্ ক্যারেক্‌টর্‌স্" ও "এলিসাবেথ্ এণ্ড্ এসেক্‌স্" ছাড়া ষ্ট্রেচির আদানপ্রদান বিরাট্‌কে নিয়ে নয়, তাঁর ব্যবসা ক্ষুদ্রের আণবিক মহত্ত্বের পক্ষে ওকালতি করা। ষ্ট্রেচি একটি প্রবন্ধে কাব্যবিবেচকের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেছেন। তার থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর মতে মহত্ত্ববিচার সমালোচনার কার্য্য নয়, সমালোচকের ব্রত হচ্ছে মহত্ত্ব আবিষ্কার। আমার বুদ্ধিতে এই অভিমতটি ভয়াবহ ব'লে ঠেকে। ক্ষুদ্রের মধ্যেও মহত্ত্বের বিদ্যুৎবিলাস মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু তাই ব'লে ক্ষুদ্রকে নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো বিপুল অবকাশ জগতের অধীনে নেই। ষ্ট্রেচির মতো ধীমান যে এই সাধারণ সত্যটাকে ধরতে পারেননি, তা বিশ্বাস করা শক্ত। তাই আমার মনে হয়, এই প্রচ্ছন্ন মহত্ত্বের অবগুণ্ঠন মোচন, সে একটা উপলক্ষ্য মাত্র; ষ্ট্রেচির আসল অভিপ্রায় হচ্ছে শিখণ্ডীর আড়ালে থেকে ভীষ্মকে নিপাত করা। অবশ্য সে-রীতি যদি ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক হয়, তবে পদ্ধতিটা নিশ্চয়ই প্রশস্ত; শঠের সম্বন্ধে শাঠ্য স্মার্ত্তপণ্ডিতদের বিধানেও বাধে না। এই দিক থেকে দেখ্‌লে মেরি বেরির মারফতে হরাস্ ওয়াল্‌পোলের দর্পচূর্ণ করা শুধু শোভন নয়, সার্থক। কিন্তু যখন প্রেসিডেন্ট ব্রোসেস্ স্বয়ং ভল্টেয়ারের উপরে টেক্কা দেওয়ার পুরস্কারস্বরূপ তাঁর আজন্ম বাঞ্ছিত পরিষদ অমরায় বঞ্চিত হয়েও, ষ্ট্রেচির মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার জোরে নিত্যের আসনে উঠে বসেন, তখন ভয় হয় বাস্‌কুটের মোহ বুঝি ষ্ট্রেচিকেও উন্মার্গিক ক'রে তুল্‌লে।

এর জবাবে ষ্ট্রেচি অবশ্য বল্‌তে পারেন যে, ও-ধরণের লেখায় পারাডক্স-প্রীতির নামগন্ধও নেই, আছে কেবল সত্যনিষ্ঠা। সত্যের স্বরূপ যে অনেক সময়েই স্ববিরোধী, তা আমরা জানি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমাদের অজানা নেই যে, রবিবাসরিক পাঠশালা পরিচালনের ভার ষ্ট্রেচির উপরে না পড়াই ভালো। ষ্ট্রেচি ঐতিহাসিক ব'লে খ্যাতি অর্জ্জন করেননি, তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন রূপকার হিসেবে। এবং এইখানেই তিনি অনুকরণীয়, এই জন্যেই তিনি ঈর্ষাভাজন। ইতিহাস

লেখা কঠিন হ'লেও তার জন্যে বোধ হয় কোনো জন্মগত প্রতিভার আবশ্যক করে না। ফ্রুড্, ক্রাইটন্, গিজো,—যাঁদের স্থাণু মাধ্যমিকতার প্রতি অভিজাত ষ্ট্রেচির অবজ্ঞা ও আক্রোশের অন্ত নেই, এমন কি তাঁরাও সত্যানুরাগে ষ্ট্রেচিকে বহু পশ্চাতে ছেড়ে গেছেন। ষ্ট্রেচি মিথ্যাবাদী এমন কথা ঘুণাক্ষরেও বল্‌তে চাইনা। কিন্তু যে জন্যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও নমস্য, সে হচ্ছে তাঁর সত্যকে, অন্তত ঐতিহাসিক সত্যকে, অতিক্রম করার ক্ষমতা। এই উপায়েই তিনি জীবনচরিতকে নীরস ঘটনা-তালিকার মরুভূমি থেকে উদ্ধার ক'রে অনির্ব্বচনীয় শিল্পলোকে অধিষ্ঠিত করেছেন। মানুষ নিয়ে যাদের কারবার তাদের মধ্যে লিটন্ ষ্ট্রেচিই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন যে, চরিত্রচিত্রণে সত্যকে এড়িয়ে গেলেও হয়তো চলে কিন্তু সত্তাকে বাদ দিলেই মৃত্যু। ফলে যেখানে কোনো সামান্য সত্য একটা বিশাল সত্তার পূর্ণপ্রকাশের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়, সেখানে তিনি সমগ্রতার খাতিরে ওই তুচ্ছ সত্যকে নির্ব্বাসনে পাঠাতে দ্বিধা করেন না। সত্যকে প্রয়োজন মতো গ্রহণ প্রত্যাখ্যানের অধিকার আর্টিষ্টমাত্রেরই আছে; এবং ষ্ট্রেচি যতক্ষণ মনুষ্যজীবনকে ঐতিহাসিকের সমীপদর্শী চক্ষে না-দেখে রূপদক্ষের অবিকল দৃষ্টিতে দেখ্‌তে থাকবেন, ততক্ষণ সকল রসিকই তাঁর সত্যবিসর্জ্জনের সমর্থন করবে।

কিন্তু মর্য্যাদায় কেবল অখণ্ডতাই সত্যের অগ্রগণ্য। তাই যখন দেখি সত্যেরও মানরক্ষা হলোনা, অথচ অখণ্ডতাও অগোচরে র'য়ে গেলো, তখন তরুণদের দুরুক্তি-গুলোকে যথেষ্ট পরিমাণে অবজ্ঞা করতে অক্ষম হই। 'এমিনেণ্ট্ ভিক্টোরিয়ান্‌সে' নিউম্যানের অশ্রুমোচন ক্ষমা করা কঠিন নয়। সেখানে ঘটনাটার পরিণতি সুস্পষ্ট, আমাদের দরদও নিউম্যানেরই প্রাপ্য। কাজেই প্রকাশ্যে হাসবার চেষ্টা করলেও, অন্তরে আমরা নিউম্যানের কান্নাতে যোগ দিই। কিন্তু রেলওয়ে ষ্টেসনে লুপ্ত ব্যাগের শোকে ক্রাইটনের চাঞ্চল্য? সত্য কিংবা সমগ্রতা, কোনো দিক্ থেকেই এ ব্যাপারটার মূল্য অদ্যাবধি ধার্য্য করতে পারিনি। কারলাইলের প্রসঙ্গে ষ্ট্রেচি বলেছেন যে, ভিক্টোরীয় যুগের বস্তুমাত্রা সমুদায় কিন্তু তার পরতে পরতে ছিলো কুশ্রীতা ও মালিন্য। এতাদৃশ বস্তুর ছবি আঁকা নিশ্চয়ই সহজ নয়। উপরন্তু এই ধরণের বৈকল্পিক স্বর্গনরকের মূর্ত্তি গড়তে গেলেই ডষ্টয়েভ্‌স্কির পদাঙ্কে চল্‌তে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ষ্ট্রেচির অবশ্যই নেই। তবু এই সাধনায় "পোর্ট্রেট্‌স্ ইন্ মিনিয়েচারে"র বৈহাসিকতাই অনন্য পন্থা এমন সিদ্ধান্তও অসম্ভব। লিটন্ ষ্ট্রেচির প্রতিভা অলোকসামান্য, তাঁর অতীত অবদানও অনবতুল। সেইজন্যই "পোর্ট্রেট্‌স্ ইন্ মিনিয়েচারে"র পাতা উল্‌টোতে উল্‌টোতে পাঠকের স্মৃতিবিহ্বল দৃষ্টি সাহিত্যের অক্ষয় স্বর্গে এমিনেণ্ট্ ভিক্টোরিয়ানদের অভিসারে নিয়তই ছুটে চলে।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আমরা ও তাঁহারা—শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্।

দুই বিরোধী দলের আলাপের আকারে লেখা ছ'টি প্রবন্ধের সমষ্টি এই বই। 'আমরা' হচ্ছেন আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত (এবং শিক্ষাভিমানী), আত্ম-সচেতন, ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল সম্প্রদায়—যাঁরা অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা করেন, যাঁরা জন-আলোড়নের

উন্মাদনার বহির্ভূত, শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার যাঁরা অনুরক্ত—এক কথায়, বর্ত্তমান সমাজের যাঁরা কুলীন। আর, 'তাঁহারা' হচ্ছেন সংস্কৃত অর্থে 'ইতর' ব্যক্তি, যাঁরা নিতান্তই সাধারণ, অথচ নির্ব্বোধ নন্; 'পাব্লিক' বল্‌তে যাঁদেরকে বোঝায়; আধুনিকতার ঘাত-প্রতিঘাতে যাঁদের রক্ষণশীলতায় চিড় ধরেছে—অথচ সংস্কারের নিশ্চিন্ত অন্তঃপুর থেকে ঠিক বেরিয়ে আস্‌বার সাহসও যাঁদের নেই। এঁরা ধ্রুপদ-খেয়ালের চাইতে কীর্ত্তন পছন্দ করেন, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্‌বার আশায় জেল খাটেন, নিজেদের ব্যক্তিগত বিকাশের চাইতে সমষ্টির কল্যাণের জন্যই বেশি ভাবেন—এঁরা দলে ভারি। দেশের নানা বর্ত্তমান সমস্যা নিয়ে এই দুই দল ১৪২ পৃষ্ঠা ভ'রে তর্ক করছেন। ধূর্জ্জটিবাবু 'আমরা'র প্রতিনিধি হিসেবে নিজকে স্থাপিত করেছেন; এবং সে-প্রতিনিধিত্বের কাজ তিনি খুবই যোগ্যরূপে সম্পাদন করেছেন। ঠিক এই সময়ে বাঙ্‌লাদেশের নব-অভিজাতদের সঙ্গে জন-সাধারণের বিরোধ ক্রমশই প্রখর হ'য়ে উঠ্‌ছে ব'লে মনে হয়; কার্য্যস্থলে 'আমরা'র দল প্রায়ই বাধ্য হন্ হার মান্‌তে—ভেতরে-ভেতরে গুমোট জ'মে ওঠে। সেই গুমোটকে ধূর্জ্জটিবাবুর প্রকাশ্য ও অকপট আলোচনা তীব্র নাড়া দিয়েছে; 'আমরা'র দলের সমস্ত অভিযোগের (এবং অভিমানের) কারণ বেরিয়ে এসেছে স্পষ্ট হ'য়ে; অনেক কথা—যা আমরা অনেকেই অনেকবার মনে-মনে ভেবেছি—ধূর্জ্জটিবাবু সে-গুলোকে সাহস ক'রে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন। আমার মনে হয়, যাঁরা এ-বই পড়্‌বেন, তাঁরা বেশির ভাগই 'আমরা'র দলের; ধূর্জ্জটিবাবুর নির্ভীক অকপটতায় তাঁরা মুগ্ধ হ'বেন।

এ-কথা বল্‌লে বোধ হয় ভুল হয় না যে, ধূর্জ্জটিবাবু এ-বইয়ে আগাগোড়া ব্যক্তিত্ব-বাদ প্রচার করেছেন। এবং, আজকালকার দিনে আমাদের দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রচারিত হওয়া দরকার—খুবই দরকার। অতিরিক্ত যান্ত্রিকতায় ইউরোপের আত্মা আজ পীড়িত; ডেমক্রেসির বৈশ্যবৃত্তি সেখানে ধর্ম্মের স্থান নিতে বসেছে:—এবং এই নতুন ম্যামন-পূজার পুরোহিত হচ্ছে আমেরিকা, যেখানে Success হচ্ছে প্রত্যেক লোকের জপমন্ত্র—একজন আমেরিকানেরই ভাষায়, 'That bitch-goddess, success'। সমস্ত মানুষের জীবন এক ছাঁচে ঢালাই হ'য়ে যাচ্ছে; অধ্যয়ন মানে খবরের কাগজ, আমোদ মানে টকি কি রেডিয়ো, অবসর মানে অটোমোবিল-ট্রিপ্, দীর্ঘ অবকাশ মানে কোনো-একটা জাহাজ-কোম্পানির পরিচালিত কোনো ক্রুজ্। সবি Standardized। মানুষকে নিজের মাথা খেলিয়ে কিছু করতে দে'য়া হ'বে না—কাজ তো নয়ই, নিজের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও নয়। প্রত্যেক মানুষের যে বিভিন্ন এবং অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব—তা'র বিকাশকে কিছুমাত্র সাহায্য করা দূরে থাক্, বরং আপ্রাণ বাধা দে'য়া হয়—সবাই একভাবে না চল্‌লে, বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস না করলে খবরের কাগজ না চল্‌লে ব্যবসা ফেঁপে ওঠে না, কোটি ছেড়ে লক্ষকোটিপতি হওয়া যায় না। ফোর্ডের কারখানায় তাই দুঃসময়ের প্রতিকার-হিসেবে প্রত্যেক বিবাহিত কর্ম্মচারীকে বাড়ির আঙিনায় সাধ্য-মত তরকারী উৎপন্ন করতে হ'বে—হ'বেই। কেউ যদি আর্থিক অভাব গ্রাহ্য না করে, কেউ যদি বিশ্রাম ভালোবাসে, কেউ যদি ফুলের চাষ করতে চায়, তাহ'লে তা'দের চল্‌তে পারে, কিন্তু ফোর্ড-সাহেবের চলে না। মানুষের যা শ্রেষ্ঠ অংশ—তা'র মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ইচ্ছা, সেটাকে দমন না করলে যান্ত্রিকতা টিঁক্‌তে পারে না। গড়পড়্‌তা সব মানুষ এক হওয়া দরকার। জীবনের

এই Standardization-এর বিরুদ্ধে ইউরোপ থেকে আজ তীব্র প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে; এ-ভাবে যে জীবন বাঁচে না, মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণরূপে 'আমি' হওয়াই যে সব চেয়ে বড় সাধনা, ইউরোপের কেউ-কেউ অন্তত এ-কথা উপলব্ধি করেছেন।

আমাদের দেশেও এ-বিপদ এসেছে—তবে অন্য দিক্ থেকে। যান্ত্রিকতা আমাদের দেশে এখনো তেমন প্রসারলাভ করে নি; অর্থাতিশয্যেও আমরা কিছু মারা পড়্‌ছি না; কিন্তু তবু ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য জন-মনোভাবের অন্ধকারে মিশে যাবার আশঙ্কা দিন-দিনই বাড়্‌ছে। এর কারণ আর-কিছুই নয়, পলিটিক্স্। পলিটিক্স্-এর কুয়াশায় সমস্ত দেশ আজ আচ্ছন্ন, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনকে এমন-ভাবে জুড়ে বসেছে যে, আমরা সমস্ত বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছি; সমস্ত জিনিষ একই মানে মাপ্‌ছি; অথচ, ঠিক কী উপায় অবলম্বন করলে দেশের স্বাধীনতা আস্‌তে পারে, সে-বিষয়ে অনেকের মনেই স্পষ্ট ধারণা নেই। দেশ জুড়ে চলেছে হুজুগ, যে-জিনিষটা নিতান্তই নিম্নস্তরের। ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে নিন্দা করতে-করতে আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে যে, কারো মাথায় অকালে টাক পড়্‌লেও সে-দোষ আমরা গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপাতে চাই। আমরা নিশ্চেষ্ট হ'য়ে অশিক্ষায়, কুশিক্ষায়, কুসংস্কারের মধ্যে ব'সে থাক্‌বো; পরে যখন বহু সন্তান হ'বার ফলে দারিদ্র্য আস্‌বে, অর্থাভাবে একটা ছেলেও যখন মানুষ হ'বে না—অথচ দারিদ্র্যেরই অনিবার্য্য ফল হিসেবে সন্তানের সংখ্যা বাড়্‌তেই থাক্‌বে, তখন মন খুলে গালি-গালাজ করবো গভর্ণমেণ্টকে। আমাদের মনে এই রকম একটা ধারণা হয়েছে যে, কোনো রকমে একবার ইংরেজকে তাড়াতে পারলেই আমরা হাতে স্বর্গ পেয়ে যাবো। এবং সে-জন্য করা দরকার পিকেটিং; মদ-সিগ্রেট, সমস্ত বিলাসিতা বর্জ্জন; দরকার চরকায় (বা তক্‌লিতে) প্রত্যহ স্তো-কাটা, সব খেজুর-গাছ কেটে ফেলা। গান্ধীর এই বৈশ্যমনোভাব-প্রসূত বৈরাগ্যধর্ম্ম কার্য্যত না হোক্, বচনত দেশের বেশির ভাগ লোক গ্রহণ করেছে; এবং সবাইকে এর ভেতর টেনে আন্‌বার দারুণ চেষ্টা চল্‌ছে। এর সঙ্গে মিশেছে ইউরোপীয় সোশ্যালিজ্‌ম্-এর এক সস্তা অনুকৃতি—যা'র উগ্র স্পর্দ্ধা মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ অস্বীকার করতে উদ্যত। দেশে আর মানুষ থাক্‌বার দরকার নেই; বিশাল সাধারণের সমষ্টি নিয়ে প্রকাণ্ড এক জাতি থাক্‌লেই হ'ল। গান্ধীর আদর্শও এক ধরণের Standardization—দেশের সব সমস্যা তিনি এক কথায় মীমাংসা ক'রে দেন্—চরকা। চরকা কাটো—স্তো বেচে যা হবে, তা'তেই তোমার দিন চল্‌বে। দিন না হয় চল্‌লো—কিন্তু বাকি সময় নিয়ে কী করবো? এখানে তিনি নিরুত্তর। সাউথ্ আমেরিকাও স্বাধীন, অস্ট্রেলিয়াও স্বাধীন। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া কী আছে তা'দের?

অবিশ্যি এ-কথা ঠিক যে, আমাদের জীবনের অনেক দৈন্যের কারণই খোঁজ করতে গেলে রাষ্ট্রীয় অধীনতাতে আস্‌তে হয়। কিন্তু ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সব বিষয়েই আমাদের হাত-পা বেঁধে রাখে নি। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা মুক্ত; সেখানে আমরা ইচ্ছে করলেই জীবনে খানিকটা সমৃদ্ধি অন্তত আন্‌তে পারি। কিন্তু আমাদের চেষ্টা নেই, উৎসাহ নেই—এবং যা সব চেয়ে বড়—ইচ্ছাই নেই। অত্যন্ত হীন এক পরি-স্থিতিতে আমরা আচ্ছন্ন। আমাদের হিন্দু সমাজের দিকে একবার তাকালেই কত যে বর্ব্বরতা আর মূঢ়তা চোখে পড়ে, তার ইয়ত্তা নেই। সমবেত ভাবে না হোক্, নিজের বাড়িতে, নিজের পরিবারের গণ্ডীর ভেতর সে-সব অপনোদনের চেষ্টা আমরা ক'জন

করি ? আমাদের মেয়েদের জীবন রান্নাঘরে আর শোবার ঘরে (এবং প্রসূতি-ঘরে) আবদ্ধ ; আমাদের ছেলেমেয়েরা ছেলেবেলা থেকে নিতান্ত বর্ব্বর প্রণালীতে ইস্কুলে কুশিক্ষা পেতে থাকে ; আমাদের বেশির ভাগ হিন্দু-বিবাহ নিছক প্রজনন-কল্পে ইন্দ্রিয়-মিলন ছাড়া কিছু নয়—এ-সব বিষয়ে আমরা কী না করতে পারি ? অথচ কী করছি ? ক'জনই বা এ-সব বিষয়ে সচেতন ? সবাই সমাজ-সংস্কারক হ'তে পারে না, কিন্তু স্বগৃহের বেষ্টনীর মধ্যে কিছু-কিছু পরিবর্ত্তন করা কারুরই সাধ্যাতীত নয়। আর—নিজের জীবনের ওপর নিজেরই পরিপূর্ণ অধিকার—নিজের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সাধনায় বাইরের কোনো শক্তি কখনো বাধা দিতে পারে না—সমাজ, সংসার, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট—কেউ নয়। বাইরের স্থাপিত শক্তির প্রতিকূলতায় চল্‌লে দুঃখ পেতে হ'তে পারে, কিন্তু সেই দুঃখেও এ-আনন্দ কখনো ভোলবার নয় যে আমি কখনো হার মানি নি, পরের কাছে নিজকে বেচে দিই নি, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে পরিপূর্ণরূপে আমি 'আমি' হ'তে পেরেছি। এই দুঃসাহস আমাদের দেশ থেকে লোপ পেতে বসেছে। আসলে আমরা মৃত, সব মৃত। তা'র ওপর, পলিটিক্সের প্রখর দাবী মেটাতে গিয়ে ব্যক্তিত্বকে ঘোষণা করা হয়েছে অবান্তর, নিষ্প্রয়োজনীয়—শুধু তা-ই নয়, দেশের প্রকৃত কল্যাণের বিরোধী। ধূর্জ্জটিবাবু ঠিকই বলেছেন, 'দেশে আর মানুষ নেই।' এবং সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বছরে আটমাস বিদেশে থাকেন ; সেইজন্যই বাঙলার অনেক কৃতী পুরুষ পণ্ডিচেরীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

> গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে আমার এই আপত্তি যে, সে কেবলই আমার ছোট আমিকে Pander করছে, আমার Personality-র পথে অন্তরায় হয়েছে, কিম্বা বাধা-সৃষ্টি করছে। সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় লোক অর্থাৎ ভয়। সব ধারেই কেবল জুজুর ভয় দেখাচ্ছে মশাই, কেবল জুজুর ভয়! আমি অন্য সম্প্রদায়ের কথা জানি না—তবে আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, শিক্ষিত অধ্যাপক-সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি মানুষ দেখিনি যিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সাহস ক'রে সত্যপথ অবলম্বন করেছেন। চাকরী ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেবার কথা বলছি না। আমরা প্রত্যেকেই, একজনকেও বাদ দিয়ে বলছি না, অত্যন্ত সাবধানী, ভীরু ও অপদার্থ।

ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে ভীরুতার অপসারণ করতে গিয়ে দেশের বর্ত্তমান নেতারা আর এক ভীরুতার প্রবর্ত্তন করছেন—সে বোধ হয় আরো বেশি ক্ষতিকর। সে হচ্ছে নিজের সম্বন্ধে ভয় ; নিজের অন্তরের তাগিদ অনুসারে গড়ে' ওঠবার সাহসের অভাব, স্বধর্ম্মে নিহত হ'বার ভয়ে পদে-পদে পরধর্ম্মকে আশ্রয় করা। এই আত্ম-হত্যাকারী ভীরুতার প্রতিবাদ-স্বরূপ ধূর্জ্জটিবাবুর বইখানা অত্যন্ত মূল্যবান।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

Dawn—THEODORE DREISER (Constable).

থিয়ডোর্ ড্রাইসার্-এর সঙ্গে যাদের পরিচয় আমার মতো পরস্মৈপদী, এ-বইখানি পড়া তাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। দৈনিক সংবাদদাতাদের কৃপায় ড্রাইসার্-এর যে-ছবি আমার মনে অঙ্কিত হয়েছিলো, তার পরে তাঁর সাথে বিশ্রম্ভালাপের কোনো আকাঙ্ক্ষাই আমি অনুভব করিনি। আমার বিশ্বাস ছিলো, মানুষটি অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির ; লোক-পরম্পরায় শুনেছিলুম, তাঁর সহিষ্ণুতার সীমা এতই সঙ্কীর্ণ যে, তর্কযুদ্ধে অকাট্য যুক্তির

চেয়ে বাহুবলকেই তিনি বড় মনে ক'রে থাকেন ; জানিনা কি কারণে অনুমান করে-ছিলুম, আধুনিক আখ্যাটা তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য না-হ'লেও, সাম্প্রতবিদ্ উপাধিটা তাঁর স্বভাবের সঙ্গে চমৎকার খাপ খায়। কিন্তু এই ছ'শ পাতার আত্মজীবনীতে যে-ব্যক্তিটির সাক্ষাৎ মিললো, তাকে উন্মুখর কোনো মতেই বলা চলে না। স্বপ্রতিষ্ঠা প্রতিপন্ন করা লেখকের এতই অনভিপ্রেত যে, মাঝে মাঝে পাঠকের সন্দেহ হয় পুস্তকটি রচনার মৌল প্রেরণা বুঝি আত্মদীনতা। অন্ততপক্ষে তাঁর কল্পিত যৌনজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত অন্য কি উদ্দেশ্যে এখানে প্রবর্ত্তিত হ'য়ে থাকতে পারে, তা আমি এখনো বুঝিনি। অভিজ্ঞতাগুলি মামুলি, এতই মামুলি যে, সংবাদ-হিসেবে কিম্বা চরিত্রচিত্রণের বর্ণরূপে সেগুলি একেবারেই মূল্যহীন। তবু মনে হয় সেগুলিকে বাদ দিলে বইখানির লাভের চেয়ে লোকসানই হয়তো বেশি হতো। কারণ সংযম ও শালীনতার দিক্ দিয়ে ঘটনা-গুলি পরিহার্য্য হ'লেও, গ্রন্থকর্ত্তার বিনয় ও নির্লেপের নিদর্শনস্বরূপ ওগুলি মহার্ঘ। যে-ব্যক্তি নিজের স্খলন-পতন-ত্রুটির অনতিরঞ্জিত তালিকা দিতে সদাই প্রস্তুত, আত্মীয়-পরিজনের ক্ষয়-পরাজয়ের কাহিনী তার মুখে আর ছিদ্রান্বেষের মতো শোনায় না।

উপরন্তু এই অতীতের শবচ্ছেদে সত্যই কোনো নিষ্ঠুরতার চিহ্ন নেই, আছে কেবল অনুসন্ধিৎসা। ড্রাইসারের অনুসন্ধান সর্ব্বত্রই সার্থক, তা অবশ্য বলতে পারবো না। তাঁর শক্তির মূলে আছে তাঁর সহৃদয়তা ; বিশুদ্ধ চিন্তায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন নি ; কাজেই যে-সমস্যাকে নিষ্কাম ভাবুকতার সাহায্যে বুঝ্‌তে হয়, সে-প্রসঙ্গে ড্রাইসার্ অলজ্জ ভাবালুতার শরণ নিয়েছেন। স্থানে অস্থানে নিরর্থ শব্দের রিক্ত নির্ঘোষ বইখানিকে কষ্টপাঠ্য ক'রে তুলেছে বটে, কিন্তু মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি স্থায়ী অবিচার হয়নি ব'লেই আমার বিশ্বাস। ব্যতিক্রম ঘটেছে কেবল গ্রন্থকারের পিতার সম্বন্ধে। এখানেও তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি ; কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে লেখকের প্রকৃতিগত বিরোধ থাকায়, অসীম প্রয়াস, অপার সমবেদনা সত্ত্বেও, বৃদ্ধ ড্রাইসারের পরমার্থনিষ্ঠার অন্তর্নিহিত মহত্ত্বটুকু তাঁর পুত্রকে বিচলিত করেনি। বৃদ্ধের মধ্যে যদিও ট্র্যাজিডির বীজ ছিলো, তবু তাঁর পুত্রের কাহিনীতে তিনি প্রহসনের সঙ হয়েই রয়ে গেছেন, শোকাবহ নাটকের নায়করূপে দেখা দিতে পারেন নি।

এতে আপত্তি করা নিশ্চয়ই অন্যায়, কেননা ড্রাইসার্-জীবনীর প্রধান গুণ হচ্ছে তার গদ্যময় দৈনন্দিনতা। এই মনোবিকলনের যুগে অনেকেই আত্মচরিত লিখে থাকেন, এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আপনাকে খাটো ক'রে জীবনের পরিপ্রেক্ষিত ও পরিমগুলাকে শ্রদ্ধা জানাতে পশ্চাদপদ নন্ ; কিন্তু যত দূর মনে পড়ছে, তাতে থিয়ডোর্ ড্রাইসার্ই বোধ হয় একমাত্র লেখক যিনি বিচক্ষণ যোগবিয়োগের সাহায্যে জীবন-চরিতকে নাটকের, অন্ততপক্ষে উপন্যাসের, রূপ দেওয়ার প্রলোভন এড়িয়ে গেছেন। তাঁর পিতামাতা, বারোটি ভাইবোন, অসংখ্য প্রতিবেশী, অগণ্য সহপাঠী, অস্থাবর বাসস্থল, অস্থায়ী উপজীবিকা, সনাতন দারিদ্র্য, পরিবর্ত্তনশীল অন্নদাতা, বর্দ্ধিষ্ণু এমেরিকার সুখ, দুঃখ, বৈচিত্র্য, এই সমস্তের মধ্যে নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের সম্ভাবনা প্রায় অনন্ত ছিলো বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই অতুল ঐশ্বর্য্যের ভিতর দিয়ে একটি অকিঞ্চিৎকর জীবনকে অপ্রমত্তভাবে চালানোর পিছনে যে-সুমহান সত্যনিষ্ঠার পরিচয় আছে, তা উপলব্ধ করার পরে পুস্তকখানিকে নিষ্প্রয়োজন বা নগণ্য ব'লে ভাবার কোনোই উপায় থাকে না।

লেখক কয়েকবার জানিয়েছেন যে, এই আত্মীয়-বান্ধবদের তিনি ইতিপূর্ব্বেই উপন্যাসের উপাদান-হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এর পরে তাদের নিয়ে আবার উপন্যাস না-রচাই হয়তো স্বাভাবিক। তা ছাড়া এটাও বোধ হয় সত্য যে, ঘটনাবিশেষের নাটকীয় সম্পদ দর্শকেরা যতটা দেখ্‌তে পায়, নটেরা তার কিছুই লক্ষ্য করে না। কিন্তু এই বাস্তবপন্থী নাটকে ড্রাইসার্‌ কেবল অভিনেতা নন্‌, সমালোচকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিও তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। উপরন্তু তাঁর মারফতে এই অঘটনসংঘটন যদি না-ও হ'য়ে থাকে, তাঁর আত্মসংযম যদি আমার কল্পনামাত্রই হয়, তবু 'ডন্‌' বইটিকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। যে-জীবনের বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেটার কবল থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসা এমনি অসামান্য ব্যাপার যে, শুধু এইটুকুর কৃতিত্বের জন্যেই ড্রাইসার্‌ আমাদের পূজ্য। এই জীবন-সম্বন্ধে 'ভয়ঙ্কর' বিশেষণটি অপলাপের মতো শোনায় না। কাজেই সাহিত্য-হিসেবে তুচ্ছ হ'লেও, অন্তত ইতিহাস-হিসেবে বইখানি আদরণীয়।

ড্রাইসারের পিতা এককালে অবস্থাপন্ন ছিলেন। কিন্তু থিয়ডোর্‌ জন্মাবার অনতিপূর্ব্বে কারখানার কড়ি মাথায় প'ড়ে কিছু দিনের জন্যে তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। এই সুযোগে কোনো এক ফন্দিবাজ পরিবারটির সর্ব্বনাশসাধনে কৃতকার্য্য হয়। সময়ে গৃহস্বামীর স্বাস্থ্য ফিরে এলো, কিন্তু অপহৃত সম্পত্তি ও অস্তমিত সম্ভ্রমের আর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেলো না। ফলে ঐহিক সমৃদ্ধিকে পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর মতো অস্থির জেনে, গোষ্ঠীপতি সহধর্ম্মিণীর উপরে অন্নসংস্থানের ভার নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিয়ে, তাঁর সমস্ত অধ্যবসায় নিয়োগ করলেন পারত্রিক স্বাচ্ছন্দ্য-সংগ্রহে। গৃহকর্ত্রী সুখে লালিত হয়েছিলেন; অতিমর্ত্ত্যের আকাঙ্ক্ষা স্বামীর চেয়ে তাঁর কম তো ছিলোই না, বরং মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে একটা দিব্যদৃষ্টির আভাস পাওয়া যেতো। তাহ'লেও তিনি জান্‌লেন যে, পারলৌকিক মঙ্গল ইহলৌকিক অনিষ্টের দ্বারা সাধিত হয় না; তিনি বুঝলেন যে, দেহ আর আত্মা একই অখণ্ডতার এ-পাশ আর ও-পাশ। তাই এই জীবন্ত মরণে তিনি তাঁর স্বামীর অনুগমন কর্‌তে পারলেন না, কায়মনবাক্যে চেষ্টা কর্‌লেন যাতে এই বৃহৎ পরিবার আবার তার স্বাধিকার ফিরিয়ে পায়। এর জন্যে কোনো উপায়কেই তিনি নিন্দনীয় মনে কর্‌লেন না; ভিক্ষা, দাসীবৃত্তি, নিরুদ্দেশযাত্রা ইত্যাদি তো চল্‌লোই, এমন কি চোখের আড়ালে যুবতী মেয়েদের স্বেচ্ছাকৃত দেহ-বিক্রয়েও তাঁর প্রতিবাদ বাক্‌বহুল হ'য়ে উঠলো না। উর্দ্ধজগতে এর জন্য তাঁকে শাস্তি ভোগ কর্‌তে হয়েছে কিনা জানা নেই, কিন্তু এই ধূলির ধরায় তাঁকে যে-সাজা পেতে হয়েছে তার ফর্দ্দ সত্যই রোমহর্ষক। অকর্ম্মণ্য স্বামীর হিতোপদেশ, জোষ্ঠ পুত্রদের কারাবাস, একটি কন্যার প্রকাশ্য কলঙ্ক ইত্যাদি প্রাত্যহিক দুর্ভাগ্যের বোঝা অনেক নিঃস্বকেই বইতে হয়, কিন্তু মৃত্যুর পর কবরের অভাবে শোবার ঘরে পচার মতো অদৃষ্ট নিয়ে খুব কম লোকেই জন্মে থাকে। রোমক গির্জ্জার পাদ্রীসাহেবদের মারফতে ভাগ্যবিধাতার উৎকোচ-গ্রহণের অভ্যাসটা এখনো বদলায়নি ব'লেই ব্যাপারটার শেষরক্ষা হলো, কিন্তু সে-ঘটনাটার দাগা লেখক বা পাঠকের মন থেকে সহজে মুছবে না।

থিয়ডোরের মা-ই হচ্ছেন 'ডনে'র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কিন্তু দেবতার মতো তাঁর প্রভাব অনির্ব্বচনীয়, অলক্ষ্য; থিয়ডোরের জীবনকে তিনি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও

রমণীয় ক'রে থাক্‌লেও এই জীবনের পরিণতি ও সার্থকতার জন্যে থিয়ডোর্‌ মুখ্যত সহজ ধৈর্য্য ও জাতিগত কৃচ্ছ্রসাধনের কাছেই ঋণী। অবশ্য দু'চার জন নিঃস্বার্থ শুভানুধ্যায়ী তারও যে না-মিলে ছিলো, এমন বল্‌লে মিথ্যা হবে; কিন্তু মোটের উপরে তার প্রধান সহায় ছিলো অদম্য অভীপ্সা এবং কঠোর একাগ্রতা। থিয়ডোর্‌ ড্রাইসার্‌ যদি এমেরিকার প্রাণবস্তুর প্রতিনিধি হন, তাহ'লে বোঝা শক্ত হবে না, এই দেশ আজকে জগতের শীর্ষস্থান কেন অধিকার করেছে। কী প্রচণ্ড পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তিনি মানুষ হয়েছেন, তা সংক্ষেপে বলা অসম্ভব; উপরন্তু এই বইখানি তাঁর জীবনের প্রথম বিশ বছরের ইতিহাস মাত্র। তাই তাঁর পূর্ণ স্বরূপ এখানে অঙ্কিত করা আমার সাধ্যের অতীত। তবু উপসংহারে আমায় পুনরুক্তি করতেই হবে যে, দরদী পাঠক 'ডন্‌' রচয়িতাকে মহৎ লেখক ব'লে হয়তো না-ভাবতে পারেন, কিন্তু ড্রাইসার্‌কে তিনি মহৎ ব্যক্তি ব'লে স্বীকার কর্‌তে অণুমাত্র কুণ্ঠা বোধ কর্‌বেন না।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

The Road Back. BY ERICH MARIA REMARQUE. Translated from the German. G. P. Putnam's Sons.

Guests of the Nation. BY FRANK O'CONNOR. Macmillan & Co., Ltd.

১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত ইউরোপে যে মহাযুদ্ধ হয় তার সম্বন্ধে আজো বই-র শেষ হোলোনা। এই বইগুলির মধ্যে Erich Maria Remarque নামক জার্ম্মান লেখকের All Quiet on the Western Front বইখানি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। লেখক নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছিলেন বইখানিতে তারই বর্ণনা করেছেন। এই অভিজ্ঞতা আমাদের পরিচিত দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে একেবারে ভিন্ন। সমরক্ষেত্র আর সংসারক্ষেত্র এক নয়। গোলাগুলির নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা মানুষের দেহমনের উপর যখন একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন করে, তখন সংসারের সুখদুঃখবিজড়িত নিত্যকার জীবন, ভাঁটার জলের মতন, বহুদূরে স'রে যায়; শুধু মাঝে মাঝে তার ক্ষীণ তরঙ্গধ্বনি কানে এসে লাগে, তখন মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। ইচ্ছা হয়, আবার সেই আনন্দে ও বেদনায় ঘেরা সংসারের সহজ আবেষ্টনের মধ্যে ফিরে যেতে। হয়তো বা মাঝে মাঝে তার সুযোগও ঘটে, কিন্তু তা অতি অল্পকালের জন্য; তারপর আবার সেই যুদ্ধক্ষেত্র, সেই উন্মত্ত তাণ্ডব, দিনের পর দিন সেই নিষ্ঠুর মরণলীলা—এই হোলো একমাত্র বাস্তব, বাদবাকি যা কিছু সব স্বপ্ন। All Quiet on the Western Front" বইটিতে যে-জগতের বর্ণনা আছে সে হোলো এই যুদ্ধক্ষেত্রের জগৎ। যারা এই জগতের অধিবাসী—মাত্র চার বৎসরের জন্যও—তাদের হালচাল, ধরণ-ধারণ আমাদের থেকে একবারে স্বতন্ত্র, তাই আমাদের রীতি-নীতির প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে তাদের বিচার করা চলেনা। কিন্তু এই জগৎটি চিরস্থায়ী নয়—একদিন দীর্ঘ চার বৎসরের অবসান হোলো, যারা এই যুদ্ধক্ষেত্রে দিনের পর দিন কাটিয়েও মরণকে ফাঁকি দিয়েছে তাদের আবার ঘরে ফেরার সময় হোলো, আমাদের নিত্যকার পরিচিত জগতে তাদের আবার ডাক পড়্‌ল। তখন কি সেই চার

বৎসরব্যাপী ধ্বংসলীলা কঠিন বাস্তবের রূপ ছেড়ে অবাস্তব দুঃস্বপ্নের মূর্ত্তি ধর্‌ল আর যে-সহজ জীবনযাত্রা স্বপ্নে পরিণত হয়েছিল তা আবার বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সহজ হ'য়ে উঠ্‌ল?

যদি তাই হোতো, তাহ'লে যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে আবার হয়তো শান্তি আস্‌ত। কিন্তু এই যে চার বৎসরব্যাপী মহাযুদ্ধ, তার অবসান অত সহজে হয়নি। গোলাগুলির পালা যখন ফুরালো তখন দেখা গেল যুদ্ধের প্রভাব যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়ে বহুদূর ব্যাপ্ত হয়েছে। যারা পরিণত বয়সে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফিরে এসে তাদের স্ত্রীপুত্রের মাঝখানে, তাদের পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্রে তাদের অভ্যস্ত স্থান আবার দখল কর্‌ল; কিন্তু অনেকেরেই ভাগ্যে ফিরে আসার পর জুট্‌ল শুধু দুঃখ ও লাঞ্ছনা—তারা দেখ্‌ল পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্রে তাদের স্থান অন্যে দখল করেছে, এমন কি হয়তো নিজের স্ত্রী পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ বিরহের শূন্যতা পূরণের জন্য অন্য পুরুষকে হৃদয়ে বরণ ক'রে নিয়েছে।

কিন্তু আরো একদল ছিল যারা বাল্য অবস্থা থেকে কৈশোরে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মা বাবা ভাই বোন, তাদের পড়াশুনা খেলাধুলা ত্যাগ ক'রে সহসা যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল। সংসারের সঙ্গে তাদের পরিচয় মোটেই পাকা হ'য়ে ওঠেনি—এমন কোনো অবলম্বন তাদের তখনো জোটেনি যা যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত উত্তেজনার মধ্য দিয়েও মনের উপর আপন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখে। যখন এরা ফিরে এল তখন আর এরা কিশোর নয়—যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এরা অনেকখানি বড় হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু এই এক অভিজ্ঞতা ছাড়া আর অন্য কোনো অভিজ্ঞতাই তাদের নাই, তাই তারা যখন ফিরে এল তখন কোথাও আর নিজেদের খাপ খাওয়াতে পার্‌লনা। হঠাৎ একদিন বন্যার জলের মতন যুদ্ধ তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই উত্তাল জলরাশিতে তাদের অনেকে তলিয়ে গেল, যারা থাক্‌ল তারা এক সর্ব্বগ্রাসী বিপদের মধ্য দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ হোলো। তারপর আবার একদিন হঠাৎ বন্যার জল সরে গেল, তখন তারা দেখ্‌ল তারা মাটিতে প'ড়ে, কিন্তু এ মাটি সেই পূর্ব্বপরিচিত মাটি নয়—বন্যায় তা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। একদিন তারা ধ্বংসের করাল মূর্ত্তি দেখেছিল, কিন্তু তা তাদের পরিচিত জীবনের আবেষ্টন থেকে বহুদূরে। কিন্তু এই পরিচিত জীবনের মধ্যে ফিরে এসেও যখন তারা দেখ্‌ল তার সমস্ত সম্পদ একেবারে লুপ্ত হয়েছে তখন তারা জানল তারা সত্যিই নিরাশ্রয়।

All Quiet বইটিতে এই দারুণ ট্রাজেডির আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তা আভাসমাত্র—বইখানির মূল সুর সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার। Remarque-এর দ্বিতীয় বই—The Road Back—এই ট্রাজেডি অবলম্বন ক'রেই লেখা। All Quiet বইটিতে যুদ্ধের যে ভয়ঙ্কর ছবি লেখক এঁকেছেন তার পটভূমি যুদ্ধক্ষেত্র; যে ধ্বংসলীলার বর্ণনা তিনি করেছেন তা সাময়িক। কিন্তু The Road Back বইটির লেখক যে ঘটনাপরম্পরার বর্ণনা করেছেন তাদের স্থায়িত্ব যারা যুদ্ধে গিয়েছিল তাদের সমস্ত জীবনব্যাপী এবং তাদের পটভূমি আমাদের এই পরিচিত সংসারক্ষেত্র। এই সংসারে আর সকলেরি স্থান আছে কেবল যারা চার বৎসর অসীম দুঃখ সহ্য ক'রে প্রাণপণ শক্তিতে এর সমস্ত সৌন্দর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্য শত্রুর সঙ্গে লড়েছিল,

তারাই শুধু এখানে অনাহূত অতিথির মত অনাদৃত। এই অনাদরের দুঃখ যুদ্ধক্ষেত্রের অবর্ণনীয় যন্ত্রণার চাইতে অনেক বেশী মর্ম্মঘাতী। যখন এই মর্ম্মঘাতী দুঃখে জীবন দুঃসহ হ'য়ে উঠ্‌ল তখন যুদ্ধক্ষেত্রের স্মৃতির মধ্যে অনেকের মন আশ্রয় খুঁজল। সংসারে যখন কোনো আশ্রয়ই জুট্‌লনা তখন যুদ্ধক্ষেত্রে ছোট ও বড়—তরুণ ও প্রবীণ—সকলে যে-নিবিড় বন্ধুত্বের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল মনে হোলো জীবনে তাই একমাত্র সত্য ব'লে। কিন্তু নিষ্ঠুর সংসারের কঠিন সংঘাতে এই ঐক্যবন্ধনও চূরমার হ'য়ে ভেঙে গেল; যারা একদিন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিল তারাই ফিরে এসে স্বার্থের প্রবল দাবী উপেক্ষা কর্‌তে না পেরে পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌ল। এই রকম দুঃখের পর দুঃখ, আঘাতের পর আঘাত পেয়ে কেউ গেল পাগল হ'য়ে, কেউ কর্‌ল আত্মহত্যা। এই হোলো যুদ্ধবিরতির পরবর্ত্তীকালের ট্রাজেডি। ঘটনার পর ঘটনার মধ্য দিয়ে এই ট্রাজেডিই The Road Back বইটিতে ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ট্রাজেডির কথাই The Road Back বইটির সব কথা নয়। শত্রু ও মিত্রের বিরোধ, বিভিন্ন আদর্শের বিরোধ, বিচিত্র স্বার্থের বিরোধ—এই সকলকে বিরোধের বহু উপরে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সহজ ভালোবাসার সম্বন্ধ আকাশব্যাপী অসীম নীলিমার মত সংসারের সমস্ত গ্লানিকে ব্যাপ্ত ক'রে আছে, এই বইটির মধ্যে তা বারবার পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে; মানুষের জীবনের এই চিরন্তন সত্যের উপলব্ধিই এই বইটির প্রেরণা। যে-গভীর নৈরাশ্য এই বইখানি পড়্‌তে পড়্‌তে বারবার আমাদের মনকে অভিভূত করে, তার কুহেলিকাজাল ভেদ ক'রে এই আশ্বাস আমাদের মনে জাগে যে, সভ্যতার সমস্ত ঐশ্বর্য্য যুদ্ধের প্রলয়-দাহনে পুড়ে ছাই হ'য়ে যেতে পারে, কিন্তু তবু মানুষের জীবনের যা একান্ত স্বকীয় সম্পদ তা অমলিন ও তা অমর এবং একদিন সকল বিরোধের অবসানে তার আলোকে মানুষের সমগ্র জীবন আবার উদ্ভাসিত হবে—

> Word over all, beautiful as the sky,
> Beautiful that war and all its deeds of carnage must in time
> be utterly lost,
> That the hands of the sisters Death and Night incessantly
> softly,
> Wash again, and ever again, this soiled world. . . . . .

Guests of the Nation বইটি উপন্যাস নয়, ছোট গল্পের সমষ্টি। প্রথম গল্পটির নামে বইটির নামকরণ হয়েছে। আয়ারলণ্ডের সিন্ ফেন্ দলের তরফ থেকে Michael Collins ও Arthur Griffith প্রভৃতি নেতৃবর্গ যখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে রফা ক'রে Dominion Status-এ রাজি হন্ এবং ফলে Irish Free State-এর সৃষ্টি হয়, তখন De Valera-র নেতৃত্বে সিন্ ফেন্ দলের অনেকে তার প্রবল প্রতিবাদ করেন, কেননা তাঁরা চেয়েছিলেন শুধু স্বরাজ নয়, স্বাধীনতা। এইরূপে দুই দলের সৃষ্টি হোলো—Collins ও Griffith-এর নেতৃত্বে Free State-এর দল এবং De Valera-র নেতৃত্বে Republican দল। Free State-এর দলের হাতে ছিল রাজ্যশাসনের যা কিছু কলকব্জা, কিন্তু Republican দল পদে পদে তাদের বাধা দিতে লাগ্‌ল। এই সংঘর্ষ খুনোখুনির মধ্য দিয়ে ভীষণ অন্তর্যুদ্ধে পরিণত হোলো এবং এই অন্তর্যুদ্ধে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে মর্ম্মান্তিক মতদ্বৈধ ঘট্‌ল তার সমাধান হোলো পরস্পরের রক্তপাত ক'রে। রক্তস্রোতের দুই পারে আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা দুই

ভাগে বিভক্ত হোলো। এই দ্বিখণ্ডিত আয়ারল্যাণ্ডের পটভূমিকার উপর নবীন লেখক Frank O'Connor তাঁর গল্পগুলির চরিত্র ও ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশ করেছেন। আয়ারল্যাণ্ডের সহরে, গ্রামে, অলিতে গলিতে, কুটীরে কুটীরে, পাহাড়ে বনে প্রান্তরে Republican ও Free State দলের সংঘাত এই গল্পগুলির চরিত্র ও ঘটনাপুঞ্জের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তার চাইতেও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে মানুষের মনের যা চিরন্তন উপকরণ—দুর্বলতা, শক্তি, আশা, ভয়, স্বার্থপরতা, ভালোবাসা। সাময়িক উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কি ভাবে মানুষের মনের সম্পদ ও নিঃস্বতা আত্মপ্রকাশ করে এই গল্পগুলির মধ্যে আমরা তার অতি নিপুণ চিত্র পাই। এই চিত্র যিনি এঁকেছেন তাঁর দৃষ্টি শুধু আয়ারল্যাণ্ডের অন্তর্যুদ্ধের ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে নিবদ্ধ নাই—এই সাময়িক ঘটনাধারার তলে তলে মানুষের মনের যে-নানা গভীর রহস্যের তিনি পরিচয় পেয়েছেন তা সকল কালের এবং সকল দেশের মানুষের মনের কথা।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

ঝড়ের রাতে—শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত, শ্রীঅখিল নিয়োগী কর্তৃক নিয়োগীনিকেতন হইতে প্রকাশিত।

বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চে যুগান্তরকারী অনেক ব্যাপারই অনেক বার ঘটেছে, কিন্তু কল্পান্তর এনে দেবার সৌভাগ্য নটনাথ স্থির ক'রে রেখেছিলেন ভক্ত শচীনবাবুর জন্যে। "ঝড়ের রাতে" সেই সৌভাগ্যের পরিচায়ক। দ্বিজেন্দ্রলালের খেদ এতদিনে মিটেছে। "একটা নতুন কিছু" এতদিনে পেলাম বটে। এই নাটকের বিজ্ঞাপন হিসাবে রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষেরা নাটকের গুণ গান ক'রে হ্যাণ্ডবিলে ছাপিয়েছিলেন "এ ছায়ার মায়া নহে—এ জীবিতের আবেদন—থ্রিল্, রোমান্স্, এডভেঞ্চার আর কি চাই?" কথাগুলো বর্ণে বর্ণে ঠিক। এ যেন একেবারে কুল্পির হাঁড়ি—ডাব নেবু মালাই কৎবেল, যে কুল্পি চাও তাই পাবে।

ব্যাপারটা এই :—উচ্চশিক্ষিতা "পুষ্পিত যৌবনা" নায়িকা বিজু পুরীতে সমুদ্রস্নান করতে গিয়ে প্রায় ডুবে যান। এই দুঃসময়ে তাঁকে ত্রাণ করে প্রভঞ্জনের ব্যায়ামপুষ্ট পেশীবহুল বাহু। অমন সুন্দর বলিষ্ঠ অপরিচিত যুবকের আলিঙ্গনে বাঁধা থাকবার সুযোগ তিনি হেলায় হারাতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তিনি "সম্পূর্ণ চেতনা নিয়েও অচেতনের ভান করে" তাঁর "সমস্ত অঙ্গ দিয়ে" প্রভঞ্জনের অঙ্গ-স্পর্শ-সুখ অনুভব করতে করতে তার কোলে চড়ে বাসায় এলেন। ক্রমে প্রেম গভীর হ'য়ে উঠলো। শেষে হাজারিবাগের এক পাহাড়ের উপর এক শুভ অপরাহ্নে প্রভঞ্জন "ঠোঁটের বন্ধনী দিয়ে" বিজুর "স্ফুরিত অধর চেপে ধরলে"। প্রেমের চুক্তিপত্রে শীলমোহরের ছাপ প'ড়ে গেল কিন্তু কি কারণে সে চুক্তিভঙ্গ হ'ল নাট্যকার তা কিছু বলেন নি। পরে দেখা গেল যে, তিনি গেজেট খুলে সে বছরের সব চেয়ে ভালছেলেকে আবিষ্কার ক'রে বরমাল্য দিলেন তারি কণ্ঠে। বিজু মনে করেছিলেন যে, প্রশান্ত যখন এত বিষয়ে "উঁচু ডিগ্রি" পেয়েছেন তখন কাম শাস্ত্রেও তিনি নিশ্চয়ই পরম পণ্ডিত। কুল

[illegible] যখন বছরের পর বছর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চল্‌লো অথচ স্বামী তাঁর যৌবন-জমীতে চাষ আবাদ কিছুই করলেন না। এই রকম ক'রে তাঁদের বিবাহের পঞ্চম বার্ষিক উৎসব রজনী এসে পড়লো। স্বামী ভুলো মানুষ। আজ যে তাঁদের প্রেমের সাম্বৎসরিক সে কথা একেবারে খেয়ালই নেই। তিনি তখনও নর কঙ্কাল আর মড়ার খুলি নিয়ে নৃতত্ত্বের কোন গভীর গবেষণায় ব্যাস্ত। বড় রাগ, অভিমান, দুঃখ আরো কত কি, হ'ল বিজুর। এই 'পতিদেবতাকে' নিয়ে সে করবে কি? একি কোন দিনই রক্তমাংসের "মানুষ" হ'য়ে তার রক্তমাংসের দাবী মেটাবে না? ঝড় উঠলো—বাইরে ঝড়, বিজুর হৃদয়ে ঝড়। বিজু স্থির করলে এ দেবতা নিয়ে ঘর করা আর চলে না—মানুষ চাই। তার উচ্চ শিক্ষিত মন তাকে বার বার জিজ্ঞেস্ করলে, যে-স্বামী তাকে তার "পুষ্পিত যৌবনের" সুখ বুঝ্‌তে দিলে না তাকে ধ'রে রাখ্‌বার অধিকার সে স্বামীর আছে কি-না—সে স্বামীর কাছে বিজু মুক্তির দাবী করতে পারে কি-না। এই চিন্তায় যখন তার মন উদ্‌ভ্রান্ত এমন সময়ে সেই ঝড়ের রাতে তার পূর্ব্ব প্রেমিক প্রভঞ্জন নরহত্যাকারী ডাকাতের সুনাম নিয়ে পুলিশের হাত এড়িয়ে আশ্রয় নিলেন তারই বাড়ীতে। নামের সার্থকতা একেই বলে।

প্রভঞ্জন প্রশান্তর বাল্যবন্ধু কিন্তু তিনি যে বিজুরও অন্তরঙ্গ সে-কথা তখন গোপন রইল। উৎসব রজনীতে বিজুর যৌবনের সংক্রমণকে উপেক্ষা ক'রে স্বামী যখন বিছানার ভিতর নৃতত্ত্বে মস্‌গুল এবং অন্যত্রে প্রভঞ্জনের চোখেও ঘুম নেই, তখন হঠাৎ নিশুতি দুপুর-রাতে ঝড়-বিদ্যুতের মিলন ঘট্‌লো। প্রভঞ্জন "বিবাহের চেয়ে বড়ো" এক অধিকার সূত্রে বিজুকে জড়িয়ে ধ'রে প্রেমালাপের দাবী ক'রে বস্‌লো। আবেদন মঞ্জুর হ'তে বিলম্ব দেখা গেল না। থ্রিল্ রোমান্স্ এডভেঞ্চার আর কি চাই? বিজু বুঝ্‌লে এতদিনে মানুষ পাওয়া গেছে, এবার "দেবতা"কে বিসর্জ্জন দিয়ে প্রভঞ্জনের সঙ্গে গৃহত্যাগ করাই প্রশস্ত। প্রভঞ্জনের মাথা কোলের উপর টেনে নিয়ে, পুরাতন প্রেমের জাবর-কাটা-কাটা যখন খুব দুনে চল্‌ছে এমন সময়ে "ভৈরব-দা, আমার বন্দুক" ব'লে বজ্র নির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর আবির্ভাব হ'ল। বিজু বেশ ভাল ক'রেই তার স্বামীকে বুঝিয়ে দিলে যে, "এই বন্দীই তার প্রাণেশ্বর"। সারগর্ভ বক্তৃতা শুনে হোক্, কিম্বা গভীর প্রেমের ঠেলাতেই হোক্, স্বামীর হাত থেকে বন্দুক খসে পড়্‌লো, আর বিজু প্রভঞ্জনের কাঁধে হাত রেখে হলেন বাড়ীর-বার। সদর দরজা পেরিয়েই কিন্তু বিজুর মনে হ'ল যে, এ-রকম ক'রে চলে গেলে লোকে বল্‌বে প্রভঞ্জনকে পেয়ে সে কুলে কালি দিয়েছে। উপরন্তু এ-উপায়ে যৌবনের ক্ষুধাই শুধু মিট্‌বে কিন্তু দশের দেশের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হবে না যে, স্বামীকে ত্যাগ করার অধিকার স্ত্রীর আজকাল জন্মেছে। কাজেই বিজু প্রভঞ্জনকে বিদায় দিলে। কিন্তু এই বিয়োগ ব্যাপারের মর্ম্মস্পর্শী আলাপ-প্রলাপ আধা নেপথ্যেই সমাধা হ'ল। আমরা কেবল দেখ্‌তে পেলুম "পড়ি ত কাদায় পড়্‌বো না—স্বামীর ভিটের উপরই পড়্‌বো" এই কথা বলতে বলতে বিজু দেউড়ীতে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌ছেন। তার পর সেই মূর্চ্ছিতা স্ত্রীকে কোলে ক'রে ঘরে ফিরিয়ে এনে প্রশান্তর কী উৎকণ্ঠা কী শুশ্রূষা! স্ত্রী কিন্তু একটু চাঙ্গা হ'য়ে উঠেই কাকচড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুটকেস গুছিয়ে প্রস্তুত। গৃহত্যাগের আসল কারণ বিবৃত ক'রে ফটক পেরিয়ে যান আর কি, এমন সময়ে পুরানো চাকর ভৈরব-দা (যার স্ত্রীও কুল সমুজ্জল ক'রে ইতিপূর্ব্বেই গৃহত্যাগ করেছিল) মনিবকে

পরামর্শ দিলে মানুষোচিত দর্পে বৌমার চুলের মুঠি ধ'রে ঘরে পূরে তালা বন্ধ করতে। অমনি প্রশান্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজুর হঠাৎ "বললে যেন মতটা"। তাই মানুষ অন্বেষণ করার "পথটা" ছেড়ে দিয়ে "ওগো তাই কর গো তাই কর" বলতে বলতে এসে তিনি ঝাঁপ দিলেন তাঁর স্বামীর বুকে। এমনি ক'রে প্রভঞ্জনের চুক্তিভঙ্গের মামলাটা কন্‌সেণ্ট ডিক্রি ফাইল ক'রেই মিটে গেল এবং যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে আমার নিরুদ্ধ আবেগও নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশের মূল্য বুঝ্‌লে।

রোমাঞ্চকারী ঘটনাবলীর সমাবেশও অভূতপূর্ব্ব। মাত্র চার প্রহরের মধ্যে কি না হ'ল! মহত্তর উদ্দেশ্যে নরহত্যা ক'রে (অবশ্য মহত্তর উদ্দেশ্যটা যে কী তা নাট্যকার কোথাও ফাঁস করেননি) পূর্ব্বপ্রেমিকের দ্রুত মোটর হাঁকিয়ে পলায়ন; পথে বিজুর ননদ ও তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা; পুলিসের গাড়ীর সঙ্গে রেস, পিস্তলের গুলিতে তরুণীদের টায়ার ফাটা; সেই গোলাগুলির মধ্যেও আধুনিকা ছুটির ডাকাতের চোখ দেখে হৃদয় হারিয়ে ফেলা; যাদের সঙ্গে আসনাই চলে অথচ বিয়ে অচল এমন ছটি তরুণকে দিয়ে ভাঙা গাড়ি ঠেলিয়ে দাদাবৌদির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসা; উৎসবসভায় মাসীমার অবিবাহিত ননদের মারফতে উদ্বাহকে উদ্বন্ধনের নামান্তর ব'লে প্রমাণ করানো; "ডাক্তার প্রভঞ্জন চক্রবর্ত্তী আছেন?" বলে হুঙ্কার ছেড়ে, এই বুঝি কোমরে দড়ি দিলে, এমন ভাব দেখিয়ে অমায়িক পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টরের স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে বুঝিয়ে দেওয়া যে, প্রভঞ্জন চক্রবর্ত্তী কাউকে খুন করেননি, কেবল অন্য খুনির নিষ্প্রাণ বলিটির ওপর দিয়ে মোটার চালিয়ে এসে পুলিসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার অপরাধেই তিনি অপরাধী (বাড়ি বয়ে এসে নিরপরাধীদের আশ্বাস দিয়ে যাওয়ার অভ্যাসটা বোধ করি আজকালকার অর্ডিন্যান্‌সের শ্রেষ্ঠ সুফল); এবং এই দিলাসা পাওয়া সত্ত্বেও প্রভঞ্জনের নিজেকে খুনি বলে ঘোষণা করার ব্যর্থ চেষ্টা—ওঃ সে কি চমৎকার ব্যাপার! অবশ্য শেষকালটায় একটু নিরাশ হ'তে হয়, যখন জানা যায় যে, প্রভঞ্জনের খুন এই কলিযুগে আর ফাঁসিকাষ্ঠে দণ্ডিত হয়না, কারণ তিনি মানুষ মারেননি হত্যা করেছেন প্রশান্তের সঙ্গে তাঁর আজন্মের বন্ধুত্বকে। কিন্তু তবু থ্রিলের অভাব নেই, রোমান্সের সুরিভোজে শেষকালটায় গা গুল্‌তে থাকে।

মনস্তত্বে পরম পণ্ডিত শচীনবাবু অনেক দিক্ দিয়েই তাঁর অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মনোবিকলন চরমে গিয়ে ঠেকেছে সেইখানে, যেখানে গৃহত্যাগে কৃতসঙ্কল্পা বিজু শাশুড়ীর গহনার সেফ্‌টিপিনটি পর্য্যন্ত বুঝিয়ে দিয়ে সদর দরজায় পা দেবার সময় ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ীর লোকেদের জানিয়ে দেন যে, রাত্রে স্যানাটোজেন না-খেলে তাঁর স্বামীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। ক্লাইম্যাক্‌স্ আর কাকে বলে। এই অংশটার অভিনয় দেখে আমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলুম আর কি! কিন্তু আমার এক হালফ্যাসানের বন্ধু আমায় ধমক দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে নাটকটি বিয়োগান্ত মোটেই নয়, এ একরকম নতুন পর্য্যায়ের পুস্তক যার নাম দেওয়া যেতে পারে 'ট্র্যাজিক ফার্স'। পরে ভেবে দেখেছি স্থানটি নববিধান রামায়ণের এক জায়গার সঙ্গে মেলে, যেখানে বনগমোনন্মতা সীতার আঁচলে চায়ের মোড়ক বেঁধে দিতে দিতে সজলকণ্ঠে কৌশল্যা দর্শকদের জানান যে, বেড-টি-বিহনে তাঁর বাছনীর জীবনযাত্রা একেবারেই অচল। কাজেই মনে হয় স্যানাটোজেন-দৃশ্যটা হয়তো লোক হাসানোর জন্যেই সৃষ্ট হয়েছে;

কিন্তু আমার মনের জরা এতই মৌরসি যে স্যানাটোজনের মতো টনিকের ধাক্কা খেয়েও তার সাথে অবসাদ অটুট থেকে যায়।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত

Regards Sur Le Monde Actuel—PAUL VALERY (Stock)
Paul Valéry—VALERY LARBAUD (Felix Alcan)

পল্ ভালেরি-র বহুমুখী প্রতিভার প্রথম প্রকৃষ্ট প্রকাশ কাব্যে। ফরাসী পিতা ও ইটালিয়ান্ মাতার পুত্র ভালেরি তাঁহার নাবালক বয়স বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া, বাইশ বৎসরে প্যারিসে আসিয়াই সুপ্রসিদ্ধ কবি ষ্টেফান্ মালার্মে-র সাহিত্যিক সহচর হইয়া পড়িলেন। তাই তাঁহার কাব্যে 'সিম্বলিষ্ট'-ধারার প্রভাব একান্ত সুস্পষ্ট। এ সত্ত্বেও তাঁহার কবি-খ্যাতি প্রতিষ্ঠালাভ করিল। কিন্তু ভালেরি-র মনের গতি এমনই বিচিত্র যে, এ-সাফল্যে উল্লসিত না হইয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন ও কবিতা রচনা বন্ধ করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ প্রায় কুড়ি বৎসর পরে। ইতিমধ্যে তিনি শিল্প ও বিজ্ঞানচর্চ্চায় গভীর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তবুও লোকমত তাঁহাকে সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিনন্দিত করিল। অনেক বিজ্ঞ ফরাসী সমালোচকের মতে ভালেরি কবি-প্রতিভায় রাসিন্, বোদলেয়ার বা মালার্মে-র সমশ্রেণীর। তাঁহার প্রবন্ধাবলী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীত হইয়া 'ভারিয়েতে' নামে প্রকাশিত হইলে ফরাসী দেশ বুঝিল, ভালেরি সুধু কবি নহেন, তিনি এত বড় চিন্তাশীল দার্শনিক যে, তাঁহার তুলনা খুঁজিতে হইলে পাস্‌কাল্-এর শরণাপন্ন হইতে হয়। ১৯২৫ সালে আনাতোল ফ্রাঁসের মৃত্যুতে ফরাসী আকাদেমীর "চল্লিশ অমরের" ৩৮ সংখ্যক আসন শূন্য হয়। সেই শূন্য আসনের অবিসংবাদিত অধিকারী নির্ব্বাচিত হইয়া ১৯২৭ সালে ভালেরি আকাদেমীতে প্রবেশ করেন।

লারবো-র বইতে এই ৩৮ সংখ্যক আসনের ইতিহাস পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১৬৩৫ সালে ফরাসী আকাদেমীর উৎপত্তি হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত যাঁহারা ঐ আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাঁহাদের কীর্ত্তি-কাহিনী ফ্রাঁসের মুখে বসাইয়া তাঁহার বিশিষ্ট কথনচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। ভালেরি-র রচনার কালপঞ্জী, উড্‌কাট্ মূর্ত্তিচিত্র ও হস্তলিখনের প্রতিলিপি বইটির সম্পদ বাড়াইয়া দিয়াছে। তথাপি পুস্তকখানির সব চেয়ে মূল্যবান অংশ, ভালেরি-র অপ্রকাশিত রচনাবলীর কিয়দংশ, ও লারবো-লিখিত ভালেরি-র অন্তর্জীবনবিকাশের ইতিহাস। লারবো ভালেরি-র অন্তরঙ্গ। মুদ্রিত পুস্তক ছাড়াও কথালাপে ও পত্রালাপে তিনি ভালেরি-র মনের অনেক গোপন কক্ষের সন্ধান পাইয়াছেন। তাই তাঁহার নিবন্ধে তিনি পাঠককে দিতে চাহিয়াছেন—"l'histoire de la formation de cette pensée, de cet esprit auquel nous devons, d' une part des poèmes qui sont parmi les plus beaux de toute la Lyrique francaise, et d'autre part des écrits en prose qui, s'ils ne nous offrent pas un système philosophique complet, nous invitent cependant à voir en leur auteur ce que je crois pouvoir et même devoir nommer: un grand moraliste de la vie intellectuelle."

(সেই মনীষা, সেই মেধার জন্মবৃত্তান্ত, যাহার প্রসাদে ভালেরি-র কবিতাকে আমরা ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করি, এবং যাহার কল্যাণে ভালেরি-র গদ্য রচনায় কোনো তত্ত্বদর্শনের সম্পূর্ণ ধারা দেখিতে না পাইলেও, সেই গদ্যের রচয়িতাকে আমরা বিচারপন্থার একজন প্রধান নীতিকার বলিতে বাধ্য)। তাঁহার বাসনা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিচিত্র চিন্তারত্নাবলীর কোষাগার ভালেরি-র রচনায় প্রবেশ করিতে তাঁহার এ চাবিটি পাঠকের অত্যন্ত সুখকর সহায়।

'রেগার সিউর ল মদ্ আক্‌তুয়েল্', ভালেরি-র আধুনিকতম গ্রন্থ। নামেই প্রকাশ তিনি এ-গ্রন্থে বর্ত্তমান জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এখানে 'বর্ত্তমান' অর্থে তিনি ধরিয়াছেন সমরোত্তর ইউরোপ ও তাহার প্রভাবান্বিত জীবলোক। ইউরোপের বৃহত্ত্ব ও বিনাশ, ফ্রান্সের মানসমূর্ত্তি, প্যারিসের প্রভাব, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, প্রগতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ একটি দীর্ঘ সুপরক্ষের সূত্র দিয়া মালার মত গাঁথা। সমরোত্তর ইউরোপীয় মনোবৃত্তির প্রধান লক্ষণ জাতীয়তাবাদ। একাধিক ফরাসী লেখক ইহাকে আক্রমণ করিয়াছেন—রোলাঁ, বারবুস্, দুয়ামেল, বদাঁ, জালু প্রভৃতি। ভালেরিও আক্রমণ করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহার রীতি বৈজ্ঞানিক। মনুষ্যহিতৈষণায় নহে, ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাত নিরপেক্ষ বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে অনুশীলন করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্ত্তমান জগতে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের স্থান নাই। Mais l'histoire mélodique n'est plus possible। এই নিরপেক্ষ বিজ্ঞান-দৃষ্টি সুলভ নহে জানেন বলিয়াই তিনি বইখানি উৎসর্গ করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া তাঁহাদিগকে যাঁহারা কোনো পন্থা বা দলের অন্তর্ভুক্ত নহেন; qui par là sont libres encore de douter de ce qui est douteux et de ne point rejeter ce qui ne l'est pas

ভালেরি-র মতে আপাততঃ ইতিহাস পড়া বন্ধ করিয়া ভূগোল পড়াই বিশ্বমানবের কর্ত্তব্য। ইতিহাস জাতীয়তাবোধকে সংহত করিয়া তীব্র করিয়া তোলে। তা ছাড়া ইতিহাস অতীতের কাহিনী—বর্ত্তমানের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। কাজেই বর্ত্তমান জীবন গঠনে তাহা কোনই সহায়তা করিতে পারে না। অনেকের মতে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জানিবার জন্যই ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন—কারণ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অতীতের ফল। ইতিহাসের এই ভবিষ্যৎ-বেত্তার দাবী স্বীকার করিতে ভালেরি মোটেই প্রস্তুত নহেন। Rien n'a été plus ruiné par dernier guerre que la pretention de prevoir. বিগতযুদ্ধের ফলে ইতিহাসের গণৎকারির জারিজুরী যেমন ভাঙিয়াছে এমন আর কিছুই নহে।

অপরপক্ষে তিনি বলিতেছেন ভূগোল পড়িতে গিয়া পৃথিবীর মানচিত্রখানি খুলিলেই বর্ত্তমান বিশ্বের স্বরূপ চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া উঠে। ভূমণ্ডলের এমন কোন অংশই নাই যাহা কোন না কোন জাতির এলাকাধীন নহে। কাজেই কোন জাতির নিজেকে ইচ্ছামত বিস্তৃত করিবার উপায় বা স্বাধীনতা নাই—অন্য কোন জাতির উন্নতির হন্তারক না হইয়া। এমন কি বিবদমান দুইটি জাতির মধ্যে একান্ত দ্বৈরথযুদ্ধ পরিচালনও আর বর্ত্তমান জগতে সম্ভব নহে—পৃথিবীর

অপর প্রান্তস্থিত জাতিসমূহের স্বার্থেও ঘা পড়িতেই হইবে; অতএব দ্বৈরথযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—বিশ্বব্যাপী মহাসমর। এই প্রতিপাদ্যটি তিনি একটি সহজ অথচ বৈজ্ঞানিক উপমার সাহায্যে অপরূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"Il faut rappeler aux nations croissantes qu'il n'y a point d' arbre dans la nature qui, placé dans les meilleures conditions de lumiére, de sol et de terrain, puisse grandir et s'élargir indéfiniment. (বিবর্দ্ধমান জাতিদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, সারা পৃথিবীর মধ্যে এমন বৃক্ষ নাই, উর্ব্বরতম ভূমি ও প্রচুরতম আলোকের আনুকূল্য সত্ত্বেও যাহার বৃদ্ধি অশেষ, যাহার পরিপুষ্টি অপরিসীম)।

ভালেরি-র বক্তব্যের এই চুম্বক-পরিচয়ে তাঁহার প্রতিভার অপমান করা হয়। বইখানি সমগ্রভাবে পড়িলে অভিভূত হইতে হয়, তাঁহার মনের প্রসারে ও জ্ঞানের প্রাচুর্য্যে। ভালেরি-র লেখনী যে স্বভাবতঃই গমনকুণ্ঠ, তাহা তাঁহার বহুবর্ষের স্বেচ্ছাবৃত মৌনব্রত হইতেই বোঝা যায়। ফলে তাঁহার প্রবন্ধগুলির রূপ অনেকস্থলেই বিভিন্ন-সূত্রের সমষ্টির মতো। কিন্তু ইউরোপের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, জীবন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার অনুধাবনের পরিণত ফল তিনি এই সূত্রাকারেই ধনরত্নের মত বিতরণ করিয়াছেন। ঐকান্তিক মার্জ্জন ও সাধনে তাঁহার ভাষা সেই স্বচ্ছতা ও গাঢ়বন্ধত্ব লাভ করিয়াছে যাহা তিনি রাসিন্-এর রচনায় সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে মানবমনের সেই নিগূঢ় কেন্দ্রীয়শক্তি লেওনার্দোর আয়ত্তে ছিল যাহার প্রয়োগে বিজ্ঞান-সাধনা ও শিল্প-সাধনা সমান সম্ভব হইয়া উঠে। এ বর্ণনাটি ভালেরি-র সম্বন্ধেও সুপ্রযোজ্য মনে হয়। তাঁহার একটি সূত্র বলে—Rien de plus proprement humain que l' effort intellectuel: c'est le caractère dècisif, (মানসিক উদ্যোগই মানুষের নিজস্ব ধর্ম্ম, ইহাই মনুষ্যত্বের ধ্রুব লক্ষণ)। এই একান্ত মানবোচিত প্রচেষ্টার অভাব তাঁহার রচনায় কোথাও দেখা যায় না, কোথাও মতের খাতিরে তথ্যকে বিকৃত করিবার প্রয়াস নাই—এই দিক্ দিয়া তিনি বিজ্ঞান-সিদ্ধ। অথচ জীবনের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতাগুলিকে একটি প্রশস্ত ও সর্ব্বালিঙ্গী ঈক্ষণায় বাঁধিবার শক্তি তাঁহাকে দার্শনিক-শিল্পী করিয়া তুলিয়াছে।

ইউরোপের বিশিষ্ট মনোভাব সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—Le jugement le plus pessimiste sur l' homme, et les choses, et la vie et sa valeur, s'accorde merveilleusement avec l' action et l' optimisme qu' elle exige.—Ceci est européan, (মানুষ, জগৎ, জীবন ও জীবনের মূল্য সম্বন্ধে আতান্তিক দুঃখবাদ, এবং কর্ম্ম ও যে-আশাবাদ ব্যতিরেকে কর্ম্ম অসম্ভব, এই দুই মনোভাবের মধ্যে কোনো অন্তর্বিরোধ নাই, ইউরোপীয় প্রকৃতিতে এই বিপরীতমুখী প্রবর্ত্তনা দুটির সম্পূর্ণ সঙ্গম ঘটিয়াছে)। যে দৃষ্টির সহায়তায় একটি অতি-জটিল অতি-অস্পষ্ট বিষয়—বিভ্রান্ত অথচ কর্ম্মোন্মত্ত ইউরোপের বর্ত্তমান স্তোয়িক মনোভাব—এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে তাহার প্রাখর্য্যে মুগ্ধ হইতেই হয়। মনে হয় ভালেরি বুঝি এই তীক্ষ্ণ-ধী-সর্ব্বস্ব। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে তিনি মানবের অন্তর্জগত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন—

Dans nos desirs, dans nos regrets, dans nos recherches, dans nos émotions et passions, et jusque dans l' effort que nous faisons pour

nous connaître, nous sommes le jouet de choses absentes." (আমাদের আশা-নিরাশা, অনুসন্ধিৎসা, ভাবাবেগ, এমন-কি আত্মপরিচয়ের প্রয়াস, এ-সমস্ততেই আমরা কোনো এক জ্ঞানাতীত শক্তিপুঞ্জের ক্রীড়ণকমাত্র)।

কঠোর বিচারপন্থী ভালেরি-র মুখে এই কথা শুনিয়া শাশ্বত অখণ্ড ব্রহ্মবাদী প্রাচ্য মন কি শান্ত প্রফুল্লতার সহিত ভাবিতে পারে না যে, ভৌগলিক ও পরিশীলীর বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাহাদের মর্ম্মগত ব্যবধান অলজ্ঘ্য নহে।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

সংক্ষিপ্ত পুস্তক-পরিচয়

দুলালের দোলা।—শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্।

লেখক প্রথমেই বলেছেন, গল্প তৈরী তাঁর উদ্দেশ্য নয়,—আসল উদ্দেশ্য ঘটনা পরম্পরার সাহায্যে তাঁর বক্তব্য ব্যক্ত করা। ভূমিকায় স্পষ্ট ক'রে লিখেছেন "ঘটনার কল্পনায় গভীরতা থাক্ আর নাই থাক্, পল্লীর সঙ্গে মনের নিবিড় আত্মীয়তা জন্মিবার পক্ষে তাহা সুদূরাগত বা প্রত্যক্ষ অন্তরায় হইতে পারে কি না তাহাই বিবেচ্য।" অর্থাৎ পল্লীগ্রামে গিয়ে কোনো ভদ্রলোকের বাস করা কঠিন। আর গল্পটা অর্থাৎ ঘটনাটা এই—প্রবাসে প্রতিপালিত এক যুবক দেশে বেড়াতে এসে, প্রথমে পল্লী-সৌন্দর্য্য দেখে ও পিসিমার রান্না খেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে উঠ্ছিল—কিন্তু পরে ঘরে ঘরে যে রকম জাতিভেদ আর ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার দেখ্লে, লোকের নানারকম কুকীর্ত্তির কাহিনী শুন্লে,—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ বাড়ী নিমন্ত্রণ খেয়ে তাকে থালা মেজে দিয়ে আসতেও হয়েছিল,—তাতে সে বড়ই বিরক্ত হ'য়ে অপর এক ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে এবং দুকথা শুনিয়ে দিলে। এ-ব্রাহ্মণ ছিল চোরের সর্দ্দার, কাজেই এর ফলে চোরে সিঁদ কেটে তার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে গেল। ব্রাহ্মণ-অমর্য্যাদার প্রতিফল হাতে হাতে পেয়ে তার দেশ ছেড়ে পালাতে বিলম্ব হোলো না। লেখকের ভাষা বেশ স্পষ্ট, অলঙ্কারবহুল, ভাবেরও অভাব নেই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—এই সব ঘটনা কি সত্য বা সম্ভাব্য ব'লে মেনে নিতে হবে? নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের ছেলেকে পরম আপ্যায়িত ক'রে শেষে তাকে বাসন মাজতে বলা অস্বাভাবিক নয় কি? গ্রামে কি কলাপাতারও অভাব ছিল? এ-ছাড়া, পাড়াগাঁয়ে অবশ্য সহরের সভ্যসমাজের মত মিহি গলায় রকমারি সুরের "বর্ষামঙ্গলের" গান শোনা যায় না বটে কিন্তু লেখক যে রকম বিকৃত ভাষায় বিচিত্র ঢংয়ের গানের উল্লেখ করেছেন তাতে তাঁর শ্লেষ কর্‌বার বাহাদুরী প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু কোনো মজলিসে বাস্তবিক তেমন গান শোনা যায় না। পল্লীবাসীরা অশিক্ষিত বা অশিষ্ট হ'তে পারে কিন্তু অভদ্র হয় না। হিন্দু ও মুসলমান দুটি চাষীকে উচ্চমনা ক'রে তাদের মুখে কত তত্ত্বকথা শোনালেন কিন্তু উচ্চবর্ণের গৃহস্থদের এত হীন ক'রে দেখালেন কেন বোঝা গেল না। আর শেষ কালে একটা সামান্য অজুহাতে practical joke স্বরূপ যে চুরির কাণ্ডটা ঘটালেন,—কোনো তৃতীয় শ্রেণীর লেখকও বক্তব্য পরিস্ফুট করতে গিয়ে এমন অদ্ভুত ব্যাপারের অবতারণা করেন না। আর এক কথা, এক আশী বছরের বুড়ো চাষীর মুখে শোনালেন—"ধর্ম্মপত্নী কথার কোনো মানে নেই। মন্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল,—তার দেহটাই আসল।" এ কথা লেখকের মুখে শোভা পেতে পারে, কিন্তু ঐ বুড়োর মুখে নয়।

জাতিভেদ, প্রভৃতি পল্লীজীবনের এই দিক্‌টা নিয়ে অনেকটা এই ধরণের লেখা আর একটি গল্প অনেকদিন আগে বেরিয়েছিল—খ্যাতনামা নাট্যকার ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "চাঁদের আলো"। তাতেও গল্পের নায়ক গ্রামে নবাগত এক প্রবাসী বালক,—বাড়ী আগ্‌লে থাকেন এই রকম এক পিসিমা, ঘটনার মধ্যে এমনি জাতিবিচার ও ছোঁয়াছুঁয়ির গণ্ডগোল,—এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, তাতেও এক ধোপার মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের সংশ্রব ও তার আত্মহত্যার কথা আছে। ভাষাও তেমনি অলঙ্কারবহুল।

অবশ্য অন্যান্য ঘটনায় বিস্তর প্রভেদ আছে,—আর সেটা আদিরস মিশ্রিত একটা নিছক গল্প, আর এটি গল্পচ্ছলে প্রবন্ধ। তবে তুলনা করলে বুঝা যায় যে, তাতে ঘটনার একটা সামঞ্জস্য আছে,—আর তাতে ছুৎমার্গের কেবল আচার-বিচারের কথাই নেই, তার একটা শেষ মীমাংসা আছে। যাই হোক্, এই বই লেখার সার্থকতা কি জানি না। প্রবাসী বাঙালীর কাছে দেশের এই চিত্র উপস্থিত করলে তারা আর দেশে ফির্বার কথা ভাবতেও ভয় পাবে। লেখকের ভাষা ও ভাব দুই বিষয়েই দখল আছে, কিন্তু ঘটনা বৈষম্যে আর সহজ বিবেচনাশক্তির অভাবে বইখানি গল্প হিসাবেও জমে নি, প্রবন্ধ হিসাবেও স্থান পেতে পারে না।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

বড় মা—শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল, বি এ, প্রণীত।

এতে কয়েকটি ছোট ছোট গল্প আছে। বেশ মিঠা মিঠা ঝর্‌ঝরে গল্প। এতে সাহিত্যসৃষ্টির উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই—নেহাৎ গল্প বলার জন্যই গল্পগুলি লেখা। পড়তে কিছু কষ্ট হয় না, প্রত্যেকটিতেই মন খুসী হয়,—ভুলে যেতেও বেশী দেরী হয় না। মেয়েদের সময় কাটাবার পক্ষে বেশ বই,—মেয়েদেরই উপযুক্ত ক'রে লেখা।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

পাঁচমিশেলী—শ্রীঅবনীনাথ রায়, ডি, এম, লাইব্রেরী, মূল্য একটাকা।

কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্কলন এই বইখানি। তবুও পাঁচমিশেলী নামটি ঠিক লাগসৈ হয়েছে ব'লে মনে হয় না। কারণ, পাঁচমিশেলী নামে যতটা বৈচিত্র্য আশা করা যায়, তা এ বইতে নাই। সর্ব্বশুদ্ধ দশটি প্রবন্ধের মধ্যে পাঁচটি শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে, ও ছটি রবীন্দ্রনাথের ; বাকী তিনটি বর্ত্তমান সমাজকে অবলম্বন করিয়া লিখিত। কোন এক ৩০শে আশ্বিন তারিখে লেখক তাঁহার বাল্যকালে দুই বন্ধুর সহিত রাখীবন্ধন করিয়াছিলেন। রায় সাহেব খেতাব-লুব্ধ এক ভদ্রলোকের রিপোর্টের ফলে তাঁর ভাগ্যে জুটিয়াছিল রাষ্টিকেসন্। এই আপাতবিষম ফলটি পরিণামে মনোরম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবনীবাবু বোলপুর আশ্রমে ভর্ত্তি হন্ ও রবীন্দ্রনাথের নিকট সংস্পর্শে আসেন। "বোলপুরে থাকার সময়টা তাঁর কাছে কাছে থাকতুম। কবিতা লিখে তাঁকে দেখাতুম —তিনি কারেক্ট ক'রে দিতেন। দুপুরবেলা শান্তিনিকেতনের দোতলায় জাজিমের ওপর বসে শান্তিনিকেতন-সিরিজের থেকে প্রবন্ধ বুঝিয়ে নিতুম—কখনো বিরক্ত হ'তে দেখিনি—এক কথা পাঁচবার বুঝিয়ে বলতেন। ছুটির সময়ও বাড়ী না গিয়ে তাঁর সঙ্গে যেতুম।" পরে দিল্লী-প্রবাসী হইয়াও তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। তাঁহার সাহিত্যিক প্রবন্ধগুলি কোন-না-কোন সাময়িক উপলক্ষে রচিত। কাজেই তাহার পূর্ণাঙ্গ ও মূলগত সমালোচনা আশা করা বৃথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত গ্রন্থের গল্পাংশ নিজের মত করিয়া পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাঝে মাঝে কিছু কিছু মন্তব্য প্রক্ষেপ করিয়া। এ প্রথায় নাবালক মনের উপকার হইলেও সাবালক মন তুষ্ট হয় না। তবুও স্বীকার করা উচিত, সাহিত্য-

আলোচকের উপযুক্ত রসবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী অবনীবাবুর আছে। তাঁহার ভাষায় স্বচ্ছতা ও মাধুর্য্য, দুই-ই আছে ; এ-দুয়ের সমাবেশ আধুনিক বাংলার অতি অল্প লেখকের রচনায় পাওয়া যায়। গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয় বাংলাভাষায় প্রবন্ধ-সাহিত্যের দৈন্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এ-অবস্থায় অবনীবাবুর সুলিখিত প্রবন্ধাবলীর বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

কারার ফুল—প্রথম স্তবক, সন্ধ্যামালতী ; দ্বিতীয় স্তবক, রক্তজবা—শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; প্রকাশক, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স।

কবি তাঁহার নিবেদনে জানাইতেছেন "এ কবিতা-গুচ্ছ পেশাদার কবির হাতের নহে। কারাবাসে রচিত ; নানা সুখ, দুঃখ, বিপত্তির জালে জড়িত রাজবন্দীর জীবনের অবকাশের আওতায় একটী পরিণত ঋজু হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বেদনা ও আনন্দের স্বচ্ছ প্রকাশ মাত্র। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা সমালোচনার তীব্র অঙ্কুশ দ্বারা প্রেমিক অন্তরের নির্য্যাস—এই কবিতার বিচার না করিয়া, রসসিক্ত হৃদয় এবং প্রেমাবিষ্ট বুদ্ধি লইয়া পাঠ করিলেই কবি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবেন।" কবির এ কথা না বলিলেও চলিত। কারণ বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার অভ্যুদয় নূতন হইলেও তিনি বাঙ্গালীর অপরিচিত নহেন। দেশের জন্য, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, তাঁহার স্বার্থত্যাগ ও কষ্টস্বীকার যে তাঁহার স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই কোন বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাই তাঁহার কবিতা "সমালোচনার তীব্র অঙ্কুশ" দ্বারা বিচার না করিয়া রাজবন্দীর জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বেদনা ও আনন্দের প্রকাশই মনে করিবে। দুই স্তবকে মোট ৮৩টী কবিতা—নানা বিষয়ে লিখিত। সকলগুলিই যে উচ্চ কবিত্বের নিদর্শন এমন কথা বলা চলে না, তবে কখনো কখনো কবির হৃদয়ের বেদনা যে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ছন্দ হিসাবে এ কবিতার বিচার না করাই ভাল, কারণ কবি নিজেই বলিয়াছেন—

আকাশধরার ছন্দবেগে
নাই কি কোন যতির ভুল ?
আমার দুখের অস্তমেঘে
ফুটবে না কো হীরার ফুল ?

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

সান্-ইয়াৎ-সেন—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মোস্‌লেম পব্‌লিশিং হাউস,

চীন ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যা কতকটা একই প্রকারের। দুই দেশই বিশাল ; ও প্রতি দেশেরই বিপুল অধিবাসীর মধ্যে আকৃতি, প্রকৃতি ও ভাষাগত ঐক্য নাই। সেই সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে সাম্য স্থাপন করিয়া নূতন জাতি গঠন উভয় দেশেরই কাম্য। ইহাতে বাধা বিস্তর, ভারতবর্ষ শুধু একটী ইউরোপীয় শক্তির হস্তগত, কিন্তু চীন বহু বিদেশীয় শক্তির মুষ্টিবদ্ধ। সেই সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া চীন কিভাবে তাহার জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিতেছে তাহা ভারতবাসীর জানা দরকার।

সুতরাং নবীন চীন ও তাহার জাগরণের প্রধান সহায় সুন ইয়াৎ সেন সম্বন্ধে কোন তথ্যপূর্ণ পুস্তকের প্রকাশ সর্ব্বতোভাবেই বাঞ্ছনীয়।

এ বইখানি সরস ভাষায় লিখিত। তবে লিখিবার প্রণালীতে দোষ আছে। লেখক নিজের বর্ণনার ভিতর মধ্যে মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে সুন ইয়াৎ সেনের মুখ দিয়া তাঁহার আত্মচরিত শুনাইয়াছেন। চীনা নামগুলিরও সব সময়ে সঠিক উচ্চারণ দেওয়া হয় নাই। উচ্চারণ সান নহে সুন, কোয়াসিঙটাঙ নহে কুও-সিন্-তাং। বর্ত্তমান চীনের গণতন্ত্র সম্বন্ধে কিছু বেশী খবর দেওয়া উচিৎ ছিল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

The Yellow Placard—SYLVIA LYND (Gollancz).
Dear Judas—ROBINSON JEFFERS (Hogarth Press).
Deserted House—DOROTHEY WELLESLEY (Hogarth Press).
The Frozen Ocean—VIOLA MEYNELL (Seeker).

উপরি-উক্ত চারখানা কবিতার বই প'ড়ে সমসাময়িক ইংরেজি কবিতার সাধারণ উৎকৃষ্টতায় বিস্মিত হ'তে হয়। অনেকে ক্ষোভ করেন যে, বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে গত শতাব্দীর মত বিরাট কবি-প্রতিভা একজনেরও নেই; এখনকার কাব্য-ক্ষেত্র বহু চলনসই কবিতে সমাকীর্ণ। তা যদি হয়-ও (যদিও সে-বিষয়ে মতান্তর থাকা অসম্ভব নয়), তবু এ-কথা ঠিক যে, ছোটখাটো কবিরা আজকাল উৎকৃষ্টতার যে-স্তরে পৌঁছতে পারেন, অন্য-কোনো যুগে তা সম্ভব হ'ত না। বহু শতাব্দীর অনুশীলন ও সাধনা যে-ভাষা ও সাহিত্যকে নির্ম্মাণ করেছে, তা'র এম্‌নিই হয়। ইংরেজী ভাষা ও কাব্য-ধারা এমন সম্পদশালী যে, কণামাত্র ক্ষমতা থাক্‌লেও কোনো ইংরেজের পক্ষে ভালো কবিতা না-লেখা অসম্ভব। ভালো, মানে পঠনীয়; মানে, উপভোগ্য। এই চার জন কবির একজনো 'বিখ্যাত' নন্, (সম্ভবত বয়েসও তাঁদের বেশি নয়), তাঁদের রচনা শুধু যে পঠনীয়, তা নয়; উপভোগ্য। কোনো সময়ে তাঁদের কোনো-না-কোনো কবিতা যে Oxford Book of English Verse-এ স্থান পাবে না, তা জোর ক'রে বলা যায় না। চারখানা বই বিভিন্ন ধরণের হ'লেও দুটি সাধারণ জিনিষ সহজেই বা'র ক'রে নে'য়া যায়; প্রকৃতির জন্য অনুভূতি আর বিষাদের সুর। প্রকৃতি-পূজার cult এমন সর্ব্বব্যাপক হ'য়ে রোমান্টিক্‌দের সময়েও ছড়ায় নি। যে-সব ইন্দ্রিয়গোচর জিনিষের ভেতর দিয়ে প্রকৃতি আত্ম-প্রকাশ করেন, সে-সব জিনিষে আজ-কালকার লোকের মন—কবিতা দিয়ে যদি বিচার কর্‌তে হয়—অত্যন্ত বেশী সাড়া দেয়, খুব সহজেই সাড়া দেয়। আর, বিষাদ বিংশ শতাব্দীর ইংরেজি কবিতার বিশেষত্ব; জীবনের সব আনন্দের ক্ষণস্থায়িত্ব ও সর্ব্বান্তে অনিবার্য্য মৃত্যু সম্বন্ধে এ-যুগের কবিরা অনেক তীক্ষ্ণভাবে সচেতন। মনে হয়, Anglo-Saxon কবিতার গম্ভীর নিরানন্দ অনেক শতাব্দী অতিক্রম ক'রে আবার ফিরে' এসেছে। Anglo-Saxon কবিতা বাদ দিলে ইংরেজি কবিতার মূল সুর আনন্দ ব'লে ধরা যায়; চসার আনন্দের কবি, এলিজাবেথীয়েরা আনন্দের; উনবিংশ শতাব্দীর কবিতায়—শেলি ও কীট্‌সে—একটি পলাতক, সূক্ষ্ম ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষাদের সুর বাজ্‌লো। কিন্তু এক অভিনব pagan pessimism আন্‌লেন প্রি-র্যাফেলাইটরা, বিশেষ ক'রে মরিস্ আর সুইন্‌বর্ণ্। সেই

থেকে ইংরেজি কাব্যের ধারা একটা মোচড় নিয়েছে, বলা যায়; উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যাঁরা লিখেছেন—হার্ডি, এ, ই, হাউস্‌ম্যান্, রুপার্ট ব্রুক্, ডি, লা মেয়ার—মৃত্যুর জল্পনায় এঁদের সবাকার কবিতাই বিষণ্ণ। সেই বিষাদের সুর যে এখন পর্য্যন্ত চ'লে আস্‌ছে, এই অত্যন্ত আধুনিক কবিতাগুলো প'ড়ে তা'র পরিচয় পেলাম।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

শেলী—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত. গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং প্রকাশিত।

শেলীর সমস্ত দুর্দ্দশার মূলে ছিলো তার জীবনকে কাব্যময় ক'রে তোলার শোচনীয় চেষ্টা। ভাবা গিয়েছিলো যে, সে বেঁচে থেকে যে-সঙ্করতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, অন্তত মরে তার সমাধান কর্‌বে। কিন্তু শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের "শেলী" প'ড়ে সে-আশাকেও কুহকিনী ব'লে জেনেছি। শেলীর প্রথম জীবনী-সম্বন্ধে ম্যাথিউ আর্নল্‌ড্ যে-মন্তব্য করেছিলেন সে-টিপ্পনী এখনো অপ্রচল হয়নি; নৃপেন্দ্রবাবুর বিবরণেও "it is always a poetic child that is born and not a prosaic babe"। তবে কল্পনার প্রাখর্য্যে শেলীর শেষ জীবনীকার ডাউডনকেও হার মানিয়েছেন। নৃপেন্দ্রবাবু তৃতীয় জর্জ্জের ইংলণ্ডেও গ্যাস্‌ল্যাম্প্ ও ইলেক্‌ট্রিক্ ষ্টোভের সন্ধান পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি আরো আবিষ্কার করেছেন যে, শেলী ছিলেন ব্যারণ্ পৌত্র। আমাদের পুঁথিগত বিদ্যা কিন্তু শেলীর পিতামহকে এতদিন একজন সামান্য ব্যারনেট্ ব'লেই ধ'রে রেখেছিলো। তবে এ-বিশ্বাস ভুল হওয়াই সম্ভব, কারণ সেকালের ভূগোলে সারপেণ্টাইনের পরিচয়ে নদীত্বের কোনো উল্লেখ থাকতো না; আমাদের অর্দ্ধ-শিক্ষিত গুরুমশাইদের ধারণা ছিলো যে, ওটি লণ্ডনের একটি ঝিল মাত্র। এই ধরণের গুটিকয়েক মৌলিক গবেষণা ছাড়া, ডরি লেন, অলিম্পাস, জ্যত্তোর মতো চিরাভ্যস্ত নামগুলির সংস্কার ক'রে নিয়ে, ও-গুলির স্থলে ডুরি লেন, অলিম্পিয়াস, গিওতো ইত্যাদির প্রবর্ত্তনেও নৃপেন্দ্রবাবুর গভীর অনুসন্ধিৎসা ও প্রগাঢ় ইংরেজি-জ্ঞানের বিজ্ঞাপন আছে। হাঁা, বইখানি নতুন বটে, এমন কি এর ভাষাও কল্পনাতীত। এমন অপূর্ব্ব রচনারীতি আর কোথাও লক্ষ্য করেছি ব'লে মনে পড়ে না। শুনেছি আধুনিক বাঙলা সংস্কৃত-ব্যাকরণের দাসত্ব কর্‌তে আর রাজি নয়। কিন্তু স্বরাজসাধনার অভিব্যক্তি হিসেবে লট্-লোট্-লঙ্-বিধিলিঙের এই অদ্ভুত ও অলজ্জ সংমিশ্রণ প্রশংসনীয় হ'লেও, "স্তিমিত কম্পন", "বেপথু তনুলতা", "অবিবাহিত দম্পতী," "কথার জীবন-প্রয়োগ", "রস-বুভুক্ষিত শতাব্দী", "সংযমের বাধ্যবাধকতা দিয়া যৌবনের দীপ্ত শিখাকে মেদুর" ক'রে তোলা, "সুন্দরের পূজায় রক্তপদ্মের মত হৃদয়-আহুতি" দেওয়া, "তৃষ্ণায় আতুর কৃষ্ণচক্রের পল্লবে পল্লবে শ্রান্ত যৌবনের নিদ্রা" ইত্যাদি রোমহর্ষক পদবিন্যাসও কি ওই মুমূর্ষার পরিচায়ক? বেচারা শেলী! জীবন ও কাব্যের সীমাসন্ধি উপেক্ষা করা মহাপাতক বটে, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তেও তো একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই!

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

প্রকাশক—শ্রীজগবন্ধু দত্ত, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ড্যালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২ দুর্গা পিতুরী লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগবন্ধু দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত

পরিচয়

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

নিয়মাবলী

"পরিচয়ের" আদর্শ প্রথম সংখ্যার মুখপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

শ্রাবণ হইতে সুরু করিয়া প্রত্যেক তৃতীয় মাসের—অর্থাৎ শ্রাবণ, কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখের—১লা তারিখে "পরিচয়" বাহির হইবে। মূল্য বার্ষিক সডাক ৪৷৹, প্রতি সংখ্যা ১৲, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

"পরিচয়ে" প্রকাশের জন্য রচনা কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান দরকার।

প্রাপ্ত রচনা প্রকাশের, বা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার কোন বাধ্যতা থাকিবে না।

ঠিকানা ও ডাকটিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে।

পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ও ব্লক আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

প্রবন্ধাদি ও বিজ্ঞাপন পাঠাইবার ঠিকানা—

ম্যানেজার "পরিচয়",
রুম নং ১৭, ষ্টিফেন হাউস,
ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৩৯

পরিচয়

যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদ

২

গত বারের 'পরিচয়ে' আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদের আলোচনা করিতেছিলাম। ঐ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছিলাম যে, পরমাত্মা (ব্রহ্ম) অংশী—আর প্রত্যগাত্মা (Monad) তাঁহার অংশ—পরমাত্মা চিদাকাশ, প্রত্যগাত্মা চিন্মাত্র।

অংশো নানাব্যপদেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২৷৩৷৪৩

এই অংশ (চিৎকণ প্রত্যগাত্মা) চিদ্‌ঘন পরমাত্মা হইতে নিজের ব্যাবহারিক ভেদ সিদ্ধ করিবার জন্য দহরকোশরূপ 'হৃদ্যাকাশময়' দেহ গ্রহণ করতঃ 'দেহী' হন।

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ—শ্বেত, ৩৷১৮
দেহী বিজ্ঞানাত্মা ভূত্বা, হংসঃ পরমাত্মা লেলায়তে চলতি বহিঃ বিষয়গ্রহণায়
—শঙ্কর

আমরা আরও দেখিয়াছিলাম, চিন্মাত্র 'দেহী' জড় জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ ব্যঞ্জিত করিবার জন্য ত্রিবিধ শরীর গ্রহণ করেন। তখন (বেদান্ত-পরিভাষায়) তাঁহার নাম হয়—প্রাজ্ঞ আত্মা, তৈজস আত্মা ও শারীর আত্মা। স্থূলভুক্ স্থূল-শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা 'শারীর', সূক্ষ্মভুক্ সূক্ষ্মশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা 'তৈজস', এবং আনন্দভুক্ কারণশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা 'প্রাজ্ঞ'।

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি—শ্বেত, ৫৷১২

অতএব এ সম্পর্কে শরীরই মূলাধার।

মৃত্যু ও উৎক্রান্তি

'শরীর' অর্থে যাহা শীর্ণ হয়, জীর্ণ হয়। শরীর জীর্ণ হইলে জীব কি করে? বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় (গীতা)—জীর্ণ বাসের মত সেই জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে। এ সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,